ভাগ্য-নিরূপিতা

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু বি এ

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক:
মেসার্স রায় এণ্ড রায়চৌধুরী।
শ্রীনলিনী মোহন রায়চৌধুরী
শ্রীশচীন্দ্র মোহন রায়।

প্রাপ্তিস্থান—
১। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।
২। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বসু
১৬নং মধুরায়ের লেন, সিমলা,
কলিকাতা।

কলিকাতা,
৩০নং সিমলা ষ্ট্রীট, "বেঙ্গল প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার।

বিকাশে ব্যথা

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু বি, এ প্রণীত

মূল্য ১।৷৹ টাকা। (যন্ত্রস্থ)

অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ

শ্রীশ্রীবৃহৎ ভক্তি-তত্ত্ব-সার

শ্রীরাধানাথ কাবাসী সঙ্কলিত।

প্রথম খণ্ড ২।৶৹ দ্বিতয় খণ্ড ২৶৹

প্রধান পুস্তক বিক্রেতাদের
নিকট প্রাপ্তব্য।

অথবা

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বসু

১৬নং মধুরায়ের লেন, সিমলা,
পত্র লিখুন।

ভূমিকা

ইংরাজী উপন্যাস যাঁরা পড়েন না, তাঁদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন—এ 'ভুঁইফোঁড়' লেখকের উপর সদয় হ'য়ে তাঁরা যেন প্রথম পাতা গুলো, একটু ধৈর্য্যের সঙ্গে পড়েন, কারণ সেগুলো একে-বারেই বোধ হয় নিরস লাগ্‌বে।

ভুল ভ্রান্তি কমবেশ্‌ সবারই হয়, বিশেষতঃ প্রথম চেষ্টায়। তবে, সেটা দেখিয়ে দিয়ে, ক্ষমা ক'রে মানিয়ে নিলে একপক্ষে যেমন মহত্ত্বের পরিচয়, অপরপক্ষে তেমনই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি হওয়ায় আমার অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুলও বোধ হয় র'য়ে গেল। সে জন্যও ত্রুটী স্বীকার করি। ইতি—

১৬নং মধুরায়ের লেন, সিমলা,
২রা আশ্বিন, ১৩২৯।

বিনীত
শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু।

ভাগ্য-নিরূপিতা

(১)

হঠাৎ একদিন আষাঢ়ের বেলা না পড়িতেই, হরি ঘোষ বৎসর খানেক ম্যোকালীন জ্বরে ভুগিবার পর, তিন মাসের বাকী বাড়ী ভাড়া, গোয়ালার দুধের দাম এমন কি ডাক্তারের ভিজিটের টাকা গুলি পর্য্যন্তও না শুধিয়াই চোখ বুজিলেন। অনাহার, অনিদ্রা, অযথা পরিশ্রম ও দারুণ উদ্বেগে মৃত-কল্প, সদ্য বিধবা বিমলা সেদিন দীর্ঘ মূর্চ্ছার পরেও কেমন করিয়া আপনা হইতে উঠিয়া বসিলেন, পাওনাদারদের রূঢ় অত্যাচার হইতে কেমন করিয়াই বা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, পরে অনেক ভাবিয়াও সে সব কথা তিনি মনে করিতে পারিতেন না। সে দিনকার কথা মনে হইতেই এখনও তিনি মনে মনে শিহরিয়া উঠেন। তাহার পর এই সুদূর বিদেশে গৃহহীন অসহায় অবস্থায় কিরূপে বিমলার দু'বৎসরের পিতৃহীন মনু কালক্রমে এখন থিওসফিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র ও সহপাঠীদের ঈর্ষার স্থল হইল সে ষোল বৎসরের ইতিহাস মল্‌রোডের পিয়ারী ডাক্তারেরই বিশদভাবে জানা থাকিবার কথা ;

আঠারো বৎসর বয়সেই হাতের নোয়া ও সিঁতের সিঁদুর যমকে দিয়া,

এবং থালা ঘটী বাটী, মায় পুরাণ টিনের বাক্সটী পাওনাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়া বিমলা যেদিন তাঁহার স্বামীর শেষ চিকিৎসক পিয়ারী বোসের বাড়ীতে রাঁধুনীবৃত্তি করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেদিন ডাক্তার বাবুর মনে অপ্রাপ্ত ফী'য়ের টাকা গুলা উসুলের আশা জাগিয়াছিল, কি শুধু দয়ারই উদ্রেক হইয়াছিল, সেটা তখন নিশ্চয় করিয়া বুঝা না গেলেও পরে তাঁহাকে, রাঁধুনির ছেলে মনুকে নিজের ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মানুষ করিতে দেখিয়া অনেক গুণগ্রাহী, তাঁহার বদান্যতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

পিয়ারীবাবু ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়াই কোন এক সৈন্যদলের ডাক্তার হইয়া নাকি কোন একটা লড়াইএ গিয়াছিলেন। বৎসর দশ বাদে পেন্‌সনের আশা না রাখিয়াই যে দিন তিনি এই কানপুর সহরে স্বাধীন ব্যবসায়ে বসিয়া গেলেন, তখন এখানে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে লড়াই হইতে তিনি টাকার আণ্ডিল বাঁধিয়া আনিয়াছেন। কাজেই পয়সার কাছে পশারও আসিতে দেরী করিল না। দেখিতে দেখিতে পিয়ারী বোস্ বাড়ী, গাড়ী ও বিষয়সম্পত্তি যথেষ্টই করিয়া ফেলিলেন। মধুর আশা থাকিলেই মৌমাছির মাথায় টনক নড়ে—তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া এত দিনের বিস্মৃত আত্মীয় কুটুম্বেরা আত্মীয়তা জানাইতে এই দূরদেশে আসিতেও কষ্ট বোধ করিলেন না। আবার যাঁহারা আসিতে পারিলেন না তাহারা পত্রের দ্বারাই তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মঙ্গলেচ্ছা ইত্যাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নবলব্ধ স্বজনদিগের

সঙ্গে পিয়ারী বাবুর এক বিধবা পিসি স-বিধবাকন্যা পারুকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, ইচ্ছা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান চাইকি, হরিদ্বার তীর্থটাও হইয়া যাইবে। আর কপাল পোড়া মেয়েটার ত একটা হিল্লে হইবেই। ইতিপূর্ব্বে পিতার মৃত্যুতে পিয়ারী বোস্ দাদা-মশায় কি প্রদাদামশা'য়ের আমলের লোনা খাওয়া বিকৃতাঙ্গ প্রকাণ্ড একখানি বাড়ী, তৎসংলগ্ন তের বিঘা আম কাঁটালের বাগান, দেড়টি পুকুর—একটা খুব বড় আর একটা খুবই ছোট—মাঝামাঝি রকমের একখানি তালুক, তিন্‌টি গাই, দু'টা বাছুর, শেষ দশায় উপনীতা বৃদ্ধা মা, এক কনিষ্ঠা ভগিনী ও গৃহপালিত ভগিনী-পতি ও তাঁহাদের পাঁচ ছ'টি পুত্রকন্যার ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। মাস তিনেক বাড়ী থাকিয়া, মায়ের সৎকার করিয়া, তিনু জ্যাঠার উপর তালুকের ভার দিয়া, গরু বাছুর ক'টি বিলাইয়া দিয়া ও বাড়ীতে গৃহহীন নন্দা নাপিতকে সপরিবারে বসাইয়া, পিয়ারী বাবু অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তিটা সঙ্গে লইয়াই কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। নিজেও তিনি ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় বঞ্চিত হয়েন নাই। প্রথম পুত্র অমর বর্ত্তমানে ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। জেষ্ঠা কন্যা মমতার, অনেক খরচ পত্র করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া খুব বড় ঘরের ছেলে ও পিতার একমাত্র বংশধর, একুশ বৎসর বয়স্ক, এন্‌ট্রান্স সমুদ্রের এপারেই স্তব্ধগতি দেবেন্দ্র রায়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তিনি ভাবিয়া ছিলেন—মেয়ের খুব বরাত জোর। কিন্তু ঘর করিতে যাওয়ার বৎসর খানেক পরে একদিন সহসা ছ'মাস অন্তঃসত্ত্বা মমতা যখন একাই তাঁহার ঘরে ফিরিয়া আসিল,

তখন তাঁহার সে আত্ম-প্রসাদটা পলাইতে পথ পাইল না। স্বামী, যিনি নারীর শ্রেষ্ঠ গুরু, যাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে, সেই স্বামী যদি একেবারে নির্গুণ মহাদেব হইয়া, বাড়ীতে স্ত্রীর বুকের উপর বসিয়া, তারই নাকের সাম্‌নে কতকগুলা ইতর ইয়ার বন্ধু ও নীচ স্ত্রীলোক লইয়া স্বামীত্ব করিতে চা'ন—বিনা কারণে তাঁহার বিবাহিত পত্নীকে, তিরস্কার, প্রহার ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা দেন, তা হইলে স্ত্রীর মনে স্বামী যে, দেবতার পরিবর্ত্তে দানবেরই মূর্ত্তি ধারণ করেন, একথা হিন্দু ঘরের পনের আনা স্ত্রী মুখে বলিতে সাহস না করিলেও মমতা কিন্তু নিজের কাছে ও মা বাপের নিকট স্বীকার করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে নাই। সে ত অনেকদিন অনিচ্ছাতেই মুখ বুজাইয়া ছিল, কিন্তু যেদিন তাহার ছ'মাস অন্তঃসত্বা অবস্থায় ইঙ্গিত করিয়া দেবেন তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া সজোরে তাহার পাঁজরের উপর লাথি মারিল, সেই দিন সে স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করিল। ইহার পর তাহার পিতামাতা তাহার অকারণ বৈধব্যে ব্যথিত হইয়া তাহাকে স্বামীর কাছে পাঠাইতে সচেষ্ট হইলেও, ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার কোনও ঔৎসুক্য দেখা যায় নাই। এক মিনিটের জন্যও বুঝি সে নিজের অবস্থায় ব্যাকুল হইত না। এতটুকু অনুতাপ বা লজ্জা কথায় কি ভাবে সে প্রকাশ করিত না। কন্যা, ভগিনী, ও মাতৃত্বের ভিতর দিয়াও যে নারী জীবনের সার্থকতা লাভ হইতে পারে এ বিশ্বাস মমতার বড় দৃঢ় রকমই ছিল। তাই সে আর স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইতে লালায়িত হয় নাই।

অমর ও মমতা ছাড়া পিয়ারী বাবুর আরও দু'টি পুত্র কন্যা

ছিল, পুত্র সমর, মোহিত অপেক্ষা বৎসর খানেকের ছোট ও তাহারই সহপাঠী, কন্যা স্নেহ, মোহিতের ছাত্রী ও আর্‌দালী। তিনটির বয়সের বিশেষ পার্থক্য ছিল না, স্নেহ সমরের মাত্র দুবৎসরের ছোট। ইহাদের মধ্যে একটা গাঢ় বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। রোজ বিকালে তাহারা তিনটিতে এক জোটে ঘুরিয়া বেড়াইত, কোন দিন "ও, আর্‌ আর," পুল দিয়া গঙ্গাপার হইয়া তাহারা ওপারে উর্ণাউয়ে পিয়ারা চুরি করিতে যাইত কথনও, এপারে খালি নৌকায় বসিয়া বাব্‌লার ডালে সূতা বঁড়্‌সী লাগাইয়া গঙ্গায় মাছ ধরিত, আবার কোনও দিন বা ম্যাসাকার ঘাটে (Massacre Ghat) ভাঙ্গা দেওয়ালের গায় কয়লা দিয়া নাম লিখিত। বিদেশীর দেশ, এখানে সমাজের পাহারা একেবারেই সতর্ক ছিল না, তাই স্নেহের বয়স তের বৎসর হইলেও সে এথনও এমন করিয়া মুক্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইত।

(২)

বিমলা প্রথমে রাঁধুনীর মতই এ বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিলেও, বাড়ীর কেহই তাঁহাকে রাঁধুনী বলিয়া মনে করিত না বা অশ্রদ্ধাভাব দেখাইত না, অন্যান্য পোষ্যদিগের মধ্যে তিনিও এক জন বলিয়া গণ্য হইতেন। বৃদ্ধা পিসি, বিধু ও আর আর বিধবাদের রান্নার কাজটাই এখন তাঁহাকে দেখিতে হইত। বাকী সময়টুকু তিনি স্বামী ও ভগবানের চিন্তাতেই কাটাইয়া দিতেন। পিসিমার কন্যা বিধুর ব্যবহারটা অসম্ভব রকম ঝাঁঝাল হইলেও আর সকল বিষয়ে বেশ শান্তিতেই তাঁহার দিনগুলা কাটিতেছিল। কাহারও সঙ্গে বেশী

ভাগ্য-নিরূপিতা

কথা বলা বা পরের কথায় থাকা কোন দিনই তাঁর অভ্যাস ছিল না, চির কালটাই তিনি একটু বেশী রকমই গম্ভীর প্রকৃতির। জ্ঞান হওয়ার পর হইতে এতাবৎ তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বড় একটা পা'ন নাই, তাই স্ত্রীলোকের অনেকগুলি সাধারণ দোষ ও গুণ শিক্ষার সুযোগ তাঁর ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁ'কে চারি বৎসরেরটি দেখিয়াই তাঁর মা মায়ের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বাপ তিরিশ বৎসর বয়সেই পঁয়তিরিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাদের সেই ছোট বাড়ী খানির মাঝখানে একটা উঁচু পাঁচীল তুলিয়া অর্দ্ধেকখানি বার টাকায় ভাড়া দিয়া মাতৃহারা কন্যার লালন পালনের ভার নিজ হাতেই তুলিয়া লইলেন। তারপর যে দিন দশ বৎসরের বিচ্ছেদের পর স্নেহময়ী ভার্য্যার কাছে যাইবার জন্য তাঁহার দেহটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল তখন তাঁহাদেরই পাড়ার ভুবন দত্তের মাতৃপিতৃহীন ভাগিনেয় হরিপদ ঘোষের হাতে কন্যার ভার দিয়া, একদিন তিনি সজ্ঞানে মহা প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর চারি বৎসর হাসি কান্নার ভিতর দিয়া বিমলার বেশ কাটিয়া গেল। তারপর কি কাল জ্বর আসিয়া হরিপদকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া দিল, সে খবর এক বিমলা ছাড়া জগতের আর কা'রও কানে গেল না। বিমলা আট মাস প্রানপণ সেবা, শুশ্রূষা ও হাতের নো'য়াটি মাত্র বজায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়া স্বামীকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফলই হইল না, তখন বিমলা বাড়ীখানা বন্ধক রাখিয়া ডাক্তারের পরামর্শে, পশ্চিমে ঝি মুনিয়াকে সহায় করিয়া মাঘ মাসের শেষাশেষি একদিন কঙ্কালসার স্বামীকে কোলে করিয়া, কান্পুর মল রোডের

ভাগ্য-নিরূপিতা

একখানা ছোট একতলা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরও পাঁচ মাস যমের সঙ্গে লড়িয়াও যখন স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না তখন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও বিমলা মরিলেন না বা চিৎকার করিয়া কোলের অসহায় শিশুটিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন না। এখন কালের প্রলেপে ঘা'টা শুকাইয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহার জ্বালাটা একেবারে সারিয়া যায় নাই। হাল্কা কথায় বা চপল উত্তেজনায় তিনি যোগ দিতে পারিতেন না, পুত্রের উন্নতি দেখিয়াও তিনি বাহিরে কোন রূপ চঞ্চল আনন্দ দেখাইতেন না। বক্ষে মাতৃস্নেহের পীযুষ শতধারে বহিলেও বাহিরে তাহার এক বিন্দুও তিনি অনাবশ্যক খরিয়া পড়িতে দিতেন না। ছেলে বেলায় মোহিত যখন দেখিত তাহার জেঠী (পিয়ারী বাবুর স্ত্রী) সমর বা স্নেহকে বুকে করিয়া স্নেহে, আদরে ও চুম্বনে ছাইয়া ফেলিতেন তখন তাহার প্রাণে একটা ক্ষুব্ধ আকাঙ্খা কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর হইতে আর কখনও তাহার প্রাণে এ ক্ষুধা দেখা দেয় না, সে বুঝিয়াছে তাহার এই স্বভাব-গম্ভীর মা'টির প্রাণে তাহার জন্য কি সুধার ধারা অন্তঃসলিলার মতই অনুক্ষণ নীরবে বহিতেছে, নির্ব্বাক ভক্তিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিত এবং না বুঝিয়া সে এই মায়ের প্রতি কতখানি অবিচার করিয়াছে ভাবিয়া তাহার বালক হৃদয় অনুতপ্ত হইল। তারপর ক্রমে যখন সে আরও বুঝিল মা'র প্রাণের কোন্ খানে একটা ব্যথা গুল্মের মতই জমাট বাঁধিয়া আছে, তখন মা'কে সুখী করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সাধনা হইয়া দাঁড়াইল। তাই সেদিন সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,

খবর পাইয়াও আর পড়িবার আশা না করিয়াই মাকে বলিল—এবার মা একটা চাক্‌রী বাক্‌রীর চেষ্টা দেখি? বিমলার মুখে ক্ষণেকের জন্য একটা প্রসাদ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সেটা ক্ষণেকের জন্যই—স্বাভাবিক কঠিনতা আসিয়া আবার স্বাধিকার বিস্তার করিল। পুত্রের উদ্বিগ্ন মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—না, এখনও সে সময় হয় নি। বরং এখন থেকে নিজের ভার নিজে নিয়ে মাথা উঁচু কর্‌বার যত্ন কর। তোমার জন্ম হলে তিনি বলেছিলেন—প্রথমেই যখন ছেলে হয়েছে ও'কে ভাল ক'রে মানুষ কর্‌তে হবে, দেখো ও হ'তেই একদিন আমাদের এ দারিদ্র্য ঘুচ্‌বে, আমরা অন্ধ কূপের বাহিরে আলোয় গিয়ে দাঁড়াবো। তাঁর সে অভিলাস অপূর্ণ রেখে আমি নিজের মুক্তি চাই না। তাঁর সে সাধ পূর্ণ কর্‌তে চেষ্টা কর, বড় হও, তাতেই আমার আনন্দ, আমার নিজের অবস্থায় আমি এতটুকুও অসন্তুষ্ট নই। আমার জন্য তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না।

মা'কে মুক্তি দিব, সুখী করিব, এই ছিল মোহিতের আবাল্যের কল্পনা। এখন সে দেখিল সম্মুখে তাহার দীর্ঘ পথ, তাহাকে বড় হইতে হইবে, দশজনের একজন হইতে হইবে—এই তাহার মায়ের আদেশ, মৃত পিতার অভিলাষ।

(৩)

জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর, অসহ্য গরম, পথ ঘাট একেবারে নীরব ও প্রায় জনশূন্য। প্রকৃতি যেন সহরের চারিপাশ বেড়িয়া বড় বড়

হাপর জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া আগুণের হল্কা ছুটিয়া আসিয়া পথের উত্তপ্ত ধূলা বালি উড়াইয়া লইয়া সহরের বুকের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই লুইয়ের ভয়ে লোকজন ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সহজে কেহ বাহিরে আসিতেছে না। এ সময়ে রাস্তায় চলা দূরে থাক্ বাহিরের দিকে চাহিতেও প্রাণ যেন শুকাইয়া উঠে। দূরে জনহীন পথে, প্রান্তরে রৌদ্র জাল বুনিতেছে। এমন যে গরম কিন্তু শরীর দিয়া এক ফোঁটাও ঘাম বাহির হয় না—একেবারে শুক্না গরম। সূর্য্যাস্তের পরেও অনেকক্ষণ গরমটা প্রায় সমভাবেই থাকে। তারপর ছাতে খাটিয়া পাতিয়া লোকে নিদ্রার চেষ্টা দেখে।

সমর ও মোহিতের পরীক্ষার খবর বাহির হইবার সপ্তাহ খানেক পরে, আজ দুপর বেলা পিয়ারী বাবুর তাওয়াইখানার (মাটীর নীচের ঘর—গরমেব জন্য এমন অনেক পুরাণ বাড়ীতে আছে) বড় ঘরটিতে একখানা মস্ত দরী বিছাইয়া বুড়া পিসি রামায়ণ পাঠের আসর করিয়া বসিয়াছেন। একখানা ভিজা গামছায় সমস্ত গা' জড়াইয়া পাশে গুলের কৌটা ও পিক্‌দানীর অভাবে একটা খালি বার্লির কৌটা লইয়া তিনি ঝিমাইতেছিলেন। বুকে একটা বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া তন্বী কন্যা বিধু সুর করিয়া গুহক চণ্ডালের সহিত রামের মিলন পাঠ করিতেছিলেন। সেদিকে পিছন করিয়া একটা কাঠের বাক্সের উপর হাত কলটি রাখিয়া মমতা খুকীর ফ্রক্ সেলাই করিতেছিল। সিঁড়ির পাশে যেখানে উপর হইতে খানিকটা আলো পড়িয়াছিল বিমলা একধামা যব লইয়া বাছিতে বসিয়াছিলেন। স্নেহ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া এ ঘরে ঢুকিল,

সটান দরীর উপর গিয়া বুড়া পিসির পাশ ঘেঁসিয়া বসিল। পিসিমা অমনি সজাগ হইয়া উঠিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। স্নেহের চোখে মুখে দুষ্ট হাসি, সে বলিল—কেন ঠাক্‌মা, আমায় ছোঁয়া পড়্‌লেই বুঝি আপনার আবার কাপড় ছাড়তে হবে? আচ্ছা ঠাক্‌মা, এই না বিধুপিসি পড়ছিলেন 'রামচন্দ্র চণ্ডালে দিলেন আলিঙ্গন', তা রামচন্দ্রের তাতে খুবই পাপ হয়েছিল, ক'টা ডুব দিয়ে আর কতখানি গোবর খেয়ে শুদ্ধ হলেন তিনি? পিসিমা বিধুর মুখের দিকে একবার তাকাইলেন—যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে কথা বইএ কিছু লেখা আছে কিনা। কিন্তু বিধু যখন হাঁ না কোনও উত্তর না দিয়া চুপ করিয়াই রহিল, তখন স্নেহের দিকে চাহিতেই ব্যাপারটা বুঝিতে পিসিমার দেরী হইল না, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—দেব্‌তাদের কথায় হাসি ঠাট্টা? দিন দিন মেয়ের আদিখ্যেতা যেন বাড়্‌ছে। রামচন্দর ডুব দিতে, গোবর খেতে যাবেন ক্যানে লা? তিনি না স্বয়ং নারায়ণ।

ঠোঁটের কোণে উচ্ছ্বসিত হাসি লুকাইয়া স্নেহ গম্ভীর মুখে বলিল—ওঃ তাই বলি! রামচন্দ্র যে বিষ্ণুর অবতার, ছোঁয়া ছুঁয়িতে তাঁর ত পাপ হয় না। আচ্ছা এ কি রকম হ'ল ঠাক্‌মা, যে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আপনাদের এ সব শুচিবাই—এ ছুঁয়ো না ও ছুঁয়ো না, অমুকের ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে, মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ হতে হবে, আর সেই দেবতা নিজে ত চাঁড়ালের বাড়ী গেলেন, চাঁড়ালকে বুকে নিলেন, হয়ত তার বাড়ীতে দু'চার খানা চপ্‌ কাট্‌লেটও খেয়ে এলেন, এতে তাঁর পাপ হ'ল না—তিনি অশুদ্ধ্‌ হলেন না; আর, একজন মানুষ

আর একজন মানুষকে ছুঁলেই অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাকে নাইতে হবে কাপড় ছাড়্তে হবে! বেশ মজার শাস্তর ত! এখন থেকে আমি রাস্তায় বেরুলেই যাকে তাকে ছুঁয়ে আস্‌বো, তা' হলে বেশ অনেকবার নাইতে পাব। শীতকালে কিন্তু দু'চার ফোঁটা গঙ্গাজল মাথায় দিয়েই শুদ্ধ হব, সে আগে থেকেই বলে রাখছি, তা হ'লেই চল্‌বে ত ঠাক্‌মা?

—থাম্ থাম্, আর পাকামী কর্‌তে হবে না তোর, তের চোদ্দ বছরের ধেড়ে মেয়ে পথে পথে ঘুরে সত্যিজাত ঘেঁটে আস্‌বেন, বল্‌তে গেলেই অম্‌নি বক্তিমে সুরু করে' দেবেন্। পীরুকে ত বল্‌লে শোনে না, এত বড় আদ্ ধেড়ে মেয়ে, ও'কে অমন ক'রে যার তার সঙ্গে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াতে দিস্‌নে; তা কথা কি ছাই কানে শোনে? বলি, মেয়ে বড় হয়েছে, বে থা দে, তা না উদোম ছেড়ে দিয়ে রেখেছে, মেয়ে যার তার সঙ্গে ইয়ারকী দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা ওরা একবার চোখেও দেখেনা. যেম্‌নি মা তেম্‌নি বাপ। দেশে হ'লে এই নিয়ে কত নিন্দে হত', ধন্যি এদের বুকের পাটা যা' হক।

পিসিমা যে রকম উঁচু গলায় স্বগত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন তাহাতে যে উহা পাশের ঘরে "পিরু"র কানে পৌঁছাইতে পারে এ সন্দেহ মনে আসিতেই তাঁহার মন্তব্যের বিষয়ীভূত স্নেহ সেখান হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইল।

পাশের ঘরে বিশ্রামশায়িত পিয়ারী বাবু পার্শ্বোপবিষ্টা পত্নী লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন, লক্ষ্মীও বিনিময়ে একটু যেন হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

এ ঘরে আরও দু' তিনটি শ্রোতা ছিল, কিন্তু যেহেতু তাহারা জানিত, পিসিমার পক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষে গমন দু'টাই সমান বচন সাধ্য, সেই জন্য তাঁহার এ আলোচনায় কেহই যোগ দেয় নাই। বিধু কথায় সমর্থন করিল না বটে কিন্তু তার কুঞ্চিত নাসিকা ও বক্র দৃষ্টির পাশ দিয়া একটা তৃপ্তির আভা সাপক্ষ ভাবই জানাইতেছিল। মমতা মাথাটা আরও নত করিয়া খুব মন দিয়াই সেলাই করিতেছিল, আর সেলাইএর কাপড় ঠিক করিয়া লইবার সময় অপরের অলক্ষ্যে এক একবার কৌতুক কটাক্ষে ভগিনীর দিকে চাহিতেছিল। স্নেহ যখন ঘর হইতে পলাইয়া গেল, বিমলা একবার চোখ দু'টিমাত্র উঁচু করিয়া তাহার গন্তব্য দিকটা দেখিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে একটা বিরক্তি ভাব ফুটিয়া উঠিল। পিসিমার এই যার তার"টা কাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলা তাহা বুঝিতে বিমলার এখন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না। তাই সমর ও মোহিত যে ঘরে সমস্ত দুপরটা একটা বড় তরমুজ লইয়া আইস্‌ক্রীম মেসিনে তরমুজের বরফ জমাইতে ব্যাপৃত ছিল, স্নেহ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার পিসিমার এতগুলা মন্তব্যের পরেও বোকা মেয়েটার মত সেই ঘরেই গিয়া ঢুকিল দেখিয়া বিমলার মুখ খানা হঠাৎ আরও একটু অন্ধকার হইল। কাহাকেও কিছু না বলিলেও তিনিত মনে মনে স্পষ্টই জানিতেন, পিসিমা ও তাঁহার কন্যা বিধু এ বাড়ীতে পা দিয়া অবধি তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট নহেন। ভাইপোর সংসারে এই অনাবশ্যক পরটি বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে, বোকা ভাইপোবৌটিও এই নিতান্ত পরটির হাতে এত বড় স্বচ্ছল সংসারের ভাঁড়ারটি ছাড়িয়া

দিয়া রাখিয়াছে, আসিয়াই প্রথমে এটা পিসিমার চোখে কেমন কেমন ঠেকে। যে রাঁধুনীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাঁধুনীর মতই রাখা উচিত ছিল; তাহা না করিয়া তাহাকে একেবারে সংসারের গৃহিনী করিয়া দেওয়া ও তাহার ছেলেকে অত খরচ পত্র করিয়া পড়াইবার হেতুটা যে কি, অনেক চেষ্টাতেও তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্রথমে বিমলার বয়স ও সুন্দর মুখখানাই ইহার কারণ বলিয়া তাঁহার মনে হয়, কিন্তু অনেক কড়া পাহারাতেও এতটুকু ভিত্তি খুজিয়া না পাইয়া অগত্যা সে ধারণা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহা হউক, তবুও বিমলার উপস্থিতিটাই তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, তাই পাকে প্রকারে, প্রথমে ঠারে ঠোরে, পরে একরকম স্পষ্টাস্পষ্টিই তিনি ভাইপো ও ভাইপো-বৌ'য়ের ভুল ভাঙ্গিয়া সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কন্যা বিধুকেও উপদেশ দিয়াছিলেন, 'বিমলি' ভাঁড়ার চুরি করিয়া বা তদ্রূপ অন্যান্য উপায়ে দু'পয়সা হাতে জমাইতেছে কিনা সেদিকে সতর্ক পাহারা রাখিতে। আরও বিধুকে তিনি আশা দিয়াছিলেন কোনও গতিকে এই আপদটাকে তাড়াইতে পারিলে ভাঁড়ারের ভারটা বিধুরই হাতে পড়িবে। বৌ ত ঐ একরকম, চিরকালটাই সে নিজের সংসারে পরের মতই থাকে। কিন্তু কিছুতেই যখন আপদটাকে দুর করা গেল না তখন সমস্ত বিষটাই গিয়া পড়িল বিমলার উপর। বিধুর ঝালের কারণও ইহাই। প্রকাশ্যে কোনও রকম অত্যাচার করিতে সাহস না হইলেও খোঁচাটা, চিমটিটা দিতে মায়ে ঝিয়ে কেহই কম করিতেছিলেন না। মোহিতকে উপলক্ষ করিয়া আজকাল একটা বেশ সুযোগও মিলিয়াছিল।

ইঁহাদের খোঁচাখুঁচিতে বিমলার মনেও আজকাল একটা দুর্ভাবনা উঁকি দিতেছিল। মোহিত ও স্নেহের শৈশব-কৈশোরের এই উন্মুক্ত মেলামেশা ও ভ্রাতাভগিনী প্রীতিটা এখন যৌবনের উন্মেষে যে অন্য আকারে পরিণত হওয়া একেবারে বিচিত্র নহে এ আশঙ্কা ইদানীং পিসিমার অনুক্ষণ ইঙ্গিত, তাঁহার মনে সজাগ করিয়া দিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কাহাকেও বলিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। অষ্টাদশ বর্ষীয় মোহিতের মনে যাহার অস্তিত্ব একেবারে হয়ত নাও থাকিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাকে অনাবশ্যক সতর্ক করিবার লেশমাত্র প্রয়াস যে, জোর করিয়া তাহার চিন্তাকে সেই দিকেই ধাবিত করাইতে পারে, এ কথাটা বিমলার কাছে খুবই সহজ ছিল। স্নেহের সহিত এখন এতটা মাখামাখি ভাবে কিছু যে বিসদৃশ্যতা বা অস্বাভাবিকতা থাকিতে পারে একথা মোহিতকে বলিয়া দেওয়া আর তাহার সুপ্ত অথবা ভিন্ন পথগামী মনটাকে সজাগ করিয়া এইদিকে টানিয়া আনা একই কথা। স্নেহ ও সমরের মধ্যে ভ্রাতা ভগিনী ছাড়া অন্য কোন ভাবের কল্পনাও যেমন অস্বাভাবিক, সম্ভবতঃ আশৈশব ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় একত্র বর্দ্ধিত মোহিত ও স্নেহের মধ্যেও অন্য ভাবের সম্ভাবনাও তেমনই অসম্ভব। বিমলা ভাবিতেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই করিতে পারেন না বটে, কিন্তু অপর পক্ষে স্নেহের মা বাপ কোন নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত না করিয়াও তাঁহাদের এই যৌবনোন্মুখী কন্যার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার একটু সংকোচ করেন না কেন? তাঁহাদের মনে কোনও আশঙ্কা বা সন্দেহ না থাকিতে পারে কিন্তু অপরের যে এটা ভাল ঠেকে না, একথা কি তাঁহারা পিসিমার ইঙ্গিতেও বুঝিতে পারেন না? তবে

কেন তাঁহারা এদিকে লক্ষ্য দেন না? ইহার কোন সঙ্গত কারণই বিমলা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

(৪)

ভগিনীপতি রাজাবাবু যখন আর আর সম্পত্তির সহিতই পিয়ারীবাবুর অধিকারগত হইলেন, পাছে সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় এই ভাবিয়া পিয়ারী বাবু তাঁহার চকের ছোট বাড়ীখানি ভগিনী ও ভগিনীপতির বাসের জন্য নির্দ্দেশ করেন এবং মাসিক পঁয়তিরিশ টাকা মাসহরা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এক পক্ষে এ ব্যবস্থাটা সমীচীন হইলেও ইহাতে একটু গলদ হইয়াছিল। চির দিন পরের সংসারে পরান্নেপুষ্ট হইয়া এই বৃহৎ সংসারটির কেহই অবস্থানুযায়ী চলিতে শিখে নাই। মাসের দশ দিন যাইতে না যাইতেই সারদাকে স্বামী পুত্রের অন্নের জন্য আবার ভ্রাতার শরণাপন্ন হইতে হইত। বার বার ভ্রাতার নিকট হাত পাতিতে প্রথম প্রথম তাঁহার বড়ই লজ্জা হইত, ভ্রাতা বিরক্ত হইলে বড়ই অভিমান হইত। কিন্তু অভুক্ত পুত্রকন্যাদের মুখ চাহিয়া পরদিনই আবার আসিয়া হাত পাতিতে হইত। পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দেখিয়া পাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না লইয়াই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতা রাজালাল যখন বুঝিলেন স্বচ্ছল শ্বশুর গৃহই তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদনের প্রকৃষ্ঠ স্থান, তখন তিনি একদিন একটু আয়াস স্বীকার করিয়াই এই নবলব্ধ রাজ্যে আসিয়া আঁটিয়া বসিলেন। ওদিকে, বাড়ীতে যাহা কিছু বিষয় আশয় ছিল তাঁহার

এক খুড়্তুতো ভাই জমিদারের বাকী খাজনার দোহাই দিয়া বেশ ধীরে সুস্থে সবটাই গ্রাস করিলেন। শ্বশুর শাশুড়ির মৃত্যুতে দিন কয়েক বুঝি রাজাবাবুর একটু দুর্ভাবনাও হইয়াছিল, হয়ত এবার নূতন বন্দোবস্তে তাঁহাকে স্বাধিকার চ্যুত হইতে হয়। কিন্তু পিয়ারী বাবু পিতার আমলের বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া যখন অন্যান্য পোষ্য ও কুপোষ্যদের সহিত ভগিনীকে কানপুরে লইয়া চলিলেন, তখন রাজাবাবুও পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। এখানে আসিবার দিন কয়েক পরে পত্নীর অনুরোধে ও নিত্য অনটনে বাধ্য হইয়া একবার তিনি কাজ কর্ম্মের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। পিতার তাড়নায় বাধ্য হইয়া স্কুলে যাইতে হইত, কিন্তু থার্ড ক্লাসের উপর উঠিতে নিহাত অনিচ্ছা থাকায় বৎসর চারেক উক্ত ক্লাসের শোভাবর্দ্ধন করিয়া আঠার বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া গেলেই স্কুল ত্যাগ করেন; তাহার পর গত বাইশ বৎসর তিনি মা সরস্বতীর কোন ধারই ধারেন নাই। সুতরাং চাকরীও দুর্ল্ভ্য হইল। পিয়ারী বাবু এতদিন পরে ভগিনীপতির এতটা সুমতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং বৃথা চাকুরীর চেষ্টায় এ শুভ সুযোগ নষ্ট না হয় এই মানসে, আট শত টাকা মূলধন দিয়া রাজা বাবুকে একটা কাঠের গোলা করিয়া দিলেন। কাল টিনের উপর বড় বড় হরফে R. L. Mitter & Co., Timber Merchants সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া রাজাবাবু ব্যবসা সুরু করিলেন। বৎসর-খানেক বেশ কেনা বেচা চলিতে লাগিল। সংসারের অবস্থা ফিরিল, পিয়ারী বাবুও মনে মনে ভাবিলেন—যা'ক সারদাটাকে ভবিষ্যতে আর কারও কাছে হাত পাতিতে হইবে না।

একদিন সন্ধ্যারপর রাজা বাবুর মহাজন মাড়োয়ারী বিশ্বেশ্বর লাল পিয়ারী বাবুর সহিত দেখা করিয়া বলিল—আপ্ রাজা বাবুকে মুরুব্বী হেঁ্য ইস্‌লিয়ে ম্যায় আপ্‌সে কহতাহুঁ কি মেরা উন্‌সে পয়সালকে হিসাবকা এগারাশো রুপেয়া পাওনা হ্যায়, ম্যায় ত তকাজা কর্‌তে কর্‌তে হয়রাণ হো গ্যায়া, আপ বড়ে আদমী হ্যায় রুপেয়া দেদীজিয়ে নেহিত মুঝে নালিস্ কর্‌নী পড়েগী।

বিশ্বেশ্বর লালকে দিন কয়েক পরে দেখা করিতে বলিয়া দিয়া পিয়ারী বাবু তৎক্ষণাৎ রাজা লালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজা লাল আসিলে দোকানের হিসাব পত্র দেখিতে চাহিয়া পিয়ারী বাবু অবাক হইয়া গেলেন, এই ত সামান্য কারবার, মুখে মুখেই সব হিসাব হইয়া যায়, মিছামিছি কতকগুলা খাতা পত্রের হাঙ্গাম করিয়া লাভ কি! অগত্যা পিয়ারী বাবু দোকানের মজুত কাঠগুলা আড়াই শত টাকায় বিক্রয় করাইয়া বাকী সাড়ে আটশত টাকা আক্কেল সেলামী হিসাবে উক্ত মাড়োয়ারীকে দিয়া সে যাত্রা রাজা বাবুর "সামান্য কারবার" উঠাইয়া দিলেন। পিয়ারী বাবু হিংসায় এরূপ করিয়া এমন উঠ্‌তি কারবার বন্ধ করিলেন—রাজা-বাবু বড়ই চটিয়া গেলেন।

কিন্তু সারদার বুঝিতে বাকী রহিল না দাদার এই হিংসা তাঁহার স্বামীকে জেল হইতে বাঁচাইল। ইহার দিন কয়েক পরে সারদা তাঁহার বিবাহের যৌতুক, এক ছড়া হার ও বালা জোড়া পেট্‌কোঁচড়ে বাঁধিয়া দাদার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। দুপর বেলা আহারের পর ভ্রাতাকে নির্জ্জনে পাইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন—কারবারে তোমার প্রায় হাজার টাকা লোক্‌সান্ দিতে হয়েছে শুনলুম;

২

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন নানা রকমে তাঁকে ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছি, এখন সব রকমে তোমাকেও আবার হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্ছি। কী ধিক্কার নিয়ে যে আমি বেঁচে আছি দাদা,—শুধু ছেলেমেয়ে গুলোর মুখ চেয়েই, তা ওদের একটাও কি মানুষ হবে এমনই বরাৎ নিয়ে জন্মেছি আমি!

আনীত গহনাগুলি বাহির করিয়া বলিলেন—তোমাদেরই দেওয়া এই গয়্না দু'খানাই এখন সম্বল ছিল, মনে করেছিলুম মেয়েটার ত চৌদ্দ বছর বয়স হতে চল্লো, যাক সে পরের কথা। তুমি যদি কিছু মনে না কর ত দাদা, এ দিয়ে দেনার যে ক'টা টাকা শোধ হয় —

পিয়ারী বাবু খাটের উপর শুইয়াছিলেন, পাছে কেহ আসিয়া পড়ে সেই ভয়ে সারদা এতক্ষণ বার বার বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দাদার গম্ভীর দৃষ্টি তাঁহারই মুখের উপর নিবদ্ধ হঠাৎ এবার নজর পড়াতে সারদার রক্ত শূন্য মুখখানি আরও খানিকটা সাদা হইয়া উঠিল। আর একবার বাহিরের দিক্টা দেখিয়া লইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন—ক'টা টাকাই বা হবে, তবুও যা হয়, এমনইত সাত গুষ্টীকে পুষ্তে হচ্ছে, তার ওপর এত বড় একটা দেনার ভার তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যারা নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে তামাক খেতে পারে তাদের কথা ধরিনে, কিন্তু সত্যি বল্ছি দাদা, ঘেন্নায় আমার এক তিল্ও বাঁচ্তে ইচ্ছে নেই।

পিয়ারী বাবু নীরবেই ছিলেন। একটা ভুতের হাতে পড়িয়া এতগুলা টাকা জলে গেল সে আপশোষ এখন তাঁহার মনে ততটা হইতেছিল না যতখানি আপশোষ তাঁহার এই শান্ত, স্নেহশীলা

ভগিনীটির সেই ভূতেরই হাতে পড়িয়া দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল। পিতার কৃত ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও অনেকখানি অভিযোগ আজ তাঁহার মনে উঠিতেছিল। বলিলেন—তোমাদের ভাব্‌না তোমরা ত এক দিনও ভাব'নি বাবা যত দিন ছিলেন, তিনি ভেবে গেছেন, যতদিন পারি আমিও তোমাদের হ'য়ে ভাব্‌বো।

দাদার বিরক্তভাবে সারদার মুখ চূণ হইয়া গেল। মিনিট তিনেক অপেক্ষার পরেও যখন দাদা আর কিছুই বলিলেন না, তখন সারদা অগত্যা গহনা গুলি আবার কাপড়ের মধ্যে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইতি পূর্ব্বেই তাঁহার চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা অথবা তাঁহার দুরদৃষ্টে দাদার এই নিষ্ঠুর ইঙ্গিত, কোন্‌টি যে এই জলের হেতু, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না। পাছে দাদার সম্মুখেই চোখের জলটা ঝরিয়া পড়ে সেই ভয়েই তিনি তাড়া তাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সত্যই এই সহ্যশীলা গুণবতী রমণীটি অবস্থাপন্ন পিতার ঘরে জন্মিয়া, এমন সদাশিব ভ্রাতার ভগিনী হইয়া, রূপবান স্বামী ও আশার অতিরিক্ত পুত্রকন্যা পাইয়াও এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। পূর্ণাঙ্গ, সক্ষম স্বামী বর্ত্তমানেও চির কালটাই এমন করিয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে সারদার মনে বড়ই বাজিত। স্বামী কিছু করিবেন না, বসিয়া বসিয়া সাতগোষ্ঠিতে মিলিয়া শ্বশুর, শালার অন্ন নির্বেদ ভাবে ধ্বংস করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিবেন না, এ হীনতা তাঁহার চোখে বড় তীক্ষ্ণ ভাবেই খোঁচা দিত।

ভাগ্য-নিরূপিতা

প্রথমে পুত্র হইয়াছিল, সে মানুষ হইবে একদিন মায়ের মনোকষ্ট দূর করিবে এ আশাও সারদাকে এখন বড় দুঃখেই বিদায় করিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীকান্ত তের বৎসর বয়সেও যখন সিক্সথ্ ক্লাসের উপর যাইতে পারিল না, তখন তাহার মামা তাহাকে একটা টেক্‌নিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু এই চার বৎসরে মিস্ত্রিদের সঙ্গে তামাক খাওয়া আর যত কুৎসিত আলোচনা করা ছাড়া সে যে আর কিছু শিখিয়াছে এমন বোধ হয় না। তারপর ইন্দু, সে রূপে সরস্বতী ও গুণে লক্ষ্মী না হইলেও তাহার মত মেয়ে পাইলে অনেক ধনী মা বাপও গর্ব্ব অনুভব করিতেন। তাহার প্রায় বৎসর তের বয়স হইল, যাহার তাহার হাতেই বা এ সোনার প্রতিমা কেমন করিয়া তুলিয়া দিবেন, আর তাহাই বা কেমন করিয়া ঘটিয়া উঠিবে? আজ কাল সারদার এই আর এক দুর্ভাবনা হইয়াছিল। দেশে থাকিলে, কন্যার রূপ দেখিয়া হয়ত বিনা পণেই কেহ তাহাকে দয়া করিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু এ বিদেশ, এখানে কড়ি ফেলিলেও ভাল পাত্র পাওয়া যায় না, তা বিনা পয়সার কথা ত দূরে থাকুক্। কন্যার বাড়ন্ত গড়ন দেখিয়া স্বতঃই একটা দুর্ভবনা মনে উঠিয়া সারদার পেটের ভাত চাল করিয়া দিত। দাদার-ও ত কন্যাদায়, স্নেহও ত বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, তাঁহার ঘাড়ে আর কত ভার দেওয়া যায়? ভাবিয়া ভাবিয়া সারদার মন যেন বিকল হইয়া গিয়াছিল। নিজের অদৃষ্ট মন্দ, বার বার আশার স্বপ্ন অতি নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এখন আর কোনও বিষয়ে কাহারও উপর আশা করিতে

তাঁহার ভরসা হয় না। অভ্যাসবশে সংসারের কাজগুলা আপনা হইতেই তিনি করিয়া যান, সংসারে আর তাঁহার বড় একটা আস্থা নাই।

(৫)

নিত্যকার মত আজও সকাল না হইতেই রাজাবাবু হুঁকাটি হাতে করিয়া, সময় কাটাইবার জন্য পোষ্ট মাষ্টারের বাসা উদ্দেশ্যে বাহির হইতেছিলেন।

ঘরে চাল, আটা কিছুই ছিল না, সারদা মাসের বাকী সাত দিনের সম্বল টাকা তিনটি স্বামীর হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন,—ঘরে কিছুই নাই আজ যেন একটু সকাল সকাল ফিরিয়া একেবারে বাজার করিয়া আসেন।

বাজার আসিলে আঁচ্ দিবেন মনে করিয়া সারদা একটু বেলাতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দশটার সময় আড্ডা হইতে ফিরিয়া, এখনও রান্না হয় নাই দেখিয়া শচীকান্ত জীবন্ত মায়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ছোট ছেলেটি মেয়েটি অনেকক্ষণ হইতেই জ্বালাতন করিতেছিল —কাল রাত্রেই আটা ফুরাইয়াছে, সকালের জন্য তাহাদের রুটী রাখা হয় নাই। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, তাহাদের জ্বালাতনও বাড়িয়া উঠিল। যখন একেবারে অসহ্য হইল সারদা তখন ছাদে গিয়া শিকল বন্ধ করিয়া সেই রৌদ্রে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভিজা কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল, আর তাঁহার মনটাও ততক্ষণ শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিতে ছিল।

ভাগ্য-নিরূপিতা

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা কি বারটাই হইবে, এমন সময় নীচে হইতে স্বামীর কণ্ঠস্বর সারদার কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। আরও মিনিট দুই নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিয়া সারদা নিঃসাড়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। পাঁচ সাতটা সিঁড়ি তখনও নামিতে বাকী আছে, সেখান হইতেই উঠানে নজর পড়িতে তাঁহার মনে হইল এইখান হইতেই এক লাফে উঠানের ঐ পাথরের সানে আছড়াইয়া পড়েন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পা দুটা যেন হঠাৎ পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া গেল, রেলিং ধরিয়া তিনি থপাস্ করিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। ওদিকে উঠানে তখন মহা কলরব উঠিয়াছে। রাজাবাবু মুটিয়ার ঝাঁকা হইতে একে একে খাবারের ঠোঙা, দৈ, মালাইয়ের ভাঁড় ও দশ পনেরটা আম নামাইয়া ইন্দুর আনীত পাত্রে রাখিতেছেন, আর ভাঙ্গা চুরা দু' একটা টুক্‌রা বুভুক্ষু ছেলে মেয়েদের হাতে দিতেছেন। ছোট খুকী এক গালেই একটা সন্দেশ পূরিয়া দিয়া আবার হাত পাতিতেছে দেখিয়া ইন্দু তাহার নিজের ভাগটাও তাহাকে দিল। কলতলার পাশে শচী মস্ত একটা মাছের কান্‌কোর মধ্যে হাত দিয়া উঁচু করিয়া তুলিয়া সেটা ওজনে চার সের কিম্বা আট সের সে বিষয়ে হাত চাটিতে ব্যস্ত সেজ'কে নিজের মতামত জানাইতেছিল।

একে একে সব জিনিসগুলি তোলা তাঙ্গ্‌ড়ান হইয়া গেলে রাজা বাবু এদিকে ওদিকে চাহিয়া শেষ কালে সিঁড়ির উপর তদবস্থ সারদাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ওগো, বেলা অনেক হয়ে গেছে, চট্ করে রান্নাটা চড়িয়ে দাও, তা এখনও

উনুনে আঁচ পড়েনি কি জন্যে? যাক্ আঁচ দিতে রাঁধ্তে ত বেলা গড়িয়ে যাবে। তা এক কাজ কর, ততক্ষণ বাবাজিকে একটু জল টল্ খেতে দাও, দুদিন ত তার পেটে অন্ন পড়েনি। ওরে ও ইন্দু বাইরে তোর দেবেন দাদাবাবুকে হাত পা ধোবার জল দিয়ে আয়্।

হুঁকার কলিকাটি বদলাইয়া লইয়া—যাই বাবাজী এতক্ষণ একা বসে আছেন, বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বসিয়া বসিয়া এসব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সারদার দেহ অসাড় পাথর হইয়া গেলেও মনের তাঁহার নিস্তার ছিল না। কে আসিয়াছে, তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে, তাই সংসারের বাজার না আসিয়া এই ভোজের আয়োজন আসিয়াছে। ঘরে যে আজ একেবারেই চাল বাড়ন্ত, চালের চেয়ে আটা সস্তা, তাই যে ক'টা টাকা পয়সা ছিল সকাল বেলা স্বামীর হাতে দিয়া চালের বদলে আটাই আনিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, এক বেলার জায়গায় এ কয়টা দিন না হয় দু'বেলাই রুটীর ব্যবস্থা করিয়া কাটাইয়া দিবেন। বাজার ত আসিল কিন্তু চাল কি আটা কিছুই ত তিনি দেখিলেন না। এই দ্বিপ্রহর বেলা এখন কি রাঁধিবেন, ক্ষুধার্ত্ত স্বামী পুত্রদের কি খাইতে দিবেন, শুধু মাছ আর দুটা সন্দেশে কি হইবে? নিজেদের না হয় উপোস করিয়াই কাটিত কিন্তু অভুক্ত অতিথির সৎকার কিরূপে হইবে?

এই অতিথির পরিচয়ও যাহা কাণে গেল তাহাতেই সারদার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ইন্দুকে উনি বলিলেন না, তোর দেবেন দাদাবাবু? কিন্তু সে কেন? এখানেই বা কেন? যাহার সঙ্গে

যাহাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক তাহারা ত এই চারি বৎসর, তাহারই দুষ্কৃতির জন্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। তবে আবার কোন্ সাহসে সে এতদিন পরে কালামুখ লইয়া উপস্থিত হইল? আসিলই যদি তবে যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল তাহাদের কাছে না গিয়া এখানে কেন?

ভাবিয়া ত সারদা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় শরীরে যেটুকু রক্ত ছিল তাহাও একেবারে জল হইয়া উঠিল। স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁহার মাথা মুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। দেবেনকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনায় হয় ত দাদাকে অপমান করা হইল, তিনি কত অসন্তুষ্ট হইবেন। আবার দেবেনের যদি এতদিনে মতি গতি ফিরিয়াই থাকে, তবে বাড়ীতে পাইয়াও তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করাটা উচিত হয় না। কেমন করিয়া কি করিবেন, কি করাই বা উচিত, সারদা ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেছিলেন না।

এখনও কেন জামাইয়ের জন্য জল খাবার পাঠান হইতেছে না জানিবার জন্য রাজালাল আবার বাড়ীর ভিতর আসিলেন, তখনও সারদা সেই ভাবে সিঁড়িতে বসিয়া আছেন দেখিয়াই সহজরাগী রাজালাল চটিয়া গেলেন—ব্যাপার খানা কি শুনি? বেলা দুপ'র গড়িয়ে গেল, এখনও চুলোয় আঁচ পড়েনি, বলে গেলুম জামাই বাড়ী, চট্‌পট্ যোগাড় জাগাড় কর্‌তে, কথা বুঝি গ্রাহ্য হ'ল না, কেমন? ও সব নবাবী এখানে খাট্‌ছে না, নবাব ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে খাট্‌বে। এখনো কথা কাণে যাচ্ছে না, নিকালো হারামজাদি—আবি নিকালো।

অবশ্য চাপা গলায় এ আস্ফালনটা হইল না, বাহিরে এক জন ভদ্রলোক—তাঁহারই কথিত “নবাবের” জামাই বসিয়া আছে এ খেয়াল তখন তাঁহার মাথায় ছিল না। যাহারা পরের অনুগ্রহে পুষ্ট, পরান্নদাস, তাহাদের এরূপ উষ্মা ভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, একটুতেই তাহারা অপমানিত হয়, মনে মনে তাহারা ত জানে তাহাদিগকে অবহেলা উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করিবার লোকের পক্ষে যথেষ্ট কারণই আছে। বিষহীন সর্প ফোঁস ফোঁসানি দেখাইয়াই যেমন নিজের বিষহীনতা ঢাকা দেয়, তেমন করিয়া ইহারাও পরাধীনতাপুষ্ট মুখে ক্রোধের মুখোস পরিয়া প্রভুত্ব দেখাইতে চায়।

স্বামীর স্বভাব সারদা ভালই বুঝিতেন, শত অকথা কুকথা ও গালি মন্দে তাই তিনি এক দিনও উত্তর করিতেন না। আজ কিন্তু সকাল হইতেই মনটা বড়ই তিক্ত হইয়া ছিল, এখন এই অকারণ গালি গালাজ ও কুটুম্বের ছেলের কানের উপরেই স্বামীর এত খানি বাড়াবাড়ি সারদার অসহ্য হইল, ক্রোধে ও ধিক্কারে তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। তড়িৎ বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বাক্যনিঃসরণের চেষ্টা করিতেই বাহিরের দরজার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। থতমত খাইয়া, স্থানচ্যুত ঘোমটাটি তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া ত্রস্তপদে তিনি পাশের একটি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। লজ্জায়, ঘৃণায় তাঁহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল।

রাজাবাবুর আস্ফালন বাহিরে দেবেনের কানে পৌঁছাইয়াছিল, পাছে তাহারই জন্য রাজাবাবু একটা মারপিট করিয়া বসেন—

দেবেন সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেছিল। এদিকে রাজা বাবু হঠাৎ আজ সারদাকে ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সারদা অমন করিয়া সহসা ত্রস্তপদে কেন অদৃশ্য হইলেন, কারণ অনুসন্ধানে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন "বাবাজী" দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া। দেবেন বলিল—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন পিসেমশায়? সত্যই ত এই বেলা বারটার সময় থাম্‌কা এসে ওঁদের বড়ই বিব্রত করেছি।

—আহা হা সে সে কি কথা বাবাজি, বিব্রত করবে কেন? ফির্‌তে একটু দেরী হয়েছে, এদিকে অমনি রেগে আগুণ. নিতাই ভায়ার ওখানে গল্প গুজবে উঠি উঠি করেও আট্‌টা বেজে গেল, তারপর ডাকের কি গোলমাল হয়েছে, ভায়া বল্‌লে, চল না দাদা, একবার চট্ করে ষ্টেসন থেকে ঘুরে আসি। ষ্টেসনে বাবাজির সঙ্গে দেখা, তাড়াতাড়ি মাছ্‌টা আস্‌টা কিনে বাড়ী ফির্‌লুম। সেও ত ঘণ্টাখানেকের কথা। কোথায় তাড়াতাড়ি জামাইয়ের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করবেন তা না বসেই আছেন। বলত বাবাজি, এসব কি বরদস্ত হয়? দুদিন রেলের কষ্ট, খাওয়া হয়নি, তা এখন কখন যে পেটে দু'টো ভাত পড়বে তার ঠিক নেই।

আজ এ বাড়ীতে দু'টো ভাতেরই যে অসম্ভাব, দেবেন তাহা জানিত না, সে রাজাবাবুর ক্রোধ শান্তির জন্য বলিল—তা সে যখন হয় হবে'খন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ষ্টেসনে নেমে খান কতক টোষ্ট্ আর এক কাপ চা খেয়ে নিয়েছি, খাবার আমার এখন তত তাড়া নেই। চলুন বাইরের ঘরে গল্প গুজব করা যাগ্‌গে, ওঁরা ততক্ষণ ধীরে সুস্থে যোগাড় যন্তর করুন।

—তাই চল তাই চল, যাইতে যাইতে সারদাকে শুনাইয়া বলিয়া গেলেন—ওরে ইন্দু শীগ্‌গির রান্না চড়িয়ে দিতে বল্।

কয়েক মিনিট পরে সারদা প্রশান্ত মুখে বাহিরে আসিলেন। পাশের বাড়ীর জান্‌কীর মায়ের নিকট হইতে খানিকটা ঘি ও আটা সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই খাবার প্রস্তুত করিয়া রাজাবাবু ও দেবেনকে আহারের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আহারে বসিয়া দেবেন অল্পই আহার করিল। সারদা দেখিলেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সেই হৃষ্টপুষ্ট দেবেন এখন একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, সহজে তাহাকে চেনা যায় না। খাইতে খাইতে দেবেন নিজে হইতেই অনেক কথাই বলিল, —সম্প্রতি সে খুব বড় অসুখ হইতে উঠিয়াছে, এখনও শরীর শুধরায় নাই, মাস কতক হইল তাহার জ্যেঠা মশহায় মারা গিয়াছেন, তাহাদের কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়া সে এখন দেশে, বিষ্ণুপুরেই বাস করিতেছে—ইত্যাদি। কিন্তু কি মনে করিয়া চার বৎসর পরে হঠাৎ আজ তাহার আগমন, বরাবর শ্বশুর বাড়ী না গিয়া এখানে উঠিবার কারণই বা কি সে কথা সে কিছুই ভাঙ্গিল না।

বিকাল বেলা, ও বাড়ীতে দেবেনের আগমন সংবাদ দিবেন কিনা সারদা সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় সেজ'র সঙ্গে দেবেন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। পায়ের কাছে এক খানা দশ টাকার নোট রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেবেন বলিল—রোদ পড়ে গেছে, আস্তে আস্তে এবার ও বাড়ীতে যাই। আপনাকে খুব খানিকটা কষ্ট দিয়ে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

দালানের একধারে ইন্দু আলো বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দেবেন বাহির হইয়া গেল।

(৬)

সন্ধ্যা বেলা কাপড় কাচিয়া মমতা কল ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখিল, অস্পষ্ট আলোকে কে যেন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। বাড়ীর কেহ যে নয়, তাহা তাহার জুতার মস্ মস্ শব্দেই মমতা বুঝিতে পারিল। কিন্তু এমন সময় কে আবার কাহাকেও ডাকা না বলা না একেবারে উপরে উঠিয়া যাইবে? একটু আড়ালে গিয়া সে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি, উপরের একটা ঘর হইতে খানিকটা আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। আরোহনকারী চকিতে আলোর মধ্যে আসিয়া তখনই পরের ধাপে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের অস্পষ্ট দেখাতেই মমতার বুক কাঁপিয়া উঠিল।—ও কে! না, এতকাল পরে অমন চেহারা লইয়া সে আবার কোথা হইতে আসিবে! দেবেনের শীর্ণ শরীর, ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, চোখে চসমা, তবুও সেই একমুহূর্ত্তে মমতা তাহাকে চিনিল। তাহার সারা প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল, কণ্ঠতালু যেন শুকাইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতসারে সে কখন কলঘরের চৌকাঠ ধরিয়া বসিয়া পড়িল। সে ত আজ অনেক দিন হইল দেবেনের সঙ্গে তাহার সব বোঝা পড়া চুকিয়া গিয়াছে; দেনা পাওনা সব মিটিয়া গিয়াছে। এই চার পাঁচ বৎসর মমতা যে অন্য হাটে ভিন্ন পণ্যের কারবার লইয়া আছে, তবে আজ

আবার হঠাৎ কোথা হইতে বিস্মৃত পাওনার মত দেবেন আসিয়া উপস্থিত হইল ?

এত দিনের সময়ের সংমিশ্রণে দেবেনের ব্যবহারের তিক্ততা বুঝি মমতার নিকট অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল ; নিজেকে সে এতদিন বিধবা মনে করিয়াই আসিয়াছে—দেবেন যে ভাবে তাহার জীবন পাত্রে গরল ঢালিতেছে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে পাত্র যে অচিরেই ছাপাইয়া যাইবে এ সম্ভাবনাও ত কম ছিল না। এই চার বৎসর তাহার কোন খবরইত এখানে আসিয়া পৌঁছায় নাই, সে জন্য মমতারও ত কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। কিন্তু এত কাল পরে আজ সহসা পরিত্যক্ত বিস্মৃত স্বামীকে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে এই এক নিমেষেই এ কেমন ভাব হইল ? হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতায় মমতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিল।

আলো হাতে মাকে নীচে নামিতে দেখিয়া মমতার চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গায়ে মাথায় হুড়হুড় করিয়া পাঁচ সাত বালতি জল ঢালিয়া দিল।

—হয়েছে, হয়েছে বাপু, আর জল ঢালিস্ নে। সেই কোন্ কালে ঘরে ঢুকেছিস্ এখনও তোর গা ধোয়া হল না ! এ কি চান্ করলি নাকি এই সন্ধ্যেবেলা ? কি হয়েছে তোর মমি ? মেয়ের সব তাতেই যেন বাড়াবাড়ি।

একটা আশঙ্কা করিয়া তিনি নীচে আসিয়াছিলেন, কন্যার মুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর বুঝিতে বাকী রহিল না, তাঁহার সে আশঙ্কা অমূলক নহে। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধতার

ন্যায় কন্যার মুখে একটা অস্বাভাবিক ঘন ছায়া দেখিয়া উদ্বেগে লক্ষ্মীর অন্তর শিহরিয়া উঠিল। মেয়ে আজ না জানি, আবার কি একটা অসাধারণ কাণ্ড ঘটাইয়া বসে, ভয়ে তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কন্যাকে কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া তিনি রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

বিমলা লুচি বেলিয়া দিতেছিলেন, লক্ষ্মী আসিয়া ধপাস করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলেন—কি হবে বিমলা ?

বিমলা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলেন।—কিসের কি হবে দিদি ?

—দেবেন এসেছে যে।

—দেবেন ? কে, জামাই দেবেন ? কখন এলেন তিনি ?

—পিস্‌ঠাক্‌রুণের ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে পিদ্দীম্‌টা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছি, দোর গোড়ায় পা দিতেই কে একটা বাবু পা' দুটো চেপে ধর্‌লে, ভয়ে পিদ্দীম্‌টা বুঝি তার পিঠেই ফেলে দিয়েছি। সে উঠে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—চিন্‌তে পার্চ্ছেন না মা, আমি দেবেন। আমি ত একেবারে অবাক্;—হুঁস্ হলে, তাকে বসিয়ে, তাড়াতাড়ি মমীর খোঁজে নীচে এলুম। আগেই দেখ্‌তে পেয়েছে বুঝি—তার মুখের যা' ভঙ্গি দেখে আস্‌ছি, তা'তে ত ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। তা' কি হবে'খন ব'ন ? উনি ত কোথায় ডাকে বেরিয়েছেন, আস্‌বেন ত সেই কত রাতে। এখন আমি কি করি বল্‌তো ?

বিমলাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—উঃ কী চেহারাই হয়েছে দেবেনের! সে রং নেই,

মাথাটা বুঝি নেড়া. অমন নাদুস্ নুদুস্ ছিল, একেবারে রোগা কাঠ হ'য়ে গেছে, চোখে আবার একটা কেমনতর কাল চস্‌মা, সে বেশ বিন্যেসও নেই! চার পাঁচ বছর পরে দেখা, তা চিন্‌বো কি করে বল্ দিকি?

বিমলাও প্রথমে এই অসম্ভাবিত সংবাদে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে নাকি, যত বড় কারণই হউক তিনি কখনও বিমূঢ় হইতেন না, সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন,—অত উতলা হচ্ছ কেন দিদি? এতদিন পরে জামাই নিজে থেকেই এসেছেন হয়ত তাঁর সুমতি হয়েছে, ভাল কথাইত। এতে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? মমী কিছু গোলমাল কর্‌বে না—আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক কর্‌বো 'খন। তোমার অত ভয় পেলে চল্‌বে না। জামাইয়ের আদর যত্নের চেষ্টা দেখ'গে যাও। কানাইয়াকে একবার বাজারে পাঠিয়ে দেখি—মাছ মাংস কিছু যোগাড় হয় কি।

(৭)

দেবেনের হঠাৎ আগমনে লক্ষ্মী আশঙ্কা করিয়াছিলেন, না জানি তাঁহার এই একগুঁয়ে, তেজী মেয়েটি কি কাণ্ড ঘটাইবে। কন্যার নির্ব্বাক গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে আরও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল। বিমলা, মমীকে তাহার কর্ত্তব্য বিষয়ে দু' একটী কথা বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মমী তাঁহার কোন কথাতেও সাড়া না দিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। পিসিমা বার বার বলিলেও, লক্ষ্মী একবারও খুকীকে দেবেনের সম্মুখে যাইতে দিলেন না। কি জানি হতভাগী পেটে আসিয়াই ত

তাহার বাপ মাকে দু' ঠাঁই করিয়াছিল, আজ যদি স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনের এতটুকু সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন পাছে আবার অতীতের বিষোদ্গারী স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া সে সম্ভাবনাটুকুও সে নষ্ট করিয়া ফেলে! সকাল সকাল তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া লক্ষ্মী নিজের ঘরে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। পিয়ারী বাবু তখনও বাড়ী ফিরেন নাই।

আহারাদির পর সকলে শয়ন করিতে গেল। মমতা এতক্ষণ বড় ঘরের খোলা জানালাটিতে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। বাড়ীর পাশে, চারিদিকের আলোর মাঝখানে একটা পুরাতন অশ্বথ গাছ যেন অন্ধকারের মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, শুধু তাহার বাহিরের পাতাগুলি রাস্তার বিদ্যুতালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল; ভিতরে নিবিড় অন্ধকার। পাশের বাটির দেয়ালে একটা ডালের ছায়া পড়িয়াছিল। অন্ধকার ছায়াটি বাতাসে এক একবার মাথা নাড়িতেছিল। মমতা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ভিতরেও বুঝি আজ কি অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল; মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে একটা ক্ষীণ রশ্মি আসিয়া সেই জমাট অন্ধকার চিরিয়া ফেলিতে গিয়া চারিদিকের আঁধারের মধ্যে আপনাকেই হারাইয়া ফেলিতেছিল।

লক্ষ্মী ও বিমলা উৎকণ্ঠিত ভাবে মমীর ভাব গতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। বিধু তখনও শয়ন করিতে যায় নাই, একটা মজা দেখিবার লোভ আজ তাহার নিদ্রাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল. নিদ্রায় তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল, তবুও সে উঠিল না।

ভাগ্য-নিরূপিতা

রাত্রি বাড়িতেছিল, লক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া বিমলার দিকে চাহিলেন। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া ধীরে ধীরে কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—মমি, মা! শোওগে যাও।

মমতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার মায়ের মুখের প্রতি চাহিল। অতি সঙ্কুচিত ভাবে আবার লক্ষ্মী বলিলেন—ছাদের ঘরে।

আর একবার মায়ের উদ্বেগ-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া আলো লইবার অপেক্ষা না করিয়াই মমতা ধীর পদে উপরে চলিয়া গেল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী বিমলাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে আবার পদশব্দ হইতে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল।

দ্বারের নিকট হইতে মমতা বলিল,—খুকী?

মাতা বিস্মিত ও ভীত হইয়া বলিলেন—কেন, সে আমার কাছে শোবে'খন।

গম্ভীর স্বরে মমতা বলিল— না।

আশঙ্কায় লক্ষ্মী হতভম্ব হইয়া গেলেন। বিমলা উঠিয়া বলিলেন—বেশ ত, আমি এনে দিচ্ছি।

দু' মিনিট পরে ঘুমন্ত খুকীকে আনিয়া বিমলা মমতার কোলে দিলেন।

প্রথমবার ঘরে ঢুকিয়া মমতা দেখিয়াছিল, বড় খাটখানিতে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দেবেন বিছানার একপাশে ঘুমাইতেছে অথবা ঘুমাইবার ভান করিয়া আছে। ও ধারের ছোট খাটখানি খালি পড়িয়া আছে। খুকীকে আনিতে সে

আবার নীচে নামিয়া গেল। খুকীকে দূরে রাখিবে কেন? এক-দিন না ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া দেবেন একটা অতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল? আজ তাহাকে দূরে রাখিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামীর কাছে হীনতা স্বীকার করিবার মমতার এত কি গরজ পড়িয়াছে? সত্যই সে ত আর স্বামীর অনুগ্রহ ভিক্ষায় লালায়িত হইয়া উঠে নাই। স্বামীর সহিত আলাপ করা বা সাক্ষাৎ করা আজ যে তাহার পক্ষে কতখানি কষ্টকর ও অসম্ভব তাহা মনে মনে সে ভালই জানিত, তবে, মায়ের মনের নব কল্পিত আশাটা একেবারে নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দিতে আজ যেন তাহার কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেকিতেছিল, সেই জন্য, ও পাছে ঘরে বাহিরে নূতন করিয়া আবার একটা কেলেঙ্কারী হয় সেই ভয়েই আজ সে এত বড় পরীক্ষায় আপনাকে উপস্থিত করিল।

ছোট খাটে খুকীকে শোয়াইতে গিয়া নত হইতেই চাবি সমেত আঁচলটা খট্ করিয়া খাটের বাজুতে ঠেকিল। বড় খাটের দিকে পিছন করিয়া থাকিলেও মমতা বুঝিল, শব্দে দেবেন জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। খুকীর বালিশ বিছানা অনাবশ্যক নাড়া চাড়া করিয়া সে আরও খানিকক্ষণ পিছন ফিরাইয়া রহিল। নিজের এ লজ্জাটী বড়ই অশোভন হইতেছে, হঠাৎ মনে হইতেই মমতা সোজা হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। টি'পয়ের উপর একটী জুয়েল্ ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।

দেবেন দেখিল, সম্মুখে ব্রহ্মচর্য্যের দৃপ্ত, তেজোময়ী মূর্ত্তি, দৃষ্টি আপনিই সঙ্কুচিত, নত হইয়া আসিল।

মমতা দেখিল—উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্যের ভুক্তাবশিষ্ট, অন্তঃসারহীন একটি কঙ্কালমূর্ত্তি সম্মুখে মাথা নত করিয়া বসিয়া আছে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখের, মুখের কঠোরতা যেন শিথিল হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

নাড়া নাড়িতে খুকীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, মা এখনি পাশে শুইবেন মনে করিয়া সে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু মা পিছন ফিরিয়া সরিয়া গেলেন, হয়ত তাহাকে একা রাখিয়াই চলিয়া যাইতেছেন মনে করিয়া ভয়ে সে উঠিয়া বসিল। উভয়ের দৃষ্টি যুগপৎ তাহার উপর পড়িল। দেবেন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল—কে ওটি? মমতা খুকীর কাছে সরিয়া যাইতেছিল, দেবেনের প্রশ্নে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেবেনের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তীব্র দৃঢ়স্বরে বলিল—আমার মেয়ে। দেবেন যেন একটু চম্‌কাইয়া উঠিল কিন্তু ত্বরিতে সে খাট হইতে নামিয়া প্রসারিত হস্তে খুকীর দিকে অগ্রসর হইতে গেল। দু' পা গিয়াছে এমন সময় মমতা বাঁ হাত বাড়াইয়া দেবেনের পরিত্যক্ত শয্যা দেখাইয়া দিয়া সজোরে বলিল—না।

স্তব্ধগতি দেবেন কতক্ষণ বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার খুকীর ভীত সুন্দর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর স্ত্রীর প্রসারিত-হস্ত উগ্রমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তরলকণ্ঠে বলিল—নেশার ঘোরে অজ্ঞানে একদিন যা' করে ফেলেছিলুম তার শাস্তি কি শেষ হবে না? যদি জান্‌তে কী শাস্তি তুমি আমায় দিয়েছ—

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিয়া মমতা বলিল,—আমি শাস্তি দিয়েছি? শাস্তি দিবার অধিকার আমার কোন দিনই ছিল না, অভিরুচিও হয়নি।

উত্তেজিত ভাবে দেবেন বলিতে লাগিল,—হাঁ, তুমিই শাস্তি দিয়েছ। মস্ত অপরাধ আমি করেছিলুম বটে, কিন্তু অনুতাপের

সময় পর্য্যন্ত না দিয়েই, দম্ভভরে তুমি আমাকে ত্যাগ করে এলে, অনুতাপে ফল নেই বুঝে আমি তখন নিরুপদ্রবেই পাপের পাঁকে ডুব্তে লাগ্লুম, ক্রমে গলা পর্য্যন্ত পাঁকে ডুবে গেল, কাছে কেউ নেই টেনে তোলে, আশে পাশে একটুকু অবলম্বন নেই ধরে দেহটাকে ভাসিয়ে রাখি। উঃ কী দুর্দ্দিনই গিয়েছে সে! নানা রকম কুৎসিত ব্যাধিতে শরীর ছেয়ে গেল, লোকে হাঁসপাতালে রেখে এল। কি জানি কেমন করে প্রাণে বেঁচে গেলুম; ব্যাধি কিন্তু সমস্ত শরীরটায় তার করাল দাঁতের দাগ রেখে গেল, একটা চোখও—বলিতে বলিতে নীল চস্মা খুলিয়া খাটে ছুঁড়িয়া দিয়া দেবেন ডান চোখের কোণে আঙ্গুল দিয়া চাপ দিল। মমতা শিহরিয়া দেখিল পাথরের চোখ খুলিয়া দেবেনের হাতে পড়িল।

দেবেন বলিতে লাগিল,—চোখ গিয়েছে, শরীরের শক্তি গিয়েছে, সবই আমার নিজের পাপের ফল, দুস্কৃতির শাস্তি; কিন্তু তুমিও কি এর জন্য একটুও দায়ী নও? কুসঙ্গে পড়ে, সবে যখন দু' এক পা গিয়েছি তখন যদি আমার অর্দ্ধাঙ্গিণী, তুমি কঠোর বিচারকের মত নির্ম্মম বিচার না করে, স্নেহময়ী স্ত্রীর মতই তোমার দুর্ম্মুখ স্বামীকে ক্ষমা করুতে, ধৈর্য্য ধরে বিপথ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা করুতে! নেশার ঘোরে, তোমার কঠোর বিদ্রূপে পাগল হ'য়ে একদিন আমি একটা গর্হিত, হেয় কাজ করে ফেল্লেও তুমি যদি দয়া করে আমায় ক্ষমা করুতে, ত্যাগ করে না আস্‌তে, তাহলে আমি কি এতটা ডুব্‌তুম, না আজ আমার এতটা দুর্গতি হ'ত? সব খুইয়ে আজ আমি পথের ভিখারী

কুঅভ্যাসের দাস; শরীর ভেঙ্গে গেছে, আমার মুখ চাইবার কোথাও কেউ নেই। হয়ত এতটা হ'ত না, যদি তুমি একটু— যাক্ সে কথা, তোমার দয়া বা সহানুভূতি ভিক্ষা করতে আজ পাঁচ বৎসর পরে আমি এখানে আসিনি, সে দরকার আমার নেই, শুধু কর্ত্তব্যের—

একটা অচেনা লোক তাহার মাকে বকিতেছে, তাঁহাকে তাহার কাছে আসিতে দিতেছে না, মা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—খুকী আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, পা দু'খানি ঝুলাইয়া দিয়া সে খাট হইতে নামিয়া পড়িল, ছোট ছোট চোখদুটি ঘুরাইয়া একবার দেবেনের দিকে চাহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া মায়ের হাঁটু দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি মায়ের দিকে উঁচু করিয়া বলিল—দাদুকে ডাক্‌বো মা?

খুকীর চঞ্চলতায় দেবেনকে হঠাৎ থামিতে হইয়াছিল, এখন সে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—নাঃ! আর কাকেও ডাক্‌বার দরকার হবে না, একা তোমার মায়ের শক্তিই ঢের।

তাড়া খাইয়া খুকী ভয়ে মা'য়ের কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিল।

কিছুক্ষণ পরে দেবেন অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিল—উঃ আজ এত হেয় আমি! নিজের মেয়ের কাছে পরিচয় দেবারও অধিকার আমার নেই! পরিচয় শুন্‌লে ও'ও হয় ত ঘৃণায়, ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে—সে শিক্ষা এতদিনে ওকে তুমি ভাল করেই শিখিয়েছ। ছুঁতে গেলে ও ভয়ে আঁৎকিয়ে উঠ্‌বে, পালিয়ে যাবে। ও'র গুরু মশায়ই যখন জানেন না পাপকে ঘৃণা করতে হয়, বর্জ্জন করতে হয়, কিন্তু পাপীকে ক্ষমা করতে হয়, করুণা

কর্‌তে হয়, তখন ও যে আমার ওপর বিরূপ হবে তার আর আশ্চর্য্য কি ?

মমতা নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল. দেবেনের এক একটা কথা তাহার কাণে যাইতেছিল আর তাহার বুকের ভিতর হইতে কত প্রতিবাদ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। দেবেনের এসব যুক্তি যে কতটা অসার, মনে মনে মমতা তাহা স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল। সে কেন দেবেনকে শুধ্‌রাইতে চেষ্টা না করিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিল ? —সে ত দেবতা নয়, তার দেহ রক্ত-মাংসেই গড়া, তাহারও সহ্যের একটা সীমা ছিল। তাহা ছাড়া, তাহার আত্মারও একটা স্বাধীন অস্তিত্ব, নিসম্পর্ক মঙ্গল আছে, নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও ছিল। কেন সে চলিয়া আসিল !—বড় অপরাধ তার ! নিজে চুরি করিয়া এ যে গৃহস্থকে চোর বলিয়া ঘোষণা করা, এ মন্দ নয় ! জোর গলায় প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহার জ্ঞান ও স্মৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নির্ব্বাক নীরব করিয়া রাখিল। মনের আর একটা কোণ হইতে একটা করুণ আবেদন উঠিয়া মমতাকে অস্বস্তির খোঁচা দিতেছিল। সেই দেবেনের আজ এতখানি দুরবস্থা হইয়াছে !—কিজানি কেন মমতার মনে সুদূর অতীতের আরও একটা স্মৃতি ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল।

(৮)

আজ সন্ধ্যা হইতেই অনেক পুরাতন কথা মমতার মনে পড়িতেছিল। যে সব কথা একেবারে চুকিয়া অতীতের সহিত

মিশিয়া গিয়াছে মনে করিয়া মমতা আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে করিয়া-ছিল, আজ আবার কেন সে সব কথা মনে উঠিতেছে? মমতা চেষ্টা করিয়াও আজ তাহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

সে ত আজ কত দিনের কথা—বিবাহ শেষে, সাতদিন পরে মমতা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে; মনে পড়িল এই ক'র দিনেই তাহার কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল—ফিরিয়া আসিয়া আর ত সে পূর্ব্বের মত সহজ চপলতায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারিতেছিল না। নিঃসঙ্গ হইলেই মন তাহার নীল আকাশে ভাসিয়া কোন্ সুদূর স্বপ্নের দেশে চলিয়া যাইত, কল্পনা এই মাত্র সাত দিনের পরিচিত রূপবান, সবলদেহ চির-আগন্তুকটিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মধুর কুহেলী রচনা করিত, আর ব্যাকুল আনন্দে তাহার সারা অন্তরখানি কি এক অজানা অনমুভূতের অপেক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিত। তারপর, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে প্রথম যৌবনের ফুটোনোন্মুখ আকাঙ্খা লইয়া ও কল্পনার রচিত মনোরম আদর্শ বুকে করিয়া মমতা স্বামীর ঘর করিতে আসিল। প্রথম দিন কয়েক দেবেনের আদর যত্নে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটি যেন দ্রব হইয়া লজ্জার বাঁধ ছাপাইয়া শতধারে স্বামীকে অভিসিক্ত করিতে চাহিত; দেবেনের স্পর্শেই তাহার অন্তর জুড়িয়া উৎকট আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিত। মমতা মনে করিল এই তাহার স্বর্গ, তাহার যত্নে গঠিত আদর্শের চরম পরিণতি।

তারপর ছয় মাস যাইতে না যাইতেই সে দুঃখে বুঝিল দেবেন আর তেমন করিয়া ধরা দিতে চাহেনা—দেবেনের প্রাণ, তাহার হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দনে পূর্ব্বের মত সাড়া দেয় না। মধ্যে মধ্যে

নানা অছিলায় দেবেন বাহিরে রাত্রি কাটায়, রাত্রিশেষে কখন বাড়ী ফিরিয়া অসুস্থতার ছলে বাহিরের ঘরেই শুইয়া পড়ে। বৃদ্ধা মায়ের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠে, ছুতায় নাতায় বধুকে ভর্ৎসনা করেন। বাড়ীতে মমতার যা' ননদ দ্বিতীয় সঙ্গী কেহই ছিল না। কালে ভদ্রে নিজের ঘর হইতে পাশের বাড়ীর মেজ বৌ'য়ের সহিত দুই একটি কথা বিনিময় হইত। সারারাত্রি একাকী বিনিদ্র-শয়নে মমতা কত কথাই ভাবিত।

সে দিন, তখন বর্ষাকাল, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মমতার প্রাণে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার করিতেছিল। নিত্যকার মত আজও বৈকালে দেবেন গাড়ী লইয়া বাহির হইয়াছিল। নয়টার সময় খালি গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। আহারে রুচি ছিল না, মমতা চোখ বুজাইয়া মেঝের উপর চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। নূতন ঝি, আহারের জন্য ডাকিতে আসিল, মমতাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাহার প্রাণে বুঝি একটু সমবেদনা জাগিল; পাশে বসিয়া সে বলিল—ভেবে, দুখ্যু কষ্ট ক'রে কি হবে দিদিমণি? খালি নিজের শরীল নষ্ট করা বৈত না। উপায় ত কিছুই নেই। যদি কিছু উপায় হয় এই ভেবেই না জেঠাবাবু অদ্দূর থেকে টুক্‌টুকে দেখে বৌ ঘরে আন্‌লেন। অমন চাঁদপারা বৌ তাতেও কি উড়ুখ্যু মন ঘরে বস্‌ল? আজ চার বছর যে ডাইনী ছুঁড়ী দাদ্‌বাবুকে পেয়ে রেখেছে, কোনও ওঝার বাবার সাধ্যি নেই তারে ছাড়ায়। সে সব কথা কিছুই বুঝি তুমি শোন নি? তা' শুন্‌বেই বা কার কাছে, না আছে একটা ননদ কি যা, যাওয়ালী যে দুটো কথা ক'য়ে মনের দুখ্যু

ঝাড়বে? আম্‌রা হনু ঝি চাকর, ছোট নোক, ওসব কথায় কি থাক্‌তে পারি? আর গিন্নিমা শুন্‌লেইত কেটে ফেল্‌বে।"

এত পূর্ব্ব হইতেই যে দেবেনের এতখানি অধঃপতন হইয়াছিল, এ ইতিহাস মমতা আজও পর্য্যন্ত শুনে নাই; তাহার ভাগ্যগুণেই দেবেন সম্প্রতি এমন হইয়াছে, মনে করিয়াছিল। তবে ইঁহারা সত্যই ছেলের সব গুণকীর্ত্তি জানিয়া শুনিয়াই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন?

কোনও উৎসাহ না পাইয়া নূতন ঝি থামিয়া গিয়াছিল। মমতা আদেশব্যঞ্জক স্বরে বলিল—সব বল্ তুই, আমি শুন্‌বো।

ঝি উঠিয়া একবার ভাল করিয়া বাহিরটা দেখিয়া আসিল। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, মেঝের উপর মমতার কাছ ঘেঁসিয়া ভাল করিয়া বসিল, তাহার পর ধীরে সুস্থে বলিতে আরম্ভ করিল,—

—সেবার দেশ থেকে আস্‌বার সময় গিন্নিমা, একটা রাঁড় মেয়ে কুড়িয়ে আনে, সে নাকি তাঁর কি রকম দেওরঝি হতো। তা আমি তখন এ বাড়ীতে আসিনি, আমার মাসি কাজ কর্‌ত, আমারও আসা যাওয়া ছেল। মন রাখা কথা কইব না, তা তোমার বা কি রূপ দিদিমণি, বিন্দুদিকে দেখ্‌তে ছেল ঠিক যেমন সরোস্বতি ঠাক্‌রুণ। গোড়া থিকে তার ভাব গতিক কিন্তু ভাল ঠেক্‌ত না, রাঁড় মানুষ তুই, উঠতি বয়েস তোর, সোমত্ত ছেলের সঙ্গে তোর অত হাসিঠাট্টা কেনরে বাপু! তা হলিই বা সম্পক্যে জ্ঞেৎ ব'ন। আম্‌রা ত বাপু ছোট নোক্ এ সব আমাদেরও চোখে ভাল ঠেক্‌ত না। একদিন

দুপোর বেলা পানের ডিবি হাতে করে ছুঁড়ী সেই যে দাদ্‌বাবুর ঘরে ঢুক্‌লো, আর বেরোয় না। উঁকি মেরে দেখি, ওমা—ছিঃ ঘেন্নায় মরে যাই! দাদ্‌বাবু শুয়ে আছে, আর ছুঁড়ী খাটের ওপর তাঁর কোলের কাছে বসে, ফিসির ফিসির ক'রে কি বক্‌ছে। হলুমই বা ছোট নোক, রাগে আমার শরীল রী রী কত্তি লাগ্‌ল। বারান্দায় দুপদাপ শব্দ কত্তিই ছুঁড়ী ধুড় মুড়িয়ে বেরিয়ে এল। অবাক্‌ কাণ্ড দিদিমণি অবাক্‌ কাণ্ড! পরদিন সকালে ছুঁড়িরি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এখন নাকি সে সায়েব পাড়ায় বিবি হ'য়ে রয়েচে। দাদ্‌বাবুর সঙ্গে রোজ বিকেলে গাড়ী চড়ে হাওয়া খায়। পেত্যয় না যাও দিদিমণি, সহিস, কোচোয়ানদের জিজ্ঞেস্‌ কর।

মমতার আদর্শ পূর্ব্ব হইতেই ফাটিয়া চটিয়া ছিল, আজ সেটা ভাঙ্গিয়া একেবারে চুর্‌মার্‌ হইয়া গেল। আবার তাহাকে জোড়া তাড়া দিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া সে ঘৃণায় তাহার সমাধি দিল। সেইদিন হইতে দেবেনের সংশ্রব সে পারতপক্ষে ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল। দৈবক্রমে দেখা হইয়া গেলে, দারুণ অবজ্ঞায় সে মুখ ফিরাইয়া লইত। শাশুড়ী তীর্থ উপলক্ষে কয়েক মাসের মত গৃহ ত্যাগ করিলেন। দেবেনও রোজ রোজ বাহিরে ছুটাছুটি সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া বাড়ীতেই এবার স্ফূর্ত্তির আয়োজন করিয়া বসিল। জেঠাবাবু দেশেই থাকিতেন। সুতরাং দেবেনের সঙ্কোচ করিবার আর কোন কারণই রহিল না।

দিন যাইতেছিল। একদিন অন্যমনস্কতা বশতঃ মমতা মাঝের দ্বারটী বন্ধ না করিয়াই বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একটা উষ্ণ

স্পর্শে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া মমতা দেখিল তাহার শয্যাপার্শ্বে স্বামী। দলিতা ফণিনীর ন্যায় বুঝি সে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, তড়িৎবেগে শয্যা হইতে নামিয়া একেবারে সে বাহিরের দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যর্থ মনোরথ দেবেনও লগুড় উঠাইতে ছাড়িল না। পাশের বাড়ীর নলিনাক্ষের সহিত মমতার একটা বিশ্রী সম্পর্কের উল্লেখ করিল। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া মমতাও দংশন করিতে ছাড়িল না। কয়েকদিন পূর্ব্বে নূতন ঝিয়ের নিকট শ্রুত বিন্দুর সহিত দেবেনের কেলেঙ্কারীর কথা বলিয়া ফেলিল। তখন দেবেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মমতাকে পদাঘাত করিল।

তলপেটের বেদনায় মমতা ক'দিন উঠিতে পারিল না। নূতন ঝিয়ের সাহায্যে পিতাকে 'তার' পাঠাইয়াছিল, চতুর্থ দিনে পিয়ারী বাবু আসিয়া তাহাকে কানপুরে লইয়া গেলেন। সেই দিন স্বামীর সহিত মমতার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছিল।

(৯)

সে ত আজ অনেক দিনের কথা, যাহাকে সে পেটে লইয়া আসিয়াছিল সেই খুকীই ত এখন প্রায় পাঁচ বৎসরেরটি হইয়াছে। তবে আজ কেন আবার এতদিনের নির্ব্বাসিত বিস্মৃত স্মৃতি মমতার মনে উঠিতেছিল? প্রত্যেক কথাটি, প্রতি ঘটনাটী মমতার চোখের সম্মুখে, বায়স্কোপের ফিল্মের মতই যেন সজীব হইয়া উঠিতেছিল। নিজের এই দুর্ব্বলতার লক্ষণে মমতা ভীত হইতেছিল, একটা কথাও মুখ খুলিয়া বলিতে সাহস হইতেছিল

না। লোকটী কতখানি বেহায়া, কি স্পর্দ্ধাই বা তাহার, অত বড় বিভৎস কাণ্ড করিয়াও এখন কোন্ মুখে সে বলিতে পারিতেছে তাহাকে তখন ক্ষমা করিয়া শুধরাইবার চেষ্টা করাই মমতার উচিত ছিল? এ যে দারুণ দুরাশা, ভীষণ জোর জুলুম! প্রতিবাদের, উত্তর করিবার মমতার অনেক কথাই ছিল। তবুও সে চুপ করিয়াই রহিল।

দেবেন দেখিল এত কথাতেও মমতা একটী উত্তরও করিতেছে না, পাষাণ মূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া আছে অগত্যা তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া হুকে টানান জামার পকেট হইতে সিগারেট কেসটী ও একখানি বড় খাম্ বাহির করিয়া আনিল। খাম্খানি খাটের উপর রাখিয়া একটী সিগারেট ধরাইল। দু'চারি টান দিয়া, বলিল—সমস্ত রাত ধরে, বকে গেলেও তুমি একটী কথাও বল্বে না বুঝ্ছি। আমার এ হঠাৎ আসার উদ্দেশ্যটী এখনও বলা হয় নি। মমতার দিকে খাম্খানি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তা সে কথাটা এতেই লেখা আছে, পড়লেই যখন জান্তে পার্বে, মিছে বকে আর লাভ কি?

খাম্খানি লইবার জন্য মমতার কোন আগ্রহই দেখা গেল না। অগত্যা সেখানা আলোর পাশে টেবিলের উপর রাখিয়া, দেবেন কি ভাবিয়া বলিল—ওখানা জেঠাম'শায়ের উইল। ওটাই আজ আমাকে এখানে আস্তে বাধ্য করেছে। নয়ত নিজের ইচ্ছায় এ কালামুখ জীবনে আর কখনও তোমাদের দেখাব এ ধারনাও করিনি। যাক্ সময় মত ওখানা পড়ে' দেখ'। কাল সন্ধ্যার আগে ত আর ফির্বার গাড়ী নেই, সেই গাড়ীতেই ফিরবো।

নিজের মনেই যেন বলিল—উঃ কী গরম ঘরের মধ্যে! বিছানা হইতে একটা [illegible]লিশ উঠাইয়া লইয়া দেবেন দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে খোল[illegible] তিন খানা ক্যাম্প্ খাট্ পাতা ছিল—তাহারই এক[illegible]স নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িল।

দাদুকে [illegible] প্রস্তাব করিয়া দেবেনের তাড়ায় খুকী সেই যে মু[illegible]য়া ছিল আর একবারও মুখ তুলে নাই। যন্ত্র-চালিতের [illegible] মমতা কখন তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বিছানার পাশে বসিয়া [illegible]ড়িয়াছিল, সে খেয়াল তাহার ছিল না। এখন দেবেন উঠিয়া বাহিরে যাইতেই তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল। ঘরের ভিতরেই [illegible]থক শয্যায় দেবেন শুইলে তাহার কোনও আপত্তি ছিল না।—[illegible]ত ওই রোগা শরীরে শেষ রাতের হিমটা লাগ্বে!—কি[illegible]পর মুহূর্ত্তেই নিজের দুর্ব্বলতায় মমতা লজ্জিত হইল। একবার গা'ঝাড়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আলোটা কমাইয়া দিল। তারপর আবার অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তার দিকের খোলা জানালাটায় গিয়া বসিয়া পড়িল। নীচে পথ তখন একেবারেই [illegible]ন শূন্য, দূরে মোড়ের পাশের পানওয়ালার দোকানে ক'টা কোকেনখোর দাঁড়াইয়াছিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটাইয়া মমতা হঠাৎ উঠিয়া গিয়া আলোটা আবার বাড়াইয়া দিল, আলোর পাশ হইতে খামখানি তুলিয়া লইল খুলিবে কিনা একবার ইতস্ততঃ করিয়া সেখানি রাখিয়া দিল, মিনিট খানেক পরে আবার কি ভাবিয়া খামখানি উঠাইয়া লইয়াই খুলিয়া ফেলিল। একখানা বড় কাগজ বাহির হইয়া আসিল. মমতা উদাসীন ভাবে সেখানির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

—উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় (দেবেনের জেঠামহাশ) মৃত্যু নিকট জানিয়া উইল করিতেছেন, দেবালয় ও দু' চারিটা দানের কথা উল্লেখের পর তিনি লিখিতেছেন—বিনা উইলে আমার মৃত্যু হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্র রায়ই আমার সমস্ত সম্পত্তি পাইত। কিন্তু দেবেনের কুচরিত্র ও অমিতব্যয়িতায় বিরক্ত হইয়া এবং বর্তমানে সম্পত্তি তাহার হাতে গেলে অচিরেই সে তাহা নষ্ট করিবে এই ধারনা আমার প্রবল হওয়ায় আমি অত্র উইলপত্র দ্বারা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতেছি। আমার নিজস্ব সম্পত্তির বিষয়ে আমার কৃত এই ব্যবস্থায় দেবেন রায়ের বা অপর কাহারও কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য হইবে না। প্রথবেই প্রকাশ থাকে দেবেনকে একেবারে বঞ্চিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাহার সংশোধন সাধনই আমার এই দানপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবম্বিধায় আমি এরূপ ইচ্ছা করি যে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী, আমার অবর্তমানে আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইবেন, দান বিক্রয়ের তাঁহার কোনও ক্ষমতা থাকিবে না। পরে আমার মৃত্যু তারিখ হইতে গণনা করিয়া তৃতীয় বৎসরের শেষ দিনে আমার স্ত্রী ও উইলের অন্যান্য অছিগণ পরামর্শ করিয়া যদি দেবেন-রায়কে তৎকালে সম্পত্তি রক্ষণে যোগ্য বিবেচনা করেন, দেবেন উক্ত সময়ের মধ্যে চরিত্র সংশোধন করিয়া স্ত্রী লইয়া সংসারী হয়, তাহা হইলে আমার স্ত্রী বিনা-ওজরে সমস্ত সম্পত্তিই দেবেন রায়কে অর্পণ করিবেন, এবং নিজে ভরণপোষণের নিমিত্ত মাসিক দেড় শত টাকা দেবেন রায়ের নিকট হইতে আদায় করিতে থাকিবেন। আমার সাধ্বী স্ত্রীও আমার এরূপ বন্দোবস্তের হেতু সম্যক অবগত

আছেন। উক্ত তিন বৎসরের মধ্যেই যদি আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে অথবা দেবেন রায় যোগ্য বিবেচিত না হয় তাহা হইলে আমি এরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া যাইতেছি যে, সমস্ত সম্পতির দুই আনা অংশে উক্ত দেবেন রায়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা (বর্ত্তমানে কানপুরে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছে) সত্ত্ববতী হইবে এবং সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মনোজমোহন রায় পাইবে। আমার সম্পত্তিতে তখন আর দেবেনের কোনও দাবী থাকিবে না। উপস্থিত আমার স্ত্রী এই তিন বৎসর কাল তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র, ও আমার গৃহ-চিকিৎসক ও অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ-রায়ের সাহায্যে সম্পত্তি রক্ষণ করিবেন, পারিশ্রমিক হিসাবে প্রথম দুই ব্যক্তিকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ও দেবেনকে একশত টাকা হিসাবে দিতে থাকিবেন।

* * * *

শীতল বায়ুস্পর্শে জমাট বাঁধা মেঘ হইতে দু' একটা ফোঁটা পড়িয়া বর্ষণের সূচনা করিতেছিল, সহসা কোথা হইতে প্রবল বাত্যা উঠিয়া বর্ষণ উদ্যত মেঘখানিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া অকূল আকাশে ছড়াইয়া দিল। দেবেনের আজ কত বড় দুরবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আপনা হইতে একটা ক্ষীণ সহানুভূতি উঠিয়া মমতার বুকের মধ্যের কৃষ্ণ কঠোর মেঘখানিকে দ্রব করিয়া দিতেছিল। এখন যদি দেবেন আরও একটু দীনতা স্বীকার করিত—তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য মমতার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিত—স্পষ্ট কথায় বলিত সে মমতাকে লইতে আসিয়াছে, তাহাকে না হইলে তাহার

আর চলিতেছে না, তাহা হইলে মমতা আজ কি করিত না করিত বলা যায় না। খুকীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, মাতাপিতার মনোকষ্ট স্মরণ করিয়া হয়ত তাহার উন্নত মাথাটি একটু নত করিত; যদিও এরূপ আশা বা কল্পনা ঘুণাক্ষরেও তাহার মনে উঠে নাই।

উইলের নকলখানি পড়িয়া এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থায় প্রথমে সে বিস্মিত হইল, কিন্তু ইহার সহিত দেবেনের এখানে এমন হঠাৎ আসিবার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহার মাথায় যাইল না। তাহার পর ক্রমে যখন সেটা তাহার মাথায় ঢুকিল, অমনি লজ্জায়, ঘৃণায় তাহার সারা দেহটা কুঞ্চিত হইয়া গেল, অন্তরটি বিষাক্ত হইয়া উঠিল,—বটে, প্রলোভন দেখাইয়া দেবেন আজ তাহার পরীক্ষা লইতে আসিয়াছে?—মমতার মনে হইল এখনি বাহিরে গিয়া খানিকটা বিষ উদ্গার করিয়া দেবেনকে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়া আসে। উত্তেজিত ভাবে সে দ্বার পর্য্যন্ত গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর সজোরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, শূন্য দৃষ্টিতে নিদ্রিত খুকীর দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে বিছানায় উঠিয়া সবলে খুকীকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মমতা শুইয়া পড়িল।

---

(১০)

স্বচ্ছন্দে মৃদু মন্থরগামী অশ্ব পিঠের উপর হঠাৎ চাবুক খাইয়া যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মা'য়ের সে দিনের কথাগুলিতে মোহিতের এতদিনের নিরুদ্বেগ জীবনে একটা চঞ্চলতা আসিল। সহসা সজাগ হইয়া মোহিত দেখিল সম্মুখে দীর্ঘ, বন্ধুর পথ !

মোহিতকে বড় হইতে হইবে—উন্নতি করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার চিত্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পরের অনুগ্রহে পালিত সে, কোন দিনই ত সে মনের মধ্যে একটা অসম্ভব রকম উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করিবার দুরাশা করে নাই। ছোট একখানি কুটীর, তাহার আরাধ্যা জননী সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী, সে তাঁহার সেবা-পরায়ণ পূজক, আর হয়ত ইন্দু সেই সেবার সহকারিণী শুচিস্মিতা দাসী, এই ছিল তাহার কৈশোর-স্বপ্ন। আজ সহসা তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ মেলিয়া সে দেখিল চারিদিকে গভীর অন্ধকার! তাহাকে যেন কোথায় কোন্ সুদূরের উদ্দেশ্যে দীর্ঘযাত্রা করিতে হইবে, অন্ধকারে নিঃসহায় নিঃসম্বলে পথ চলিতে হইবে। পথের শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহার এই ক্ষীণ শক্তি তাহাকে কোথায় কোন্ অজানা আলোর পাশে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কি? কবে, কত দিনে? সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে—কি পাইবে? হয়ত তখন মা'য়ের গুপ্ত স্নেহের ধারা শুকাইয়া কোন্ মরুর মাঝে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, অন্যে তাহার মানসী প্রতিমা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। তবে কেন, কাহার জন্য সে এত দীর্ঘ পথ চলিয়া নিশ্চিতকে উপেক্ষায় ত্যাগ

৪

করিয়া যাইবে? পিতার অভিলাস? তাঁহার সেই অশরীরি অভিলাসের সাফল্য-সংবাদ কি সেই নির্ব্বাপিত বাসনার দেশে পৌঁছাইবে? আজ কয়'দিন ভাবিয়া ভাবিয়াও মোহিত কোনই কুল কিনারা পাইতেছিল না।

স্নেহ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বার বার মোহিতের নিকট আসিয়া তাহাকে কথা বলাইবার, হাসাইবার বিফল চেষ্টা করিয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যাইতেছিল। আজ দু'দিন মোহিতদা' তাহার পড়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছে, বেড়াইতে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকে নাই, স্নেহ উপযাচক হইয়া যাইতে চাহিয়া মোহিতদা'র বিরক্তভাব দর্শনে ফিরিয়া গিয়াছে। মোহিতদা'র এ হঠাৎ অন্যমনস্ক উদাসীনতার একটা হেতুও সে খুঁজিয়া পাইতে-ছিল না। সমরও লক্ষ্য করিতেছিল তাহার আবাল্যের সহচর আজ কয়দিন তাহার সান্নিধ্যে প্রীত হইতেছে না। বিমলা দেখি-লেন পুত্রের মুখ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল; যোগ্য ক্ষেত্রেই বীজ উপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া দুঃখের মধ্যেও তিনি যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

ভোর রাত্রেই হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ঘুমাইবার জন্য কতক্ষণ বিফল চেষ্টার পর মোহিত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। পার্শ্বের শয্যায় সমর তখনও নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেছে। নিঃশব্দে জামাটি গায়ে দিয়া মোহিত নীচে নামিয়া আসিল। কানাইয়াকে সজাগ করিয়া নিজেই দ্বার খুলিয়া পথে বাহির হইল।

যাই যাই করিয়াও অন্ধকার তখনও কোণে ঘোঁজে, বাড়ীর আড়ালে ও গাছের তলায় ইতস্ততঃ করিতেছিল। পশ্চিম

আকাশে তখনও কতকগুলি নক্ষত্র কাতর কিরণে পৃথিবীর নিকট বিদায় চাহিতেছিল, পূর্ব্ব আকাশের দিকে চাহিয়া ভয়ে বুঝি তাহারা মলিন হইয়া উঠিতেছিল। উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় পাখীগুলি সরিয়া বসিয়া, ডানা নাড়া দিয়া বার বার আকাশের দিকে চাহিতেছিল। তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল—কখন আলো হইবে, কখন তাহারা গান আরম্ভ করিতে পাইবে। মহুয়া গাছে ইহারই মধ্যে একটা বোঁ বোঁ শব্দ আরম্ভ হইয়াছে। একটি হনুমান সড়াৎ করিয়া গাছ হইতে নামিয়া মোহিতের সম্মুখে পড়িল, মোহিতের দিকে ফিরিয়া কাল মুখের ভিতর হইতে তাহার শাদা শাদা দাঁতগুলি দেখাইল—তাহার বুকে একটি শিশু, শিশুর ছোট হাত দু'খানি নিঃশঙ্ক নির্ভরতায় মা'য়ের দেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার পর মোহিতকে অতিক্রম করিয়া হনুমানটি কোম্পানির বাগানের দিকে (Botanical Garden) চলিয়া গেল। দু'একটি মাড়োয়ারী মহিলা গঙ্গাজীর অভিমুখে চলিয়াছেন, তাঁহাদের জুতা ঘেঁস্‌টাইয়া চলার একটা খস্ খস্ আওয়াজ হইতেছে।

পথ চলিতে চলিতে, উষার শীতল বায়ু স্নেহের স্পর্শে বিনিদ্র মোহিতের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিয়া দিল। কিছুক্ষণ এদিকে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর মোহিত, গঙ্গার ধারে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিল।

সম্মুখে ক্ষীণকায়া গঙ্গা একটানা বহিয়া যাইতেছে, পায়ের কাছে বড় বড় তরমুজ্ ও শাদা শাদা খরমুজ্ গুলি, মড়ার মাথার মত চড়ার বালির উপর গড়াগড়ি পড়িয়া আছে। দূরে ওপারে

ভাগ্য-নিরূপিতা

পেয়ারা বনে পাখীদের একটা কলরব উঠিয়া, জলের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া অস্ফুট রোদনধ্বনির ন্যায় কানে পৌছাইতেছিল। রেল্ পুলের উপর মিস্ত্রিরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার একটা খট্ খট্ শব্দ শুনা যাইতেছে। কল কারখানাগুলি বার বার হুইসিল্ দিয়া শ্রমজীবিদের আহ্বান করিতেছে। একটু দূরে বাব্লা গাছটির তলে জলের কিনারে বসিয়া একটি বক প্রাতঃরাশের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। একটু পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, নদীর বুকে তখনও একটা লোহিত আভা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

মোহিত বসিয়া ভাবিতেছিল; তাহার শূন্য দৃষ্টি ওপারে দূরে যেখানে ছোট ছোট গাছগুলির মাথায় আকাশ টেস্ দিয়াছিল সেখানে লক্ষ্যহীনভাবে নিবদ্ধ। মোহিতের প্রথম সমস্যা, সে কেমন করিয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া উন্নতির পথে চলিবে। সেই পথই বা কোন্ দিকে? আর উন্নতিটাই বা কি? মনে পড়িল সে আজন্ম পরগৃহে পরের অনুগ্রহে পালিত, মাতার কায়িক পরিশ্রমে তাহার দেহ পুষ্ট। সুতরাং প্রথমেই তাহার মনে হইল অর্থোপার্জ্জনই উন্নতি, অর্থই তাহাকে এই অন্ধকারের বাহিরে আলোর জগতে লইয়া যাইবে। অর্থই ত এ জগতের সুখ সম্পাদন করে, পর-জগতের সম্পদ অর্জ্জনের সহায়তা করে। কিন্তু কি উপায়ে নিঃসহায়, নিঃসম্বল সে অত অর্থার্জ্জন করিবে? উপায়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এখন হইতেই যে তাহাকে নিজের ভার নিজে লইতে হইবে, তাহার কি? আজ এই ঊনবিংশ-বর্ষ-ব্যাপি জীবনের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ত সে কখনও নিজের সামর্থে এক কপর্দ্দকও

অর্জ্জন করে নাই। শুধু পরের দান ও মা'য়ের পারিশ্রমিকই ছিল তাহার মাত্র সম্বল। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ত তাহার নিজের ভার নিজে গ্রহণ করা উচিত ছিল, তবে না জেঠা মহাশয়দের স্নেহের আধিক্যে সে আপনাকে সমর ও অমরদা'র সমকক্ষ মনে করিয়া আসিতেছিল।

পক্ষান্তরে সে যদি আজ সহসা তাহার এতদিনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এইখানেই আত্মনির্ভরতার চেষ্টা করে, তাহা হইলে যাঁহারা মাতাপিতার স্নেহে তাহাকে এত বড় করিলেন তাঁহাদের একটা আঘাত করা, অপমান করা হয় না কি? আর তাঁহাতে লোকেইবা কি মনে করিবে? অতএব স্থানান্তরে গিয়া উন্নতির চেষ্টা দেখাই বিধেয়। তাহাতে কাহারও মনে করিবার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু এতদিনের এই সব মধুর বাঁধনগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে কি হৃদয় রুধিরাপ্লুত হইবে না? আর ইন্দু! মোহিত তাহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া কোন্ সুদূর দেশে চলিয়া যাইবে?

সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল মোহিতের সে সাড় ছিল না। সকালের রৌদ্রে যখন তাহার ডান্ কাণ্‌টি জ্বালা করিতে লাগিল, তখন তাহার খেয়াল হইল, তাইত বেলা যে অনেক হইয়াছে! তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল। পথে আসিতে আসিতে মোহিতের মনে পড়িল সারদা পিসির বাড়ী অনেক দিন সে যায় নাই। ইহার মধ্যে একদিন গিয়া তাহার পাশের খবরটি দিয়া আসা উচিত ছিল। তাইত ইন্দু হয়ত—

বেলা আটটার সময় মোহিত বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিল পিসিমা!

বাসিপাট সারিয়া সারদা তখন স্নান করিতে গিয়াছেন। রোয়াকের এক ধারে যাঁতা পাতিয়া ইন্দু গম ভাঙ্গিতেছিল, পাশে আড়াই বৎসরের ছোট ভাইটি সমস্ত গায় আটা মাখিয়া খেলা করিতেছিল। পরিশ্রমহেতু এই সকালেই ইন্দুর মুখখানি ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আটা উড়িয়া পড়িয়া ভ্রূহ'টি ও চুলগুলি শাদা করিয়া দিয়াছিল। মোহিতদা'র স্বরে তাহার সুন্দর মুখখানি আরও একটু লাল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি গাছ কোমর খুলিয়া সে কাপড়খানি ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—মা চান্ কর্‌তে গেছেন, এখনি আস্‌বেন।

মোহিত ইতিপূর্ব্বেই সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, সে লক্ষ্য করিল ইন্দু আজ বড়ই গম্ভীর। সমর সে দিন তাহাদের পাশের কথা বলিয়া গিয়াছে। মোহিত কিন্তু আসে নাই।

ইন্দুর গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়াও মোহিত অন্যদিনের ন্যায় আজ আর ব্যাকুল হইয়া তাহার সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল না, বিস্মিত হইয়া ইন্দু মোহিতের মুখের দিকে একবার চাহিতেই মোহিতের বিমর্ষ অন্যমনস্কভাব তাহার চোখে পড়িল, অমনি আশঙ্কায় ইন্দুর অভিমান আপনিই জল হইয়া গেল—উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলিল—কি হয়েছে মোহিতদা' ? অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন, কোনও অসুখ বিসুক করেনি তো ?

মোহিত তাহার শঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ইন্দু !

ইন্দুর আজ বিস্ময়ের পালা পড়িয়াছিল—হঠাৎ দশদিন পরে

আজ সকালবেলাই মোহিতদা' আসিল, মোহিতদা'র এমন বিমর্ষ-ভাব, তাহার পর এখন শুনিল মোহিতদা' এখান হইতে চলিয়া যাইবে, শঙ্কিত বিস্ময়ে সে বলিল—এখান থেকে চলে যাবে! কোথায়? কেন যাবে?

ইন্দু যাঁতা ফেলিয়া মোহিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মোহিত তাহার উৎকণ্ঠা দর্শনে মনে মনে একটু সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—কোথায় যে যা'ব তার এখনও কিছু ঠিক নেই, হয়ত কল্‌কাতায়ই যা'ব।

—কল্‌কাতায় যাবে? পড়্‌তে না কাজ কর্ম্মের চেষ্টায়? তা এখানে কি তা হয় না?

—পড়্‌বারই ত ইচ্ছে আছে, দেখি এখন কি হয়।

মোহিতের এরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ছাড়া ছাড়া কথা ইন্দুর ভাল লাগিতেছিল না। মোহিতদা' চলিয়া যাইবে, কেন যাইবে? কত দিনে আসিবে? ইন্দুর উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই উঠিতেছিল, শঙ্কিতভাবে সে বলিল—ওঃ মামিমাই কি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন?

একটু বিষণ্নভাবে মোহিত বলিল—না, মা'কে আর কোথায় নিয়ে যা'ব এখন!

মোহিতদা'র মা এখানেই থাকিবেন, শুধু মোহিতদা'ই পড়িতে বা কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় দিন কয়েকের জন্য অন্যত্র যাইবে, শীঘ্রই হয়ত ফিরিয়া আসিবে, ইন্দু এতক্ষণে যেন মনে একটু সান্ত্বনা পাইল। মোহিতদা'র মনের ক্ষুদ্র আশা, চিরদিনের অঙ্কিত ভবিষ্যতের ছবিখানি তাহার অজানা ছিল না। পাশ করিয়াই মোহিতদা' এবার তাহার এতদিনের আশা সফলের চেষ্টায় তৎপর

হইতেছে—আসন্ন বিয়োগ দুঃখের মধ্যেও ইন্দুর প্রাণ একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মোহিতের ক্ষুদ্র আশাটুকুর সঙ্গেই যে তাহারও সব সুখদুঃখ অন্তর্জড়িত। মোহিত কোনও দিন মুখ ফুটিয়া এসব কথা তাহাকে না বলিলেও সে ত মনে মনে জানিত মোহিতদা' কেমন করিয়া তাহার নিজের ভবিষ্যতের সহিত তাহার ভবিষ্যতকেও জড়াইয়া সড়াইয়া এক করিয়া রাখিয়াছিল। মোহিতও হয়ত ভাবিত ইন্দুত তাহার মনের কথা জানেই তবে আবার কথায় বলিয়া দরকার কি? আগে আগে মোহিত, সমর ও স্নেহকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে ইন্দুকে ডাকিতে আসিত। সে কোনও দিন মায়ের অনুমতি পাইত, কোনও দিন বা সংসারের কাজে তাহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। বেড়াইতে আসিয়া অতি অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতি স্নেহের উপরে মোহিতের সবখানি মনোযোগীতাই নিবিষ্ট রাখিতে হইত, কিন্তু ইহার মধ্যেও, ইন্দু যেদিন সঙ্গে আসিত, মোহিতের মন এই স্বভাব-গম্ভীর শান্ত মেয়েটির উপর কতখানি অর্পিত হইত তাহা 'দুষ্টু' স্নেহের দৃষ্টি এড়াইত না। এই-জন্যই বোধ হয়, ইন্দু তাহার প্রায় সমবয়সী খেলারসাথী হইলেও, তাহার আগমন স্নেহের ভাল লাগিত না। যে দিন ইন্দু সঙ্গে আসিত, স্নেহের দুষ্টামি সেদিন আরও যেন বাড়িয়া যাইত, মোহিত একেবারে বিব্রত হইয়া উঠিত। প্রকৃতি চঞ্চল, তাহাকে বিশ্বাস নাই —কখন কি অনর্থ উপস্থিত করিবে, ধরিত্রী প্রশান্ত, স্নেহময়ী,ঝড়ের সময় লোকে আশ্রয়ের জন্য পৃথিবীকেই আঁকড়াইয়া ধরে। প্রকৃতিকে লোকে ভালবাসে, তাহার সৌন্দর্য্যে, লীলায় লোকে আনন্দিত হয়, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিতে কাহারও সাহস হয় না।

অনটনের সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সারদা নিজে ইন্দুকে দু'চারখানি বই-পড়াইয়াছিলেন। মোহিত মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইত। ইন্দু ভাল বলিতে পারিলে, মোহিত খুসী হইত, নিজের জল খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ভাল ভাল বই বা এটা ওটা কিনিয়া দিত, আর সে পড়া ভাল বলিতে না পারিলে মোহিত দুঃখিত হইত, কিন্তু তাহাকে বকিত না। আজকাল প্রত্যহ ঘটিয়া না উঠিলেও মোহিত মধ্যে মধ্যে এ বাড়ীতে আসিত। গোড়া হইতেই এই প্রিয়-দর্শন অনাথ বালকটির উপর সারদারও একটা টান পড়িয়াছিল। মোহি-তের ধীরশান্ত ও শ্রমশীল স্বভাবে সারদা আনন্দ অনুভব করিতেন। ইন্দুর প্রতি মোহিতের এই প্রীতিভাবে তিনি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইতেন না।

এসব ত ইন্দুর অগোচর ছিল না। মোহিতদা' কবে তাহাকে কি দিয়াছে, কি বলিয়াছে সবই তাহার স্পষ্ট মনে আছে। আরও একটা কথা মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া লজ্জায় ও আনন্দে তাহাকে অস্থির করিত—গতবার পূজা শেষে বিজয়া দশমীর রাত্রে সে মোহিতদা'কে প্রণাম করিয়া উঠিতেই মোহিত তাহার কপালের উপর ছিঃ মোহিতদা' যেন কি—ভাগ্যে তখন সেখানে কেউ ছিল না নয়ত—ভারি দুষ্টু মোহিতদা'। ইহার পর হইতে কোনও প্রকারে মোহিতের সহিত কখনও তাহার অঙ্গস্পর্শ হইলে, ইন্দুর দেহে যেন একটা তরঙ্গ উঠে, চোখচোখি হইলে লজ্জায় তাহার চোখদু'টি নত হইয়া আসে।

মোহিত চলিয়া যাইবে শুনিয়াও ইন্দু ভাবিল—মোহিতদা' তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না, যাইলেও বেশী দিন

থাকিবে না। তাহার মা ত এখানেই থাকিবেন। তবুও মোহিতের এমন রাখিয়া ঢাকিয়া বলাতে ইন্দুর যেন কেমন সন্দেহ ঠেকিতেছিল।

ইন্দু চুপ করিয়াই রহিল, কিছু বলে না। মোহিত এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল—কই পিসিমা ত এখনও এলেন না, শচীদা' কোথায়? টম্‌টম্, পাতু, কাকেও ত দেখ্‌ছি না।

—মা এখনিই আস্‌বেন, অনেকক্ষণ হ'ল তিনি নাইতে গেছেন। টমি-পাতু জান্‌কীদের বাড়ী খেল্‌ছে বোধ হয়।

মোহিত হাসিয়া বলিল—আর ইন্দে-ঝি খোকাকে নিয়ে বাড়ী আগ্‌লাচ্চে, আর বসে বসে গম্ পিঁস্‌ছে, কেমন? তা বেশ, এক গ্লাস জল দেবে ইন্দু, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে? বলিয়াই তাহার মনে পড়িল এখনও মুখ ধোওয়া হয় নাই। তাড়াতাড়ি কূয়ার দিকে যাইতে যাইতে বলিল "ভোরেই বেরিয়েছিলুম্, মুখ ধোওয়া হয় নি।

মিনিট কয়েক পরে মুখ ধুইয়া আসিয়া মোহিত দেখিল, এক হাতে একখানি রেকাবীতে কতকগুলা শুক্‌না ছোলা ও একডেলা গুড় আর এক হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া আছে। হাত বাড়াইতেই ইন্দু রেকাবীখানাই বাড়াইয়া দিতেছে দেখিয়া মোহিত বলিল—আগে ত জলটা দাও, যে তেষ্টা পেয়েছে।

পাকা গৃহিণীর মত গম্ভীরভাবে ইন্দু বলিল—খালি পেটে জল খেতে নেই, আগে একটু কিছু মুখে দাও, তারপর জল খাবে।

—তা বৈকি, এ তেষ্টার ওপর শুক্‌নো ছোলা বুকে আটকিয়ে মরি, তখন জল খাবে কে?

—শুক্‌নো ছোলা ছাড়া, ঘরে ত আর কিছু নেই।

তাহার পরিহাসে ইন্দু আঘাত পাইল বুঝিয়া মোহিত তাড়াতাড়ি একমুঠা ছোলা ও খানিকটা গুড় মুখের ভিতর পুরিয়া দিল; তাহার পর ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জলই খাইয়া ফেলিল। খালি গ্লাসটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—আঃ সকাল বেলা কি তেষ্টাটাই পেয়েছিল।

থালা গ্লাস লইয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়াই খোকার উপর ইন্দুর দৃষ্টি পড়িল, বিশুবাবু তখন আঁজলা আঁজলা আটা লইয়া মাথায় দিতেছে। ঘরে না ঢুকিয়া ইন্দু তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটা ঝাড়িয়া দিয়া তাহাকে সরাইয়া বসাইল, থালার ছোলা ও গুড়টুকু রোয়াকের উপর বিশুর সম্মুখে ঢালিয়া দিল।

পিসিমার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মোহিত অবশেষে উঠিয়া পড়িল—তাইত পিসিমা এখনও এলেন না, এতক্ষণ বসে থেকেও তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

ইন্দু মনে করিয়াছিল, মোহিতদা' সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিবে, কিন্তু সে যখন দেখিল আর কোনও কথা না বলিয়াই মোহিত সত্যই চলিয়া যাইতেছে—বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পরিল না—কবে যাবে মোহিতদা' ?—ইন্দুর স্বরে বিস্মিত হইয়া মোহিত ফিরিয়া দাঁড়াইল, এক পা এক পা করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিল—কবে যা'ব! ওঃ কল্‌কাতায় যাওয়ার কথা বল্‌ছ? তার ত এখনও কিছু ঠিক নেই, এইত সবে কতক্ষণ আগে কথাটা আমার মনে উঠেছে। তুমি বুঝি মনে করলে আমি আজ বিদায়

নিতেই এসেছিলুম্।—হাসিতে গিয়াই মোহিত দেখিল—বর্ষণোন্মুখ কাল মেঘের ন্যায় ইন্দুর মুখখানি সজল অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—কাছে গিয়া মোহিত পরম স্নেহে তাহার দুই কাঁধের উপর হাত দু'খানি রাখিল। স্পর্শমাত্রেই কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল,—শরৎ প্রাতে স্পর্শমাত্রেই শিউলিগাছ কাঁদিয়া উঠে। মোহিত কোমলকণ্ঠে বলিল ছিঃ ইন্দু! ছেলেমি করো না। কবে যা'ব না যা'ব তার ঠিক নেই, আর কোথাও যাই যদি তা তোমাকে না বলে এমন করেই কি যা'ব!

জড়িত কণ্ঠে ইন্দু বলিল—যাবে ত চলে!

—হাঁ যেতেই হবে।—তাহার পর হঠাৎ ইন্দুর অবনত মুখখানি এক হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—কবে ফির'ব না ফির'ব জানি না, হয়ত অনেক দেরীই হবে—কিন্তু ফিরে এসে তোমায় এমন্‌টিই কিঁ দেখ্‌তে পা'ব ইন্দু?—ইন্দুর সারা দেহে ও প্রাণে একটা মধুর শিহরণ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিল। বাহিরের দিকে একবার সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর কণ্ঠেই বলিল—দেখ্‌বার ইচ্ছা কি তত দিন থাক্‌বে তোমার? থাক্‌লে নিশ্চয়ই পাবে।

—তাই কি? তখন হয়ত তুমি কোথায়, কা'র ঘরে চলে গিয়েছ, তা নিজের ইচ্ছায় হ'ক্ আর অনিচ্ছাতেই হ'ক্। তিরস্কারের স্বরে বলিল—নিজের ইচ্ছায়!

—তা না হ'ক বাপ মা ত আর চুপ করে থাক্‌বেন না।

বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া ইন্দু বলিল—পরের দয়া না হলে যাদের দু'বেলা দু' মুঠো জোটে না তাদের চুপ করেই থাকতে হবে।

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তেমন দুর্ভাগ্য আমার সহজে ঘট্‌বেনা।

—তোমার মামাও ত আর সত্যই চিরকাল চোখ বুজে থাক্‌বেন না, কাজেই সে সৌভাগ্যটা শীঘ্রই একদিন হবে তোমার।

দৃপ্ত স্বরে ইন্দু বলিল—সে দুর্ভাগ্য যদি এক দিন সত্যিই উপস্থিত হয়, তখন কি ক'রব না ক'রব তা নিয়ে কারও কাছে গুমর কর্‌তে চাই না, আমার মন তা ভালই জানে। —একটু অস্ফুট স্বরে বলিল—সে খোঁজ নেবার মত মনের অবস্থা তোমার কি থাক্‌বে সেদিন ?

—কী! তেমন মনের অবস্থা আমার থাক্‌বেনা ? আমিও বল্‌ছি ইন্দু,—উত্তেজিত ভাবে মোহিত কি একটা শক্ত প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া দেখিল—সারদা বাড়ী ঢুকিতেছেন, কক্ষে জলপূর্ণ একটি ছোট কলসী। ইন্দু তাড়াতাড়ি গিয়া যাঁতার পাশে বসিল, তাহার মনে পড়িল আরও অনেকখানি গম ভাঙ্গা উচিত ছিল; না দেখিয়াই সে খালি যাঁতাটায় একটা ঘুর দিল।

সম্মুখে মোহিতকে দেখিয়া সারদা বলিলেন—কখন এলে বাবা, ক'দি্‌ন যে এদিকে এস্‌নি, ভাল ছিলেত ?

প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া মোহিত বলিল—অনেকক্ষণ এসেছি পিসিমা, আপনি এই আস্‌ছেন এই আস্‌ছেন মনে করে' বসে রয়েছি। বলিয়াই মোহিত অপাঙ্গে ইন্দুর দিকে চাহিল। ইন্দুর অবস্থা আরও কাহিল। মোহিত হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল— দেখুন না, গল্পে গল্পে ও'কে একটুও গম্‌ পিঁস্‌তে দিইনি।

রোয়াকের মুড়ায় কলসীটি নামাইয়া স্মিতহাস্যে সারদা বলিলেন—তা হ'ক্। যা ত ইন্দু ছুট্ করে কাঠের উনুনটা ধরিয়ে দেত', কাপড়খানা ছেড়ে এসে ছু' খানা পরেটা ভেজে দি। সকালে কিছু না খেয়েই বেরিয়েছ' দেখ্ছি, মুখখানা একেবারে শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে।

ইন্দু পরিত্রাণ পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিত ব্যস্ত ভাবে বলিল—না না পিসিমা, আমি এখনি বাড়ী গিয়ে খা'ব, বেলাও অনেক হয়েছে, এরপর ভয়ানক্ রোদ হবে। আমি এখন উঠ্লুম তা হলে, আর দেরী করব না, দেবেন বাবু বাড়ীতে।

—হাঁরে মনু, কাল দেবেন হঠাৎ উপস্থিত হতে খুব গোল—মাল হয়েছিল ?

মোহিত দাঁড়াইয়া বলিল---কই কিছুত শুনিনি।

—যাক্ তবুও রক্ষে, বাবা বিশ্বনাথ করুন্ ওদের মনের অমিল ঘুচে যাক্। তা সত্যিই আর বস্‌বিনে মনু! তা যা, বেশী রোদ উঠ্লে কষ্ট হবে। তা আজ কাল আর এদিকে মোটেই আসিস্‌নে কেন ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মোহিত রোয়াক্ হইতে নামিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়াই মোহিত বুঝিল এইমাত্র তাহার মন হইতে যেন একটা বিশাল ভার নামিয়া গিয়াছে। তাহার কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল।

(১১)

সকালবেলা গোটা কয়েক হনুমান ছাদের ঘরের টিনের চালের উপর একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। শব্দে দেবেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিতেই এক ঝলক তীব্র রৌদ্র তাহার চোখে মুখে পড়িল, তাহার পর দৃষ্টি পড়িল ক্রীড়ারত হনুমান দলের উপর। বিরক্তভাবে দেবেন আবার চোখ বুজিল। হনুমানগুলি, আশে পাশে অতি কাছেই লাফালাফি জুড়িয়া দিল। ভীত হইয়া দেবেন আবার চোখ খুলিল—ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল দ্বার খোলা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল, শূন্য বিছানায় গিয়া ক্লান্তভাবে আবার শুইয়া পড়িল। তাহার দুর্ব্বল শরীরে একটা দারুণ বেদনা বোধ হইতেছিল, মাথার মধ্যে জ্বালা করিতেছিল।

ইতিপূর্ব্বেই খুকীকে লইয়া মমতা কখন নীচে চলিয়া গিয়াছিল। দেবেন আরও ঘণ্টাখানেক অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দে চোখ চাহিয়া দেখিল এবাড়ীর পুরাতন ভৃত্য কানাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। দেবেনকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কানাইয়া বলিল—জামাইবাবু, অভী চা লাউঁ ক্যা?

—পহলে তুম্ হমারা বেগ্ লা'য়ো, পিছে চা দেনা। শুন, থোড়া গরম জলভী লানা।

—বহুৎ আচ্ছা।

কয়েক মিনিট পরে কানাইয়া দেবেনের হাতব্যাগ্‌টি আনিয়া দিয়া চা আনিবার জন্য আবার নীচে চলিয়া গেল। দেবেন ব্যাগ

খুলিয়া একটি Injection পিচ্‌কারী ও লাল রঙ্গের একটি ছোট শিশি বাহির করিল। শিশি হইতে কি একটা পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে পিচ্‌কারীর মধ্যে ঢালিয়া দিল এবং শিশিটি পূর্ব্বের মত কাগজে জড়াইয়া আবার ব্যাগের ভিতর রাখিল ও পিচ্‌কারীটি সতর্ক ভাবে বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া কানাইয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চা ও গরম জল রাখিয়া কানাইয়া বাহির হইয়া গেল। দেবেন প্রথমে পিচ্‌কারিটি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে কয়েক ফোঁটা গরম জল ঢালিয়া দিল, সেটি বার কয়েক নাড়া চাড়া করিয়া লইয়া, উঠিয়া দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া একবার চারিদিকটা দেখিয়া আসিল কোথাও কেহ নাই। তাহার পর গেঞ্জির আস্তিন গুটাইয়া, কাঁধের নীচে পিচ্‌কারীর সূচ মুখটি আমূল বিঁধাইয়া, ভিতরের তরল পদার্থটি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। পিচ্‌কারীটি ভাল করিয়া ধুইয়া ব্যাগের মধ্যে তুলিয়া রাখিল। টি'পয় হইতে চা'য়ের কাপ লইতে গিয়া এবার তাহার দৃষ্টি পড়িল পূর্ব্ব রাত্রের খামখানির উপর। খামের মুখ খোলা, কিন্তু কাগজখানি তখনও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। দেবেন অন্যমনস্ক ভাবে সেখানি উঠাইয়া লইয়া জামার পকেটে রাখিয়া আসিল। তাহার পর চা পানে মন দিল। চা পান করিতে করিতে তাহার অবসন্ন মুখ খানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। জীবনের আশঙ্কা সত্বেও দেবেন আজও মাদক দ্রব্য একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মদ্যপানে ডাক্তারের নিষেধ, আর, একটু আধটুতেও এখন তাহার কিছুই সানায় না, তাই আজকাল সে এই ব্যয় সাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

মুখ হাত ধুইতে নীচে যাইবার জন্য সমর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। পিয়ারী বাবু শেষরাত্রে বাড়ী ফিরিয়া দেবেনের আগমন বার্ত্তা পাইয়াছিলেন, এখন দেখা হইতে কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। দেবেনও বেশ সহজ ভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিল। মোহিত একটু পূর্ব্বেই ওবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। দেবেন বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই অমর, সমর ও মোহিতের সহিত বেশ আড্ডা জমাইয়া তুলিল। বাড়ীর এই ছেলে তিন্‌টি প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া দেবেনের সহিত আলাপ করিতেছিল। কিন্তু দেবেন যখন, ফুটবল্‌, ক্রীকেট, ম্যাচ্‌ ও কলিকাতার স্কুল কলেজের কথায় শতমুখ হইয়া উঠিল তখন ইহাদের দ্বিধাভাব কোন্ তর্কে সরিয়া গেল। মোহিত উদ্‌গ্রীব হইয়া কলিকাতার গল্প শুনিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দু'একটি প্রশ্নও করিল।

মোহিত ছেলে বেলায় বুঝি ২।১ বার দেবেনকে দেখিয়াছিল। তাহার পর দেবেনের কুকীর্ত্তির জন্য এতদিন তাহার নাম এবাড়ী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। আজ তাহার সহিত এতক্ষণ আলাপে মোহিত বুঝিল—লোকটা ভিতরে যতই খারাপ হউক, বাহিরে কিন্তু বেশ মিশক ও ভদ্র। এ কথা সে কথার পর, ভবিষ্যতে কখনও যদি কিছু জানিবার দরকার হয় এই বলিয়া মোহিত দেবেনের কলিকাতার ঠিকানা জানিতে চাহিল। একটু ইতঃস্তত করিয়া দেবেন বলিল—কলিকাতায় এখন ত আমি বড় একটা থাকি না, মাস কতক হ'ল কলিকাতার বাড়ী বিক্রী করে' দিয়েছি, এখন দেশে, এখানে ওখানে পাঁচ জায়গায় ঘুরেই

.বেড়াচ্ছি। আবার একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তবে পটল ডেঙ্গায়—নং প্রেমচাঁদ বড়ালের লেনে একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করা আছে, সেখানকার ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পেতে পারি।

মোহিত নোট-বুকে ঠিকানাটি লিখিয়া লইল। আরও কিছু-ক্ষণ নানা গল্প গুজবে কাটিল, তাহার পর তাহারা স্নান করিতে উঠিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে আহারের পর পিয়ারী বাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেবেন সেখানে আসিয়া পাছ্‌তলার দিকে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। জামাতাকে আসিতে দেখিয়া পিয়ারী বাবু উঠিয়া বসি-লেন। কোন ভূমিকা না করিয়া দেবেন বলিল—আজ রাত্রের গাড়ীতে এ'দের দেশে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।

পিয়ারী বাবু যারপরনাই বিস্মিত হইলেন, কন্যার একগুঁয়ে স্বভাব তাঁহার ভালরূপই জানা ছিল, তবে গত রাত্রে স্বামী স্ত্রীর পুরাতন বিসম্বাদ যদি মিট্‌মাট্‌ হইয়া গিয়া থাকে। তথাপি এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের মতামত ব্যক্ত করাও যুক্তি-সঙ্গত হইবে না, তিনি বলিলেন—তা নিয়ে যাবে বৈকি। তোমার শরীরটা বড়ই খারাপ দেখাচ্ছে, শুন্‌লুম্‌ খুব অসুখ হয়েছিল, তা এখনও বেশ সারেনি ত দেখ্‌ছি। দিন কতক এখানে থেকে সুস্থ হ'য়ে যাবে, যাবার এত তাড়া কি?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া দেবেন বলিল—না তা' না, এমন তাড়া-তাড়িই বা কি। তবে জেঠামশা'য় মারা যাওয়াতে বিষয় আশয় সব গণ্ডগোল হ'য়ে রয়েছে, দেখাশুনা করা দরকার, তাই আজই যেতে চাইছিলুম্‌।

—তা হ'ক্ পাঁচ সাত দিনে এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। এইত কাল এসেছ, আজই আবার যেতে চাচ্ছ, রোগা শরীরে অতটা সইবে কি ?

—তা হ'লে না হয় বুধবারেই যাওয়া যাবে, সেদিন ও দিন ভাল আছে।

—বুধবার ? পশু´? তা দেখা যাবে। এখন যাও একটু বিশ্রাম করগে।

এ দু'টি দিনও দেবেন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ীর সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাটাইয়া দিল, ইহাদের নিকট লজ্জিত হইবার, কুণ্ঠিত হইয়া চলিবার কোন কাজই যেন সে কোন দিনই করে নাই। লোকে প্রথমে কোন গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিলে লজ্জায় ও ভয়ে সকলকে এড়াইয়া চলিতে চাহে কিন্তু ক্রমে দুষ্কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গেলে—দুষ্কৃতির সীমা ছড়াইয়া উঠিলে বুঝি লজ্জা ভয়ের এ বাঁধটুকুও আর থাকে না। বাড়ীর সকলে, আপনা হইতেই যেন দেবেনকে দূরে রাখিয়া চলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্‌পাতও ছিল না। প্রথম রাত্রির ন্যায় এদু'টি রাত্রিও যথাকালে প্রভাত হইয়াছে। একই ঘরে অতি নিকটে থাকিয়া ও পৃথিবীর এমন একটা গাঢ় সম্বন্ধে পরস্পরে আবদ্ধ রহিয়াও দেবেন এবং মমতার মধ্যে সেই প্রথম রাত্রি ছাড়া এ ক'দিনের মধ্যে এমন কি একটী বাক্য বিনিময়ও হয় নাই। উভয় পক্ষই সমান উৎসাহহীন ; দেবেন ঘুমাইলে অধিক রাত্রে মমতা ঘরে ঢুকিয়া আড়ষ্ট ভাবে খুকীকে জড়াইয়া কোনও গতিকে কয়েক ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত, আবার ভোর না হইতেই ঘুমন্ত

কন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া যাইত। দেবেনও ইচ্ছা করিয়াই বা অনাবশ্যক বিবেচনায় কোন কথাই বলে নাই। তৃতীয় দিনেও অর্থাৎ বুধবার—ভোর না হইতেই, মমতা খুকীকে লইয়া অতি সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা দেবেন শায়িত অবস্থাতেই বলিল—'শোন'। তাহার স্বরে বিন্দুমাত্রও ঘুমের জড়তা ছিল না। মমতা চৌকাঠের বাহিরের পা'খানি ফিরাইয়া আনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

দেবেন উঠিয়া বলিল,—আজই আমায় যেতে হবে, কেন এসেছিলুম জান, বাড়ীতেও শুনেছ, তুমি যাবে কি না তা ত আমি এখনও জান্‌তে পার্‌লুম্ না। তোমার ইচ্ছেটা এখন একবার দয়া ক'রে জানালে, আমি সেই মত ব্যবস্থা করি।

দেবেনের কথার বিদ্রূপ ভাব লক্ষ্য না করিয়াই মমতা বলিল —আমার ইচ্ছে! সে ত পাঁচ বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছি, এখন আবার নূতন ক'রে সে কথা বল্‌বার বা শুন্‌বার দরকার দেখি না।

—শুন্‌বার দরকার হয়েছে বলেই ত এই হাজার মাইল পথ ঠেলে এসেছি।

—ভুল করেছ।

মমতার এই গম্ভীর নির্লিপ্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া দেবেন ভিতরে ভিতরে চটিয়া উঠিতেছিল—ও সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিয়ে সহজ কথায় বল, আজ আমার সঙ্গে যাচ্ছ কিনা?

—আজও যাচ্ছিনা, কোন দিনও যাব না।

বলিয়াই মমতা আবার বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কোলে পাঁচ বৎসরের ঘুমন্ত মেয়েটি বড়ই ভার ঠেকিতেছিল।

—শোন', জেঠামশা'য়ের উইল দেখেছ'—এত বড় সম্পত্তিটা পরের হাতে যাবে?

দেবেনের শেষের কথাটায় নিহিত শ্লেষটুকু মমতার কাণে বাজিল সে ও ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—কার সম্পত্তি থাক্‌ল কি গেল তা'তে আমার কিচ্ছু আসে যায় না।

—বটে এই শেষ কথা? জান' দেশের আইন, সমাজের আদেশ আমার স্বপক্ষে, তোমায় যেতে আমি বাধ্য কর্‌তে পারি।

—কাপুরুষ যারা তারা ত চিরদিনই পরের জোরেই জোর করে, সবাই ত আর তাতে ভয় পায় না।

এবারও দেবেন রাগ চাপিয়া বিদ্রূপের সহিতই বলিল—আর যারা স্বেচ্ছাচারিনী তারা স্বামীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কেমন এইত? আমি ত কাপুরুষ চির কালই, তা এখন উপস্থিত কোন্ সুপুরুষটির—

—খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা বলো। ওসব ইতর মাতলামীর জায়গা এখানে না।

—কীঃ, অত চোখ্ রাঙানি কিসের? দয়া ক'রে, অনুগ্রহ ক'রে এসেছিলুম এইই না অনেক শালার ভাগ্য! জায়গা, অজায়গার অত কি ভয়? এই আমি চল্‌লুম, ও অহঙ্কার—

বলিতে বলিতে দেবেন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। খুকী সভয়ে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্নিকট-প্রায় দেবেনের দিকে আর দৃকপাত মাত্র না করিয়া মমতা চঞ্চল পদে নীচে নামিয়া গেল। দেবেন ক্ষিপ্র হস্তে জামা জুতা পরিতে পরিতে

নিজের মনেই গর্জ্জাইতে লাগিল—ভেবেছ' বুঝি পায়ে ধরে সাধা-সাধি করবো, ও আমার সাত পুরুষের ইয়েরে! হুঁ, দেবেন রায় ইচ্ছে কর্লে এখনই একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করে সংসারী হতে পারে।

বকিতে বকিতে সশব্দে দেবেন নীচে নামিয়া আসিল। তখনও বোধ হয় বাড়ীর অপর কেহই উঠে নাই। দেবেন অবাধে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কতখানি পথ আসিয়া হঠাৎ দেবেনের মনে পড়িল, তাহার ব্যাগ্‌টি আনা হয় নাই, নিজে বহিয়া আনিবার শক্তিও তাহার ছিল না। তাই ত ব্যাগে যে তাহার টাকাকড়ি সবই রহিয়াছে: সর্ব্বনাশ! তবে কি ব্যাগ আনাইতে আবার সে ফিরিয়া যাইবে? আবার! না কখনই না। তবে ব্যাগ আসিবে কি করিয়া? আর এ অবস্থাতেই বা সে এখন কোথায় যাইবে? মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে সহসা তাহার মনে পড়িল—হাঁ ঠিক হইয়াছে, রাজা বাবুর বাড়ী এই পথেই না? উপস্থিত ত সেখানে গিয়া উঠা যাইবে তাহা হইলে ব্যাগ্‌ আনাইবারও উপায় হইবে।

কিন্তু মমতার এতখানি তেজ! কি করিয়া দেবেন এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইবে? যেমন করিয়াই হউক, মমতার দর্প চূর্ণ সে করিবেই!

অন্যমনস্কে ভাবিতে ভাবিতে দেবেন রাজাবাবুর বাড়ীর নিকটেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। সম্মুখে হুঁকা হস্তে রাজাবাবুকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া দেবেন একটি নমস্কার করিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিল—ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে অনেকখানি পথ এসে পড়েছি

মাথাটা বড় ঘুরুছে উঃ! বলিতে বলিতে দ্বারের পাশের উঁচু জায়গাটায় সে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল এখনই যেন মূর্চ্ছা যাইবে। রাজা বাবু ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আহা এখানে কেন, এখানে কেন? ভেতরে চল। ওরে ও শচে, শীগ্গীর এদিকে আয় একবার। দেবেনকে ধরিয়া তুলিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া রাজা বাবু বাহিরের ঘরে খাটিয়ার উপর বসাইলেন। দেবেন ঢলিয়া পড়িল। সত্যই বুঝি সকালের উত্তেজনায় তাহার রুগ্ন শরীর কেমন করিতেছিল। রাজা-লাল ওদিকে—ওরে শচে্ ও ইন্দু শীগ্গীর জল নিয়ে আয়, পাখা নিয়ে আয়, বলিয়া চেঁচামেচি করিতেছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শচীকান্ত ছুটিয়া আসিল, ইন্দু জল ও পাখা লইয়া আসিল। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া রাজা বাবু বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবেন কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, ইন্দুর হাত হইতে গ্লাস লইয়া জল পান করিল।—আঃ! অসুখের পর থেকে মধ্যে মধ্যে এমন মাথা ঘুরে আসে। ও বাড়ী ব্যাগে আমার ওষুধ আছে, কা'কেও দিয়ে যদি ব্যাগ্টা আনিয়ে দিতেন, ওষুধটা খেলে এখনই উপকার হ'ত।

পুত্রের দিকে চাহিয়া রাজা বাবু বলিলেন—যা'তরে শচে ছুটে গিয়ে ও বাড়ী থেকে তোর দেবেন দাদাবাবুর ব্যাগ্টা নিয়ে আয়।

শচীকান্ত ব্যাগ আনিতে চলিয়া গেল, রাজাবাবু তখনও পাখা করিতেছেন। খালি গ্লাসটি হাতে করিয়া ইন্দু এক পাশে দাঁড়াইয়া-ছিল। তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের উপর দেবেনের দৃষ্টি পড়িল।

সেদিনও দুই একবার এই ফোট' ফোট' অনাঘ্রাত ফুলটি দেবেনের চোখে পড়িয়াছিল, তখন তাহার মনের গতি অন্যদিকে ছিল, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। ইন্দুর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিতেছে, রাজাবাবু পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তবুও আজ দেবেন তাহার লুব্ধ দৃষ্টি সংযত করিল না। চাহিয়া চাহিয়া, দেবেনের প্রত্যাহত আকাঙ্খা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—এই ত! এইখানেই প্রতিহিংসার সহজ পথ,এক ঢিলেই সে দু'টি পাখীই মারিবে; গর্ব্বিতা মমতা তাহাকে জব্দ করিবার জন্য আজ যে পদত্যাগ করিয়াছে, সেই পদ তাহারই এই রূপবতী ভাগনীটিকে দিয়া, দেবেন তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবে।

দেবেনের ক্ষুধিত দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত দেখিয়া ইন্দু লজ্জায় জড় সড় হইয়া মুখ নত করিয়া ছিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখিল তখনও দেবেন তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে। ইন্দু দ্রুত পদে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া হাঁপ ছাড়িল।

দেবেন দ্বারের আড়ালে অন্তর্হিতা ইন্দুর পশ্চাৎ হইতে অতৃপ্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র স্থূলবুদ্ধি রাজালালের মুখের উপর স্থাপিত করিল। তাঁহার হাত হইতে পাখাখানি টানিয়া লইয়া দেবেন বলিল—আর আপনাদের ব্যস্ত হ'তে হবে না, একটা বড় আঘাত খেয়ে দুর্ব্বল শরীরটা হঠাৎ কেমন হ'য়ে গিয়েছিল, এখন সাম্‌লে গিয়েছি।

রাজালাল উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন---আঘাত? পড়ে টড়ে গেছ্‌লে নাকি?

দেবেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—না না সে সব কিছু না। একটা

বড় আশা করে এসেছিলুম—আজ এ'দের বাড়ী নিয়ে যা'ব মনে করেছিলুম, কিন্তু—

রাজাবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া দেবেন একে একে তাহার জেঠামশায়ের মৃত্যুর কথা, তাঁহার উইলের বিষয়, নিজের অসুখ ও তাহার পর তাহার পূর্ব্বের সব বদ্‌খেয়ালী ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নির্জলা ভাল হইবার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া এখানে আগমন, আগমনের উদ্দেশ্য, এবং স্ত্রীর নিকট অপমানের কথা, সমস্তই বর্ণন করিল। অবশ্য বেশ গুছাইয়া, যত দূর সম্ভব সে নিজের দিকে টানিয়াই বলিল।

পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের এত বড় বিষয়টা পরের হইবে, আর ইহার ন্যায্য অধিকারী সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ভাবিতেই এই মাত্র অমন করিয়াই দেবেনের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। রাজালাল শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। খরচ খরচা বাদে পঁচিশ হাজার টাকা বৎসরে আয়! রাজালালের চোখ দু'টি গোলাকার হইয়া একেবারে কপালে উঠিল। দেবেনের কুটীল দৃষ্টি ইহা লক্ষ্য করিল। কিছুক্ষণ পরে দেবেন বলিল—ইন্দু না কি নাম বল্‌লেন না? তা ওটি বুঝি আপনার বড় মেয়ে, বেশ মস্তটিই হয়েছে ত।

—হাঁ, ইন্দু, আমার বড় মেয়ে, সেই ছেলেবেলায় কবে দেখেছিলে, সে ত অনেক দিনের কথা, এখন চিন্‌তে পার্চ্ছ না।

তা বৈকি। এখনও বে'থা, দেন্‌নি বুঝি, ঠিক্ ঠাক্ কিছু হয়েছে কোথাও?

নাঃ, আমি আর ঠিক্ ঠাক্ কি কর'ব বল, ওর মামাও ত কিছু বলেন্ না।

—তা আপনার মেয়েটিত বেশ সুন্দরী, গড়নটা ও বেশ বাড়ন্ত। এখন থেকেই চেষ্টা চরিত্তির করুণ না, অমন সুন্দরী মেয়ে অনেক বড় লোকেই বিনি পয়সায় নিয়ে যেতে চাইবে।—বক্রদৃষ্টিতে দেবেন রাজালালের দিকে চাহিল, কিন্তু তাঁহার মুখে একটুও উৎসাহ ভাব দেখিল না। দেবেন বুঝিল এ বোকা বুড়া তাহার ইঙ্গিতের ধার দিয়াও যাইতেছে না, এখানে স্পষ্ট কথায় না বলিলে কিছু ফল হইবে না,—

এত বড় একটা সম্পত্তি একটু খানির জন্যই হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে, ইহা একবারেই অসহ্য, পূর্ব্ব স্ত্রী যখন এমন করিয়া অপমান করিল, তখন বয়স্থা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ করা ছাড়া দেবেনের গত্যন্তর নাই। প্রথম যৌবনে কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার একটু পদস্খলন হইয়াছিল বটে, বড় লোক মাত্রেই অমন হইয়া থাকে, আবার দু'দিনে শুধ্রাইয়া যায়। লোকে অপবাদ রটাইবার সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহার সম্বন্ধেও অনেক অপবাদই রটিয়াছিল, কিন্তু তাহা কতটা সত্য মিথ্যা তাহা তাহার স্ত্রীর উপস্থিত ব্যবহার হইতেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সে ত এখন একেবারেই শুধ্রাইয়া গিয়াছে, নিজের ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে, তাই না বড় আশা করিয়াই সে স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছিল—যদি এই তিরিশ বৎসর বয়সে আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে পারে, সম্পত্তিটাও হাত ছাড়া না হয়। কিন্তু তাহার সে

দুরাশা ত নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। তা যাউক্, ইচ্ছা করিলে সে একটা ছাড়িয়া দশটা বিবাহ করিতে পারে। এখনও তাহার যাহা আছে তাহাতে সে রাজাবাবুর সংসারের মত দু' চারিটা সংসারকে পিয়ারী বাবুর অপেক্ষাও সুখে রাখিতে পারে। শ্যালকের নিকট রাজাবাবুর দুরবস্থার কথা সমস্তই ত দেবেনের জানা আছে। রাজাবাবুর যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে দেবেন তাঁহাকে নিজের বাপের মত যত্নে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, যাহাতে তাঁহারা সপরিবারে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তাহার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে, জীবনে আর কখনও রাজাবাবুকে এমন করিয়া পরের কাছে হাত পাতিতে হইবে না। আর দেবেনকে যখন আবার বিবাহ করিতেই হইবে—রাজাবাবু যদি সম্মত হন—তাহা হইলে—ইন্দুকে—

এতক্ষণে রাজাবাবুর মাথায় ঢুকিল দেবেন কি প্রস্তাব করিতেছে। বিস্ময়ে তিনি ত একেবারে নির্ব্বাক, এত বড়লোক, যার ৩০।৪০ হাজার টাকা আয়, জুড়ী গাড়ী, মস্ত বাড়ী সে কিনা নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার জামাই হইতে চাহিতেছে! আহ্লাদে তিনি একেবারে আটখানা! হইলই বা দেবেনের একটু বয়স হইয়াছে, ইন্দুরও ত বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসর, আর তিরিশ বত্তিরিশ বৎসর এমনই বা বেশী কি? দেবেন একদিন বদ্‌খেয়ালী করিয়াছে, তা অনেকে অমন করিয়া থাকে। ওসব দেখিতে গেলে চলে না। এখন ত সে ভালই হইয়াছে। সকলে মিলিয়া রাজাবাবু আবার কলিকাতায় যাইবেন; কি ছাই আছে এ ছাতুর দেশে? দেবেন যে বলিল, সেখানে সে আলাদা বাড়ী ঘর, বিষয় আশয় করিয়া

দিবে, তবে এখানে পিয়ারী বোসের হাত তোলানি ৩০টা টাকার আশায় পড়িয়া থাকিয়া কি হইবে? আর তাহাতে ত কন্যার বিবাহ হইবে না। আনন্দে রাজালাল একেবারে আত্মহারা, কিছু-ক্ষণ পরে আনন্দের বেগ একটু কমিয়া আসিলে তিনি হাসিয়া গলিয়া বলিলেন—তা, তা, আমাদের কি সে পুণ্যির জোর আছে, তা তুমি যদি দয়া করে ইন্দুকে পায়ে জায়গা দেও। তবে এ কথাও বলে দিচ্ছি, ইন্দু আমাদের খুব ভাল মেয়ে, ওকে যদি ঘরে নিয়ে যাও তোমার খুব সেবা যত্ন করবে, আর বছর না পার হতেই সোনার চাঁদ—দেবেন মাথাটা একটু নত করিল। রাজালাল হাসিয়া উঠিলেন—তা এতে আর লজ্জা কি বাবা, ছেলে আর জামাই একই কথা। তা দেখ বাবাজি, কলকাতায় আমার একটা কাঠের গোলা করে দিয়ো, কাঠের ব্যবসা আমি খুব ভালই জানি, সেবার পিয়ারী বোস হিংসে করে' আমার কারবারটা উঠিয়ে না দিলে, এতদিনে বড় রাস্তার ওপর কত বড় বাড়ী হাঁকাতুম্ দেখে নিতে।

হাসি গোপন করিতে না পারিয়া দেবেন অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। রাজাবাবু দেবেনের এই অমনোযোগীতায় একটু দমিয়া গিয়া বলিলেন—তা সে সব ব্যবস্থা কল্‌কাতায় গিয়েই হবে। আমি একবার বাড়ীর মধ্যে দেখি, বাবাজির জন্যে এক কাপ্ চা যোগাড় হয় কি। শচে ছোঁড়াটা এখনও এল না, পথে কার সঙ্গে আড্ডায় মেতেছে বোধ হয়, তার কি কোনও কাণ্ড জ্ঞান আছে!

বলিতে বলিতে রাজাবাবু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছিলেন, দেবেন ব্যস্তভাবে বলিল—দেখুন এসব কথা বাড়ীর মধ্যে এখন যেন

ভাঙ্গ্‌বেন না, গোড়াতেই মেয়ে মানুষকে বল্‌লে কোন কাজই হয় না, তা ছাড়া, পিসিমা তাঁর ভাই, ভাইঝির বিরুদ্ধে কখনও যাবেন না। এখনই তাঁকে বল্‌বার দরকার কিছু নেই। তা হলে সবেই পণ্ড হবে।

রাজালাল তখন জমিদারের শ্বশুর হইবার উৎসাহে ফুলিতেছেন, আস্ফালন করিয়া বলিলেন—ইস্ পণ্ড কর্‌লেই হ'ল আর কি? আমি কি পিয়ারী বোস্‌কে ভয় ক'রে চলি, না তার কোনও তোয়াক্কা রাখি?

দেবেন হাসিয়া বলিল—তাঁর তোয়াক্কা না রাখুন তাঁর ব'নের কথা ত একটু বিবেচনা কর্ত্তে হয়। তিনি যদি গোড়াতেই অমত করেন তা হ'লে—

রাজালাল বাধা দিয়া বলিলেন—কোনও শালার ব'নের কথার আমি ধার ধারিনে। অমত কর্‌লেই হ'ল আর কি? দেখে নেব না কার বাবার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

দেবেন দেখিল পাগল ক্ষেপিয়াছে—সে গম্ভীর ভাবে বলিল—কথা শুনুন, অমন চেঁচামেচির ভেতর আমি নেই। কাজটা না হ'লে আমার এমন বেশী ক্ষতি হবে না। ভালর জন্যই বল্‌ছি, ঘুণাক্ষরে কথাটা কাকেও জান্‌তে দেবেন না। আমার সঙ্গে বেশী টাকা নেই, ব্যাগ আসুক, আপনাকে শ'খানেক টাকা দিয়ে যা'ব-'খন, আপনি আর যা হয় একটা কিছু ব'লে কলকাতায় যাবার উয্যুগ করুন, সব ঠিক হলে আমায় কলকাতায় জানাবেন—খামে ঠিকানা লিখে দিয়ে যাব'খন—আমি আপনাকে যাবার খরচের জন্য আরও টাকা পাঠিয়ে দেব, সকলকে নিয়ে আপনি কলকাতায় চলে'

আস্‌বেন, তখন কেউ শুনুক্ আর না শুনুক তা'তে কিছু গোলমাল হবে না। এই বন্দোবস্ত মত কাজ কর্‌তে ও যত শীগ্‌গীর সম্ভব কলিকাতায় আস্‌তে আপনি যদি রাজী হ'ন তাহলে আমি আর কোথাও চেষ্টা দেখ'ব না, নয়ত বাধ্য হয়েই আমাকে অন্য জায়গায়—

না না, তোমার সে সব কিছু কর্‌তে হবে না। তুমি যেমনটি বল্‌'ছ আমি তাইই করব'। কথার নড়চড় হবে না।

শচী ব্যাগ লইয়া আসিল। ও বাড়ীতে ব্যাগ চাহিতে ও দেবেনের অসুখের কথা বলিতেও কেহ কোন কথাই বলে নাই, কানাইয়া উপর হইতে ব্যাগটি আনিয়া তাহার হাতে দিয়াছিল।

সন্ধ্যার পরেই সারদাকে প্রণাম করিয়া, রাজালালের হাতে গোপনে একখানি একশত টাকার নোট দিয়া এবং বার বার সতৃষ্ণনয়নে এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে দেবেন বাহির হইয়া আসিল, আট্‌টার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবে।

(১২)

গ্রীষ্মের অবকাশ শেষ হইয়া আসিতেছিল। সমরের ডাক্তারি পড়িবার ইচ্ছা, সে I. Sc. পড়িবার জন্য এলাহাবাদে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কানপুরের কলেজও ১৫।২০ দিনের মধ্যেই খুলিবে। কি পড়িবে, কোন্ কোন্ বিষয় লইবে, কোন্ কলেজেই বা ভর্ত্তি হইবে সে সব বিষয়ে মোহিতের কোন আগ্রহই দেখা যাইতেছিল না।

একদিন বিমলাকে একান্তে পাইয়া মোহিত বলিল—দু'এক দিনের মধ্যে কলকাতায় যা'ব স্থির করেছি।

সহসা এরূপ প্রস্তাবে বিমলা বিস্মিত হইলেন, পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সেখানে দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া একটু বিস্মিত ভাবেই বলিলেন—কলকাতায়? কেন? আর পড়্‌বিনে?

—পড়া না পড়া, সেখানে গিয়ে যেমন সুবিধে বুঝ্‌ব' তাই কর্‌ব। পড়বার ইচ্ছাই ত আছে।

—কলকাতায় যাবার কি দরকার তা হলে?

একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মোহিত নত মুখে নীরব রহিল—সেদিনকার কথা হয়ত আপনা হইতেই মায়ের মনে পড়িবে। কিন্তু মা উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মোহিত বলিল—এখানে আত্মনির্ভরতার কোনও সুবিধে হবে না, আর সে ভালও দেখাবে না।

এইবার চড়াৎ করিয়া বিমলার মনে পড়িল সে দিন তিনি মোহিতকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন। পুত্রের এই ঐকান্তিক দৃঢ়তা দেখিয়া প্রথমে তাঁহারই ত আনন্দিত হইবার কথা, তিনি নিজেইত মোহিতকে এই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবুও মাতৃ হৃদয় এই আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় কাতর হইয়া উঠিল। মনু চলিয়া যাইবে—কানপুর ছাড়িয়া কত দূরে চলিয়া যাইবে! না ইহাত তিনি মনে করেন নাই। সে যে তাঁহার এই সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবনের একমাত্র বন্ধন! মাকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে—কত বিপদ আপদ!—

কিন্তু তাই বলিয়া কি স্নেহের আবরণে তিনি পুত্রের ভবিষ্যতের পথ অন্ধকার করিবেন ? আত্ম-দমন করিয়া বিমলা বলিলেন,—কবে যাবে মনে করেছ’ ? তোমার জেঠা ম’শায়কে বলেছ’ ? তাঁর অনুমতি নেওয়া দরকার।

—যত সত্বর হয় ততই ভাল—কাল রাত্রের গাড়ীতে যদি সম্ভব হয়, কালই যাব। না, জেঠা মশায়কে কিছু বল্‌তে সাহস হয় নি। তুমি বল্‌লে সহজেই তাঁর অনুমতি পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা, সুবিধে মত আমিই না হয় তাঁর কাছে কথাটা পাড়্‌ব’। বেশ্ করে’ ভেবে চিন্তে দেখে কোনও কাজে হাত দিতে হয়, বিদেশে কত বিপদ আপদ, অসুবিধে, শেষে কি—

—তোমার মত দৃঢ়চিত্ত মা যার, সে কি—হঠাৎ কথাটা অর্দ্ধেক বলিয়াই মোহিত লজ্জায় মুখ নত করিল। পাছে নিজেরও একটা দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় বিমলাও দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হাজার হউক মায়ের প্রাণ ত বটে। তাহা ছাড়া, মোহিতের ঐ অর্দ্ধ সমাপ্ত কথাটুকুতে যে কতখানি অভিমান লুক্কায়িত ছিল তাহা বিমলার বুঝিতে দেরী হইল না। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সত্যই বুঝি এই পিতৃ-হীন বালকটিকে এমন করিয়া দূরে দূরে রাখা তাঁহার পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক হইয়াছে, সেই অভিমানেই বুঝি সে আজ এত সহজেই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে! তাহা হউক, মোহিতের ভবিষ্যৎ চাহিয়াই তাঁহাকে এতটা কঠোরতার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, দরকার হইলে আরও শক্ত হইতে হইবে।

(১৩)

কয়েক দিন পরে আজ আবার মমতা একখানি ট্রে করিয়া পিতার চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপরে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সম্প্রতি তাহার উপর দিয়া একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি টানিয়া দিয়াছে। ছাইয়ের আবরণে এতদিন আগুণ নিভিয়া আসিতেছিল, সহসা একটা ঝড় উঠিয়া সঞ্চিত ছাই উড়াইয়া ভিতরের আগুণটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছে, জ্বালায় মমতা ক' দিনেই শুকাইয়া উঠিয়াছে। সেদিন দেবেন কেন অমন করিয়া সহসা অন্তর্ধান করিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাহা কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মিছামিছি কাদা ঘাঁটিয়া কোনই ফল নাই, পিয়ারী বাবু সকলকেই এ বিষয়ে কোনও উচ্চ-বাচ্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। মা রাগ করিয়া সেদিন হইতে মমতার সঙ্গে আলাপ করেন নাই। পিতার সমক্ষে যাইতেও মমতার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে আজ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল, কই সে ত এমন কিছু অপরাধ করে নাই যাহার জন্য মা তাহাকে এড়াইয়া চলিবেন, বিধুপিসি কারণে অকারণে নাক সিঁটকাইবেন আর সেও চোরের মত ভয়ে ভয়ে থাকিবে? তাই আজ জোর করিয়া সঙ্কোচের বাধ ঠেলিয়া দিয়া সে পূর্ব্বের ন্যায় পিতার চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপরে যাইতেছিল। কিন্তু সিঁড়িতে আসিয়া তাহার পা যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল, মনে হইল—ফিরিয়া যাই।

বিমলা কুটনা কোটা সারিয়া উপরে আসিতেছিলেন, মমতা

এখনও সিঁড়ি ছাড়িয়া উপরে যায় নাই, যাইতে যেন সে কেমন ইতস্ততঃ করিতেছে, লক্ষ্য করিয়া বিমলা বলিলেন—দাও আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বরং কাপড় কাচ্‌তে যাও।—মমতা যেন মহাবিপদে ত্রাণ পাইল, বিনাবাক্যে বিমলার হাতে ট্রে দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে পিয়ারীবাবু চায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, চায়ের পাত্র লইয়া বিমলাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—আপনি নিজে কেন আন্‌তে গেলেন বৌ'মা, কানাইয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হ'ত। টেবিলের উপর পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া বিমলা নত দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাত্র ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া পিয়ারীবাবু বলিলেন—কানাইয়া এসে এসব ধুতে নিয়ে যাবে'খন।

বিমলার যাইবার ভাব দেখা গেল না। তাইত! বৌ'মা ত কখনও সহজে তাঁহার সম্মুখে বাহির হন না, বা বিশেষ দরকার না হইলে কথা বলেন না, তবে যাইতে বলা সত্ত্বেও এমন করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন? চায়ের কাপে দুধ ও চিনি ঢালিয়া চামচ্ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে পিয়ারীবাবু বলিলেন—আমায় কি কিছু বল্‌বেন বৌ'মা?

বেশ স্পষ্ট গলায় ধীরে ধীরে বিমলা বলিলেন—মনু কল্‌কাতায় যেতে চাইছে, সে বলে কালই যাবে।

—কলেজ খুল্‌বার সময় হ'ল, এখন কল্‌কাতায় কি কর্‌তে যাবে? কলেজে ভর্ত্তি হবে না?

—না, সে এখানে পড়্‌বে না বলে।

পিয়ারীবাবু উগ্রভাবে বলিলেন—না পড়্‌বে না, পণ্ডিত হয়ে গেছে না কি ?

—তা না, সম্ভব হ'লে কল্‌কাতাতেই পড়্‌বে।

—তার দরকার কি ? আর দু'টো বছর ত এখানেই পড়ুক্, তারপর রুড়্‌কীতে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়্‌তে পাঠাব।

বিমলা একবার ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর হঠাৎ বলিলেন—এখন ত সে বড় হয়েছে, নিজের ভার তার নিজেই নেওয়া উচিৎ। আর কতদিন—

পিয়ারী বাবু এবার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইলেন, চায়ের কাপ মুখে উঠিতে উঠিতে অর্দ্ধেক পথেই রহিয়া গেল। মিনিটখানেক পরে আস্তে আস্তে চায়ের কাপ্‌টি নামাইয়া রাখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—কেন বৌ'মা, এখানে কি আপনাদের কোনও অসুবিধা, কি কষ্ট হচ্ছে ? কেউ কি কোন মন্দ কথা বলেছে, আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ?

—না না অমন কথা বল্‌বেন না—ভগবানের কাছে অপরাধী কর্‌বেন না। নিরাশ্রয়ে পথে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আপনার বাড়ী এসে এত স্নেহ, এত আদর পেয়েছি, বোধ হয় নিজের বাপের কাছেও কেউ তা পায় না। সে কথা যে দিন ভুল্‌ব, মনুর আমার যেন মহা অনিষ্ট হয়। আপনি অমন কথা মনে কর্‌বেন না। আর আমি ত বাপের ঘর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে, সে একাই যাবে।

—এত কথাই যদি বুঝে থাকেন বৌ'মা, তা' হলে এটা কেমন

করে' ভুল্লেন যে মনুর ওপর আমারও একটা দাবী আছে—তা'কে ত অমর সমর থেকে কোন দিনই পৃথক করে দেখিনি আমি। তবে কেন আমার তিন্‌টি ছেলের একটিকে এমন করে', দূরে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন?—তার উন্নতির জন্যে? তা আমিও সে বিষয় অন্ধ থাক্‌ব' না। তার ভবিষ্যৎ অনেক দিন থেকেই যে আমি মনে মনে এঁকে রেখেছি, সময়ে আপ্‌না থেকেই তা জান্‌তে পার্‌তেন; কিন্তু আজ আর না বলিয়ে ছাড়্‌লেন না দেখ্‌ছি।

একটু থামিয়া কয়েক ঢোক ঠাণ্ডা চা পান করিয়া, একবার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বিমলার আনত মুখের উপর স্নেহের দৃষ্টি বুলাইয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন—স্নেহ ও মোহিতের মধ্যে এত দিন ধরে' একটা গাঢ় প্রীতিভাব গড়ে উঠেছে, তা' লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়। তা'দের ছেলে বেলার এই বন্ধু ভাবটা এখন অন্য ভাবে পরিণত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হ'লে, আমি কি তা'দের কচি মনে একটা দাগ্‌ পড়্‌বার, একটা অসম্ভব স্বপ্ন গড়ে উঠ্‌বার সম্ভাবনা দেখেও চুপ করে থাকৃতুম, বিশেষতঃ পিসিমার অত খোঁচাখুচি সত্ত্বেও? বাহাত্তর বছর বয়স হ'তে এখনও আমার একটু দেরী আছে।—একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—আমাদের বংশে জামাই ভাগ্যটা যে কেমন তা' ত আপনার অজানা নেই—পিসিমার কথা শুনেছেন, বিধুর কথা জানেন, সারদার কপাল ত দেখ্‌ছেন, মমতার ব্যাপারেও নিজে ভুগ্‌ছেন। তাই মনে আশা করেছি, আমারই নিজের হাতে গড়া মোহিতের হাতে ছোট মেয়েটাকে দিয়ে যদি মনে করতে পারি, বংশের একটা মেয়েও অন্ততঃ সৎপাত্রে পড়েছে।

কথা শেষ করিয়া পিয়ারী বাবু প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে বিমলার দিকে চাহিলেন।

এবার বিমলার বিস্ময়ের পালা—এরকম একটা অচিন্তনীয় সংবাদে তিনি একেবারেই অভিভূত হইয়া গেলেন। এও কি সম্ভব—তাঁহারই মনু, যাহার আপনার বলিতে এই দাসীবৃত্তি-পরায়না মা ছাড়া জগতে আর কেহ নাই, মাথা গুঁজিবার একটা খড়ের আস্তানাও নাই, আজন্ম যে পরের দয়াতে বাঁচিয়া আছে, সে কিনা পিয়ারী বোসের জামাই হইবে? অসম্ভব! বিমলা আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—না তা, কখনও হ'তে পারে না। আপনারই বাড়ীর দাসীর ছেলে মনু, তার কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই, তা'কে আপনি স্নেহের খাতিরে অত উঁচুতে তুলে, জগতের কাছে অপদস্থ হবেন, আত্মীয় স্বজনের নিন্দার ভাগী হবেন, সে আমি প্রাণান্তে হ'তে দেব না। অমন স্বার্থ আমি চাই না। সে হ'তে পারে না। আর মোহিত নিজেই বা এমন সৎপাত্র কিসে?

ঈষৎ হাসিয়া পিয়ারী বাবু বলিলেন—মিছে কেন উত্তেজিত হচ্ছেন বৌ'মা? পিয়ারী বোস্ সব দিক না বুঝে না ভেবে খামকা একটা কথা বলে না। যান্, মনুকে বল্‌বেন, কলকাতায় যাওয়ার মতলব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, যেমন ছিল, সে তেমনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়া শুনায় মন দিক্।

তাঁহার অজ্ঞাতে পুত্রের সুখের এমন একটা মনোরম বন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিমলার মন পিয়ারী বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুকুল ছাপাইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করিলেন

মনের কোন্ অন্তঃপ্রদেশে আশা ভঙ্গের একটা ব্যথা খোঁচা দিতেছে। নিজের যোগ্যতা না দেখাইয়াই এত বড় ঘরে ধনীর জামাতা হইয়া, বিনা ক্লেশেই শত সম্পদের অধিকারী হইয়া তাঁহার মোহিত কি আর তাহার মৃত পিতার সেই নীরব আশার সম্মান রাখিবে, না সে তখন তাঁহারই থাকিবে? হয়ত একদিন রাজাবাবুর মতই অপদার্থ হইয়া তাঁহারই চোখের কাঁটা হইবে? তাহার মনে উন্নতি করিবার যেটুকু আশা আছে, চেষ্টা করিবার যেটুকু ইচ্ছা আছে তাহা ত এইখানেই অবসান হইবে। কিন্তু পিয়ারী বাবুও ত তাহার পিতার সমান, সর্ব্বপ্রকারে কৃতজ্ঞ ভাজন; এই প্রস্তাবে তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের উদারতাই প্রকাশ পাইতেছে, অতএব তাঁহার মনঃক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়াও উচিত নহে। কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বিমলা বলিলেন—মোহিত ত আপনারই সন্তান, তা'র সম্বন্ধে আপনি যেমন ব্যবস্থা কর্‌বেন তাই' হবে।—তবে আপনি যে প্রস্তাব কর্‌ছেন, তা'তে মনুকে কিছুদিনের জন্য এখান থেকে সরান উচিত নয় কি? কাঙ্গালকে হঠাৎ রাজপদ দিয়ে, তার সব চেষ্টা ও উন্নতির আকাঙ্খা নিভিয়ে দিলে আপনিও সুখী হবেন না। আমার ত মনে হয়, সে যখন নিজে হ'তেই যেতে চাচ্ছে, চেষ্টা কর্‌তে চাচ্ছে, তখন বাধা দিয়ে কাজ নেই। আর একটা অনুরোধ সে যেন এখন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জান্‌তে না পারে, তা হ'লে, তার কোথাও যাওয়া না যাওয়া সমান নিরর্থক হবে।

পিয়ারী বাবু নীরবে কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। বিমলার কথার গুরুত্ব তাঁহার বিবেক একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—সে কথাও ঠিক বটে, এখানে রেখে, এ বিষয় তা'কে জানতে না দিয়েও বেশী দিন পার পাওয়া যাবে না, এখনই ত পিসিমার বকুনি অস্থির ক'রেই তুলেছে। তা বেশ আপনি যেমন ভাল বুঝ্ছেন্ তাই করুন্, তবে দেখ্বেন ছেলেমী বশে ইচ্ছা করে' সে যেন অনর্থক কষ্ট ভোগ না করে, আমার কাছ্ থেকে দরকার মত সাহায্য নিতে সে যেন ইতঃস্তত না করে।

পিয়ারী বাবু নীরব হইলেন। বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, পিয়ারী বাবু অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—আপনার দিদিকে একবার ডেকে দিয়ে যাবেন।

(১৪)

পরদিন ভাল করিয়া সকাল হইতে না হইতেই মোহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইল। জামা কাপড় পরিবার জন্য উপরে আসিতেই দেখিল স্নেহ জুতা জামা পরিয়া, বাহিরে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গত রাত্রেই মোহিত মায়ের নিকট শুনিয়াছিল তাহার কলিকাতায় যাইবার কথায় পিয়ারী বাবু অনুমতি দিয়াছেন; তাই আজ ঘুম ভাঙ্গিতেই মনে করিয়াছিল সকাল সকাল বাহির হইয়া, তাহার চির পরিচিত জায়গাগুলি ও যে দু' চারজন বন্ধু বান্ধব আছে তাহাদের নিকট হইতে কিছুকালের মত সে বিদায় লইয়া আসিবে, ওবাড়ীতে ত একবার যাইতেই হইবে। কিন্তু স্নেহকে এত সকালেই বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া তাহার সে আশা তিরোহিত হইল।

মনে মনে রুষ্ট হইয়া সে বলিল—তুমি আবার কোথায় যাবে এখনি? বেলা হ'লে তোমার ছোট্‌দা'র সঙ্গে যাবে'খন। আমায় আজ অনেক জায়গায়, অনেক কাজে ঘুর্‌তে হবে।

যাহার চপল দৌরাত্মে মোহিতকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত, সেই স্নেহ আজ ক'দিন নীরব হইয়াছে, সময়ে অসময়ে মোহিতদা'কে ব্যস্ত বিব্রত করিতে আসে নাই। আজ যখন সে দুঃখিত অভিমানের স্বরে বলিল—আজও সঙ্গে যেতে দেবে না মোহিতদা'! আমি কিচ্ছু জ্বালাতন কর্‌তুম্‌ না কিন্তু,—তখন মোহিত নিজের রূঢ়তায় লজ্জিত হইল, তাহার মনে পড়িল গত কয়েক দিন সে নিজের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, তাহার এই একান্ত অনুগত স্নেহশীল ছোট ব'নটির প্রতি যথেষ্টই অবিচার করিয়াছে।

মোহিতকে নীরব দেখিয়া স্নেহ আবার করুণ কণ্ঠে বলিল—আজ ত তুমি চলে' যাবে মোহিতদা'। ক্ষুব্ধ অভিমানে বেচারার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল, দৃষ্টিও বুঝি সজল হইয়া উঠিতেছিল। মোহিত তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল—রাগ করো না লক্ষ্মী ব'ন, ক'জায়গায় যাবার দরকার ছিল বলেই তোমায় যেতে নিষেধ কর্‌ছিলুম। তা থাক্‌, সে কাজ পরে গিয়ে কর্‌লেই হবে'খন। চল, চট্‌ করে' একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসি। সমর এখনও ওঠেনি বুঝি, তা'কেও ডাক্‌লে হ'ত না?

মেঘের ভিতর দিয়া চাঁদের ক্ষীণ আলো দেখা দিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে মুখ তুলিয়া স্নেহ বলিল—ছোট্‌দা এখনও ঘুমুচ্ছে, তা'কে সঙ্গে নিতে গেলে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে যে।

—তবে থাক্, চল আমরা দু'জনেই চট্ করে' একটু ঘুরে আসি। মোহিত অগ্রসর হইল, স্নেহ নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

গঙ্গার ধারে পৌঁছাইয়া স্নেহ বলিল—চল'না মোহিতদা' একবার ওপারে যাই। এতক্ষণ দু'জনেই নীরবে ছিল, অন্য দিনের মত স্নেহও আজ পথে কোনরূপই চপলতা দেখায় নাই বা অনর্গল বকিতেছিল না। মোহিত বোধ হয় নীরবে ভাবিতেছিল, ওবাড়ী যাইতে কত বেলা হইবে—স্নেহকে সঙ্গে লইয়াই এখন যাইলে হয় না? তাই হঠাৎ স্নেহের কথায় চমকিত হইয়া সে বলিল—চল, পিসিমার বাড়ী যাওয়া যাক্, এর পর বেলা হ'লে তখন আস্তে পারি না পারি, এই বেলা বিদায় নিয়ে যাই।

ক'দিন পরে আজ মোহিতের সঙ্গে আসিতে পাইয়া স্নেহের যে আনন্দটুকু হইয়াছিল, মোহিতের কথায় সহসা তাহা উবিয়া গেল, যেখানটায় তাহার চিরকালের ব্যথা, মোহিত না জানিয়া সেই জায়গাটিতেই আঘাত করিল। ইন্দুর সহিত মোহিতদা আলাপ করিলে, তাহাকে কিছু দিলে বা বেড়াইতে আনিলে ছেলেবেলা হইতেই স্নেহের বড় রাগ হইত, মোহিতদা'র সহিত এই জন্যই তাহার কতবার আড়ি হইয়া গিয়াছে। আজ এত সাধাসাধির পর বেড়াইতে আসিয়া, ওপারে যাইবার জন্য স্নেহ কাতর অনুরোধ করিল আর তাহার মোহিতদা' কিনা এখনই ইন্দুদের বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল! স্নেহের মনে বড় রাগ হইল, সে বলিল—খালি ওবাড়ী আর ওবাড়ী, যেতে হয় তুমি যাও, আমি ওপারে চল্লুম্।

ভাগ্য-নিরূপিতা

স্নেহ সত্যই একা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, মোহিতও তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপ অত্যাচার আব্‌দার সহিয়া সহিয়া মোহিত এতদিনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেও, আজ তাহার ভাল লাগিল না; তাই ওপারে পৌঁছাইয়াও একটি কথা না বলিয়াই সে পুল হইতে কতকটা দূরে একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িল।

নিকটে পিয়ারা বনে একটা ময়ূর পিহু পিহু করিয়া গঙ্গার বুকে ও পিছনের মাঠে অনেকগুলি প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। মোহিত বোধ হয় অন্যমনস্কভাবে, সঙ্গিনীর জন্য ময়ূরটির এই আকুল আহ্বান শুনিতেছিল। স্নেহ কতকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, পাথর ছুঁড়িয়া শব্দায়মান ময়ূরটিকে তাড়াইয়া দিল, তাহার পর হঠাৎ মোহিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—রাগ করে'ছ মোহিতদা' ? আমায় মাপ কর। স্নেহের কণ্ঠ বাষ্পময়, চির চঞ্চল মুখখানি বিষাদ মলিন।

আজন্ম পরিচিত ও নিজের হাতে গড়া তাহার এই ছাত্রীটির ব্যবহার মোহিতের আজ যেন কেমন রহস্যময় মনে হইল। সদা কৌতুকময়ী সুন্দর মুখখানি তাহার আজ কেন এত মলিন, কণ্ঠস্বর এমন কাতর কেন ? মোহিত বুঝিতে পারিতেছিল না। হয়ত তাহার আশৈশবের বন্ধুটি আজ চলিয়া যাইবে বলিয়া স্নেহ এত কাতর হইয়াছে। মোহিত কোমল কণ্ঠে বলিল—রাগ কর্‌ব কেন ? তুমিত কোন দোষই করনি দিদি। পাশে বসাইবার জন্য স্নেহের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—না রাগ করনি বুঝি ! ক'দিন কথা কহা হচ্ছে না,

বেড়াতে নিয়ে এস না, কেন? আমি কি করেছি তাই যে তুমি আজ চলে যাবে?

কয়দিনের সঞ্চিত অভিমান আজ স্নেহের স্পর্শে গলিয়া ক্ষরিয়া পড়িল। কাল রাত্রেই স্নেহ কেমন করিয়া শুনিয়াছে, মোহিতদা' আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, সেই হইতে একটা অদম্য রোদন ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, এবার আর স্নেহ তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মোহিতও অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল, স্নেহের এরূপ আচরণ ত সে কখনই দেখে নাই. সে যে চিরদিনই হাস্যময়ী, চঞ্চল প্রকৃতি। কি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, মোহিত খুঁজিয়া পাইল না। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে স্নেহের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল—ছিঃ চুপ কর লক্ষিটি। মিছেমিছি অমন কাঁদ্তে আছে? ছিঃ তোমার উপর আমি রাগ কর্‌ব কেন? ক'দিন একটা ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিলুম্ তাই হয়ত না জেনেই তোমার ওপর একটু কঠোর ব্যবহারই করেছি, তুমি ভুল বুঝ'না। চুপ কর লক্ষ্মী দিদিটি আমার।

চুপ করার পরিবর্ত্তে স্নেহ আরও উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে লাগিল—হ্যাঁ তাই বুঝি, তবে তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

হাসি দিয়া স্নেহের রোদন চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া মোহিত বলিল—তোমার 'ওপর রাগ করে' আমি চলে' যাচ্ছি! আরে পাগল আর কি? আমি যে নিজের উন্নতির আশায় কল্‌কাতায় যাচ্ছি, আর তুমি একটা ভুল বুঝে' এমন একটা কাণ্ড বাধালে! ছিঃ এখন বড় হয়েছ, এখন কি পাগলামি কর্‌তে হয়?

স্নেহ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—তা হ'ক্ পাগলামী, যেতে দিচ্ছি আর কি? সব কাপড় জামা তোমার লুকিয়ে রাখ্‌ব, কাকীমাকে বারণ করে দেব', কি ক'রে তুমি যাও তাই দেখ্‌ব'।

স্নেহের এরূপ বিস্তার পরিচয় তাহার মাষ্টার ম'শায় অনেক দিনই পাইয়াছিলেন। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া মোহিত বলিল—ওসব দুষ্টুমি আর করতে হবে না, যাচ্ছি তার আর কি হয়েছে, সমর এখন তোমাকে পড়াবে। আর সুবিধে হ'লেই আমি এক এক বার আসব', এখানেই যদি তোমার বিয়ে হয়, নেমন্তন্নের লোভে ছুটে আস্‌ব দেখো।

মুখ ভেঙ্গ্‌চাইয়া স্নেহ বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা! বিয়ে কর্‌লুম আর কি? ওঁর কথায় যেন।

স্নেহের ক্রোধ দেখিয়া মোহিত হাসিয়া বলিল—সে কা'র কথায় তা' তখন দেখিয়ে দেব'। এখন ত ফেরা যা'ক্ চল', রোদ উঠেছে, অনেক বেলা হ'য়ে যাবে।

স্নেহ আর কিছু না বলিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। নির্জ্জন পুলের মাঝামাঝি আসিয়া, সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পথরোধ করিয়া সে বলিল—না মোহিতদা' তোমার কোথাও যাওয়া হতে পারে না। কে আমার পড়া ব'লে দেবে, কার সঙ্গে আমি বেড়াতে আস্‌ব'? ছোট্‌দা বড্ড বকে। আর আমার ভারী মন কেমন কর্‌বে যে! পায় পড়ি তোমার, কোথাও যেতে হবে না মোহিতদা'।

—তা বৈকি, সেই বেশ কথা, তোমার মাষ্টারী ক'রে আর খান্‌সামাগিরি করে'ই আমার পেট্ চেলে যাবে।—আঘাত করা

মোহিতের উদ্দেশ্য ছিল না, পরিহাসের ছলেই সে কথাটা বলিল। কিন্তু স্নেহ তাহার এরূপ নির্ম্মম পরিহাস বুঝিতে পারিল না। প্রবল বেগে কে যেন তাহার অন্তরের একটা অতি কোমল স্থানে আঘাত করিল। যন্ত্রনায় তাহার বালিকা হৃদয় অসাড় হইয়া আসিল। বিস্ফারিত নেত্রে একবার মোহিতের দিকে চাহিয়া সে নীরবে পথ ছাড়িয়া দিল।

স্নেহ কিছু বলিল না, পথ ছাড়িয়া দিল দেখিয়া মোহিত এবার দ্রুত পদে আগে আগে চলিতে লাগিল, একবার ফিরিয়া দেখিল স্নেহ পশ্চাতে আসিতেছে কিনা। তখন তাহাকে অনুসরণ করা ছাড়া স্নেহের যে আর উপায় ছিল না, তাহারা কেহ না জানিলেও সে ব্যবস্থা যে কাল রাত্রেই ঠিক হইয়া গিয়াছে!

কোম্পানীর বাগানের পিছনে গিয়া মোহিত দেখিতে পাইল সমর তাহার বাইক্ ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছে। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া, স্নেহ ও মোহিত ইতিমধ্যেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছে শুনিয়া সমর বাইক্ লইয়া বাহির হইয়াছিল, এই রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর যাওয়ার পর তাহার বাইক্ পান্‌চার হইয়া যায়, তাই এখন বাইক তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। পাশের রাস্তা হইতে মোহিত ও স্নেহকে আসিতে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল—Hallo, merry larks, out at peep of dawn? কিরে সেনা, অমন প্যাঁচার মত মুখ করে' আস্‌ছিস্ কেন? মোহিতদা' আজ চলে যাবে ব'লে বুঝি, কিছু দিনের মত হাতের সুখ্‌টা করে' নিয়েছে? Poor girl! দেখিরে পিঠ্‌টা ফুলে গেছে নাকি?

সমরের উপহাসে যোগ না দিয়া মোহিত বলিল—আমি একবার ওবাড়ী ঘুরে' যাব, তুমি সেনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও— কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মোহিত চলিয়া গেল। আঘাতের উপর আঘাত! ক্রোধে, দুঃখে ও ঈর্ষায় স্নেহের মন একেবারে আগুণ হইয়া উঠিল। মোহিত কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও স্নেহ আর তাহার সহিত দেখা করিল না, কথা কহিল না।

(১৫)

দেবেন চলিয়া যাইবার পর হইতেই রাজাবাবুর সংসার বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলিতেছিল। আজ ক'দিন সকালে উঠিয়াই সারদাকে আর অন্নচিন্তা করিতে হয় না। আজ তাই সকাল হইতেই কাপড়ের খুঁটে কতকটা চাল বাঁধিয়া লইয়া, ছোট একটি ঘটী হাতে সারদা গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। ঘাটে নামিতে নামিতে তিনি দেখিলেন সিঁড়ির একধারে বিধুমুখী পা ছড়াইয়া বসিয়া, আনীত শিশির তৈলে তাহার মাংসবহুল দেহটি বেশ চুপ্‌চুপে করিয়া তৈলাক্ত করিতেছে, পরনে একখানি দেড়গজী গামছা, সেখানি তাহার নাইয়ের ইঞ্চ্ ছয়েক নীচু হইতে হাঁটুর আধ হাত উপরে পৌছাইয়াই তাহার লজ্জানিবারণ কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে। চর্ব্বিত কয়লার রস, তাহার ঠোঁঠ্ দু'খানি রঞ্জিত করিয়া কস্ বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। চুলগুলি সাম্‌নে আনিয়া ঝুঁটির আকারে বাঁধা, পূর্ব্বেই সেগুলি তৈলসিক্ত করা হইয়াছিল। সারোদিদিকে ঘাটে নামিতে দেখিয়া হাসি মুখে সে কি বলিতে যাইতেছিল, অমনই খানিকটা কয়লা-মিশ্রিত থুতু

তাহার নগ্ন ভুঁড়ির উপর পড়িল, তাড়াতাড়ি বাঁ হাতের উল্টা পিঠ্ দিয়া সেটা মুছিতে মুছিতে পাশে সিঁড়ির উপরেই প্যাচ্ করিয়া পোয়াটাক থুতু ফেলিয়া বিধু বলিল—সারোদি, আজ যে বড় সকাল সকাল ?

—সংসারের ঝঞ্ঝাটে আসা ত বড় একটা ঘটে' ওঠে না, আজ একটু ভোরেই ঘুম ভেঙ্গেছিল, বাসিপাট সারা হয়ে' যেতে মনে হ'ল যাই এইবেলা গঙ্গায় একটা ডুব্ দিয়ে আসি। তা তুমি কি একাই এসেছ' না বিমলা ও এসেছে ?

—ইস্ সে আবার হেঁটে নাইতে এল' বৈকি, সে যে আর দু'দিন পরে মাটিতেই পা দেবে না বলে। বুঝিতে না পারিয়া সারদা বিস্মিত ভাবে বিধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কাল রাত্রে দৈব ক্রমে একটা আজ্গুবি কথা বিধুর কাণে ঢুকিয়াছিল সেই অবধি, সেটা আবার বাহিরে আসিবার জন্য বিধুবদনীর পেটের মধ্যে খোঁচাখুঁচি করিতেছিল। কাল সন্ধ্যার পর, চায়ের পাত্র লইয়া বিমলাকে পিয়ারীবাবুর ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, বিধুর সন্দিগ্ধ মন উৎকর্ণ হইয়া উঠে, সে পা টিপিয়া আস্তে আস্তে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। গোল গোল চোখ্ দু'টি দরজার ফাঁকে রাখিয়া ও দেহের অনুপাতে ক্ষুদ্র কাণ দু'টিকে খাড়া করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় আর কাহারও উপরে আসিবার বিশেষ সম্ভবনা ছিল না, সুতরাং তাহার এই আড়িপাতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না। ভিতরের কথা শুনিতে শুনিতে তাহার হাঁ'টি ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর হইতে লাগিল, চোখ দু'টিও জ্বলন্ত ভাঁটায় পরিবর্ত্তিত হইয়া কপালের

দিকেই উঠিতেছিল। অবশেষে হাঁ যখন আর বড় হইবার উপায় নাই, চোখও যতটা উপরে উঠিবার উঠিয়া গিয়াছে বিধু তখন তাহার বিশাল দেহে যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটিতে ছুটতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মা'য়ের ঘরে ঢুকিল।

নিস্কর্ম্মা অমর তখন তাহার ঠাকুমার কাছে বাঙ্গালা দেশের একখানি ছোট খাঁট গাঁওয়ের গল্প শুনিতেছিল। বিধু পিসিকে অমন হন্তদন্ত ভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল— সিড়িঁতে ভূত দেখেছ নাকি বিধুপিসি?

বিধুপিসি যে কি ভূত দেখিয়া আসিয়াছিল, অমরের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করা নিরাপদ নহে। কাজেই আশ কথা পাশ্ কথায় সে অমরের কথাটা চাপা দিয়া, কখন সে প্রস্থান করিবে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। অমরনাথের উঠিবার বিশেষ তাড়া ছিল না, বিধুমুখী অস্থিরভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত মনে সেখান হইতে চলিয়া গেল। অধিক রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া মা'কে জাগাইয়া একটা আশ্চর্য্য সংবাদ শুনাইবার সে বিস্তর চেষ্টা করিল। আপিমখোর বুড়ী দু'একবার হুঁ হা করিয়া সাড়া দিল; বিধু অনেকক্ষণ বক্ বক্ করিয়া বুড়ীকে ঝাঁকানি দিয়া বলিল— শুনছ মা, না ঘুমুচ্ছ?

কন্যার ২।১টি কথা বুঝি বুড়ির কাণে গিয়াছিল, জড়িতস্বরে বলিলেন—হ্যাঁ শুনছি, পিরু বিমলিকে বিয়ে করতে চায়, আহা তা বেঁচে থাক্।

বিধু হার মানিয়া কিছুক্ষণ এ পাশ্ ও পাশ্ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা সাতটার পূর্ব্বে কোনও দিন বিধুমনির ঘুম ভাঙ্গিয়াছে

অথবা সে বাহিরে আসিয়াছে, এ কথা অতি বড় শত্রুও কখনও বলিতে পারিত না, আজ কিন্তু সেই চিরাগত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিল। পাঁচটা না বাজিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত ড়াইয়া হাত ড়াইয়া তৈলের শিশি ও গামছা সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে স্নানের ঘাটে আসিয়া বসিয়াছে, যদি সেন গিন্নি বা বামুনদি'র দেখা পাইয়া, বুকের বোঝাটা নামাইতে পারে। এমন সময় সারদাকে ঘাটে নামিতে দেখিয়া বিধুর যথেষ্টই আনন্দ হইল। তারপর সারদা নিজেই বিমলার কথা তুলিতে, বিধুমুখী, হাত নাড়িয়া ভুঁড়ি নাচাইয়া, কয়লার থুতু ছড়াইয়া গত রাত্রের ঘটনা বর্ণনা সুরু করিল। অবশ্য, এই সূর্য্যোদয়কালে গঙ্গার উপর বসিয়া সে বলিতে ভুলিল না—বিমলাই প্রথমে দাদাকে অনুরোধ করে মনুর সঙ্গে স্নেহের বিবাহ দিতে।—কী আস্পর্দ্ধা দিদি! ঘুঁটে কুড়ুনী, বাড়ার রাঁধুনী তুই, তোর এত খানি সাহস? বল্‌ব কি দাদা-ও যেন কেমনতর, মাগী যেন তাঁকে কি ক'রে বশ করেছে, দাদা অমনি তাতেই রাজী। মা'য়ে পোয়ে আগে থেকেই মতলব এঁটে রেখেছিল বুঝি, ছোঁড়া আজই কল্‌কাতায় যাচ্ছে সব ঠিকঠাক্ করতে। কি ধড়িবাজী বুদ্ধি বাবা! মিটমিটে মাগী, ভেতরে ভেতরে তোর এত শয়তানি? এ সব কথা জানাজানি হ'লে পাছে কোনও গণ্ডগোল হয়, মতলব ফেঁসে যায়—লুকোচুরীই বা কি? আরে মাগী বিধুমনির চোখে তুই ধূলো দিবি?—ঈর্ষার তাড়নায় বিধু অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, আরও কতক্ষণ করিত বলা যায় না।

কিন্তু সারদা এত বড় একটা আজগুবী খবরে এতটুকুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না বা বিধুর এই ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে উৎসাহ কিম্বা

সহানুভূতি দেখাইলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যাই বেলা হয়ে' যাচ্ছে, চান্‌টা সেরে নিই।

বিধুর তিল্‌কে তাল করা অভ্যাস, সারদার অজ্ঞাত ছিল না। তাহা হইলেও কথাটার মধ্যে যে কতকটা সত্য ছিল তাহা তিনি একেবারেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না। বাহিরে বিধুর সম্মুখে পরম নির্লিপ্ত ভাব দেখাইলেও সারদার অন্তঃরাজ্যে তখন কিন্তু বেশ একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। মোহিত তাঁহাদেরই ন্যায় গৃহহীন পরাশ্রিত, ইন্দুর প্রতি তাহার যথেষ্টই স্নেহভাব প্রকাশ পাইত, তাই না সারদা অতি সন্তর্পনে মনে মনে একটা আশা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আজ তাঁহার প্রিয়পাত্র মোহিতের এত বড় সৌভাগ্য সংবাদে তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহার প্রাণে আশাভঙ্গের একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। ভগবান যে তাঁহাকে সকল রকমেই নত করিয়াছেন, ভবিষ্যতের কোন কল্পনা করাও যে তাঁহার অন্যায় ধৃষ্টতা।

সারদা ভাবিলেন, ইন্দু ত এখন আর ছেলে মানুষটি নাই, কথাটা তাহার কানে উঠিলে সে কি ভাবে গ্রহণ করিবে ঠিক্ কি? ব্যথাটা যে তাহাকে বড়ই বাজিবে! চিন্তিত ও বিষণ্ণ চিত্তে সারদা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন! ইন্দু রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সারদা বলিলেন—আঁচ দিয়েছিস্ এর মধ্যে? তা হবে, আমারই হয় ত অনেকখানি দেরী হ'য়ে গেছে, ঘাটে বিধুর সঙ্গে কথায় কথায় অনেকটা সময় গেছে।—একটু থামিয়া ইন্দুর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—বিধু বল্‌ছিল, মোহিত নাকি আজ কল্‌কাতায় যাবে। তা

কালও ত সে এসেছিল, হাঁরে তোকে কি যাবার কথা সে কিছু বলেছিল ?

—আজই যাবে !

বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের দিকে চাহিতে গিয়াই ইন্দু দেখিল মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। দৃষ্টি নত করিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া ইন্দু বলিল—যাবে বলেছিল বটে কিন্তু কবে তা'ত—অর্দ্ধেক পথেই ইন্দু আবার থামিয়া চুপ করিল।

সারদা ভাবিলেন, মোহিতের কানপুর ত্যাগ সংবাদে কন্যা ত এমন করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল, না জানি তাহা হইলে স্নেহের সহিত মোহিতের বিবাহ সংবাদে সে কি করিবে ! তবে থাক্, কথাটা এখন ভাঙ্গিয়া লাভই বা কি ? ভিজা কাপড় ছাড়িতে তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

মিনিট কয়েক পরে কাপড় ছাড়িয়া, চালের গাম্‌লাটি লইয়া বাহিরে আসিতেই সারদার চোখে পড়িল—মোহিত বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছে, তাহার মুখখানি যেন একটু শুষ্ক ও বিষন্ন বলিয়াই সারদার মনে হইল। ইন্দু ঘরের মধ্যে কুট্‌না কুটিতেছিল, ত্বরিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া, সারদা মোহিতের দিকে ফিরিলেন।

সদ্যস্নাতা সারদা পিসিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া মোহিত বলিল—আজ এরই মধ্যে স্নান সেরে এসেছেন, ভালই হ'ল—আজ আমি কল্‌কাতায় যা'ব কিনা—

মোহিতের দৃষ্টি চারিদিকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, এবার রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া দৃষ্টি স্থির হইল।

সত্যই তাহা হইলে মোহিত আজই কলিকাতায় চলিল! সারদা ভাবিলেন—তাই ত! আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—আজই কল্‌কাতায় যাবে—কেন? বিমলা কি—

—না, মা এখানেই থাক্‌বেন।

মোহিত চুপ করিল। সারদা বুঝিলেন, সে তাঁহার প্রশ্ন এড়াইল, কলিকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ভাঙ্গিল না। বলিলেন—তা, উঠে এস, বস্‌বে না একটু?

মোহিত উঠিয়া বসিল। সারদা মনে মনে কি স্থির করিয়া লইয়া ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন—কাপড় ছেড়েচিস্ ইন্দু? তা হ'লে তুই মা চালটা ধু'য়ে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ জলটা চাপিয়ে দিই।

মায়ের হাত হইতে চালের গাম্‌লা লইয়া ইন্দু কলতলার দিকে গেল। মোহিতও উঠিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা এই সুযোগে ইন্দুর সহিত দু' একটি কথা বলিয়া লইবে, বেশীক্ষণ ত আর সে আজ অপেক্ষা করিতে পারিবে না।

সারদা বলিলেন—যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ' কেন মনু, আবার ত কতদিনে পিসিমা ব'লে আস্‌বে? ইন্দু আসুক্ কত দিনের মত চলে' যা'বে তুমি, তা সে তা'র দাদাকে একটা প্রণাম কর্‌বে না?

মোহিত সেই ভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাম্‌লা লইয়া ইন্দু পাশ দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। অন্যদিন সারদার সমক্ষে মোহিতদা'র সহিত কথা বলিতে, হাসি তামাসা করিতে ইন্দু লজ্জা বোধ করিত না, মোহিতও কোন দিন এতটুকু দ্বিধা ভাব

দেখাইত না ; কিন্তু আজ এই বিদায়ের দিনে, বলিবার, শুনিবার তাহাদের অনেক কথাই ছিল, তবুও কোথা হইতে, কিসের একটা বাঁধ আসিয়া দুই জনেরই মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ছিল। সারদার সতর্ক ভাবও মোহিতের দৃষ্টি এড়াইতেছিল না, কিন্তু ইহার কোন সঙ্গত কারণই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ইন্দু চালের গাম্‌লা নামাইয়া রাখিতে সারদা বলিলেন—তোর মোহিত-দাদাকে একটা প্রণাম করে' আয় ইন্দু, আজ ত আবার আস্‌বার সময় হবে না ওর।

ইন্দু একবার বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া আবার তখনই মুখ নত করিল, তাহার পর আড়ষ্টভাবে মোহিতের পায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করিল। মাথাটা বুঝি সানের উপর একটু ঠুকিয়াই গেল। উঠিয়া কোনও দিকে না চাহিয়া, নতমুখে ইন্দু রান্নাঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। তখন তাহার বুকের মধ্যে বোধ হয় একটা নীরব রোদন উথলিয়া উঠিতেছিল। সারদা দেখিলেন, কন্যার রক্তহীন ঠোঁট্ দু'খানি ঈষৎ কাঁপিতেছে, চক্ষু দুইটি নির্মিলিতপ্রায়।

ইন্দুর পশ্চাৎ হইতে সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মোহিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর আবার একবার সারদা পিসিকে প্রণাম করিয়া মোহিত তাহার অবশপ্রায় পদদ্বয় টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। পথে নির্জ্জন স্থানে পৌছাইয়া কোঁচার খুঁটে মোহিত তাহার চোখ দুইটি একবার রগ্‌ড়াইয়া লইল।

সকালে বেড়াইতে গিয়া স্নেহের সেই ব্যাকুল অভিমান, তাহার পর এখানে বিদায় লইতে আসিয়া এই বিড়ম্বনা! মোহিত ভাবিতে ভাবিতে চলিল, কেন, কি কারণ?

(১৬)

হু হু শব্দে ট্রেণ চলিয়াছে, গাছপালা, বাড়ীঘর সবই পশ্চাতে ফেলিয়া রুদ্ধশ্বাসে, প্রচণ্ড বেগে সে ছুটিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, শুধু, দারুণ দুঃখের ভিতর ক্ষীণ আশার ন্যায়, মাঝে মাঝে দূরে এক একটি আলো দপ্ করিয়া দেখা দিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার অন্ধকারের গর্ভে সমাহিত হইতেছিল। পথের ধারে, দূরের বৃক্ষগুলি অন্ধকারে অস্পষ্টমূর্ত্তি লইয়া ট্রেণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, আবার ক্লান্ত হইয়া নূতনের পার্শ্বে হঠাৎ অদৃশ্য হইতেছে।

এক একটি ষ্টেসনে ট্রেণ থামিতেছে; এই বিশ্রাম স্থান ত্যাগ করিয়া আর যেন এই অন্ধকারে অনন্তের পথে ছুটিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছে না। তবুও কোন্ অলক্ষ্য শক্তি তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে,—ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ট্রেণ আবার ছুটিতেছে। সম্মুখে সীমাহীন ঘোর অন্ধকার, পশ্চাতে পরিত্যক্তের আকুল রোদন, আকাশে বুঝি মেঘ জমিয়াছে—ঝড় উঠিবে, জল ঝরিবে, অশণি গর্জ্জন করিবে; তবুও গাড়ী ছুটিয়াছে, তাহাকে যাইতেই হইবে!

মোহিতের চিন্তার বিরাম নাই, অন্ত নাই। এতদিনের স্নেহের নীড় ত্যাগ করিয়া ও পরিচিত সুখদুঃখ পশ্চাতে ফেলিয়া আজ সে কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিতের দিকে ছুটিয়াছে? তাহার কি ছিল, সে কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া আসিল, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার এখন আর তাহার সাহস নাই, অবসর নাই; শুধু পরিত্যক্তের একটা বিশৃঙ্খল বিলাপ আসিয়া তাহার হৃদয়ে অস্ফুটভাবে ধ্বনিত

হইতেছিল। সম্মুখে অপার অন্ধকার, গৃহহীন নিরাশ্রয়ে পরিচিত কেহ নাই, জানিবার কেহ নাই, কিছু নাই, আছে শুধু অন্ধকার! অন্ধকার!

গাড়ী অবিশ্রাম ছুটিয়াছে, রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমে সহযাত্রীরা, কেহ শুইয়া, কেহ ঠেস্ দিয়া, কেহ বা বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল বা ঝিমাইতে লাগিল। বিনিদ্র মোহিত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। পার্শ্বে মধ্যবয়সী একটি মাড়োয়ারী অনেকক্ষণ হইতেই ঢুলিতেছিলেন, আর এক এক বার সজাগ হইয়া মোহিতের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন। শুইবার জায়গা ছিল, কিন্তু কি জানি তবুও ভদ্রলোক কেন শুইতেছিলেন না। কতক্ষণ পরে তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলেন—শোওগে নেহি?

মোহিত অন্যমনস্ক ছিল, বলিল—জি?

পাশের খালি জায়গাটা দেখাইয়া মাড়োয়ারী বলিলেন—শোনেকে লিয়ে হিঞা ত জাগাহা হ্যায়্। তুম্ কাঁহা যাওগে? কান্‌পুরমে চড়ে থে না?

একটু হেলিয়া বসিয়া মোহিত বলিল—জী হাঁ, কান্‌পুরমে। মেরে ত কল্‌কেত্তে যানে হ্যায়্।

—ওঃ হো ম্যায় ভী কানপুরমে রহেতা হুঁ। উহা তুম্ কিস্ মহল্লেমে রহতে হো?

যাক্, মোহিত কানপুরে থাকে, ডাক্তার পিয়ারীর 'ভাতিজা' সে ইত্যাদি সংবাদে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ছগন লালজি শুইয়া পড়িয়া অচিরে নাসিকা ধ্বনি জুড়িয়া দিলেন। শেষ রাত্রের দিকে মোহিতও কতক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া লইল।

ইহার পর শুইয়া বসিয়া, ছগন লালজীর সহিত কথায় বার্ত্তায় ও বাহিরের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া মোহিতের সময় একরকমে কাটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিন বেলা পড়িতেই আকাশে মেঘ জমিল। বৰ্দ্ধমান ষ্টেসনে যখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল তখন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়া সুরু হইয়াছে। লাইনের দুই ধারে খানায় খন্দে বর্ষার জল জমিয়া আছে; চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাপাইয়া ভেকের আনন্দ ধ্বনি উঠিতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায় হরিৎ ধান্য-ক্ষেত্র, তাহার পর শ্যামায়মান বর্ষা-গগন,—সন্ধ্যার অন্ধকারও অতি দ্রুত নামিতে-ছিল। বর্ষার দিনে কৃষকেরা অনেক পূর্ব্বেই দূর গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে।

গাড়ী যতই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মোহিতের বুক ততই দুর দুর করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ট্রেণ হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া স্থির হইল। যাত্রীরা কোলাহল করিয়া নামিতে লাগিল। মোহিতও ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটি হাতে করিয়া ছগন লালজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী হইতে নামিল। সুবিধামত তাঁহার সহিত 'মুলাকাৎ' করিবার জন্য মোহিতকে আর একবার অনুরোধ করিয়া ছগন লালজী অগ্রসর হইলেন।

তাইত! এত বড় সহর, এই রাত্রিকাল, বৃষ্টি বাদল, জানা নাই শুনা নাই—মোহিত এখন কোথায় যাইবে, কি করিবে?—বৃষ্টি থামিবে বলিয়া মোহিত কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবেই প্লাটফরমে দাঁড়া-

ইয়া রহিল। কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। তখন ঘুরিতে ঘুরিতে মোহিত মধ্যম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল, চেয়ারে, বেঞ্চে ২।৪টি লোক নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছে। মোহিত মনে মনে ঠিক করিল—সেও তাহা হইলে এইখানেই শুইয়া বসিয়া কোনও গতিকে রাত্রিটা কাটাইবে, তাহার পর সকালে বাহির হইয়া দেখিয়া শুনিয়া সুবিধামত একটা মেসে কিম্বা হোটেলে গিয়া উঠিবে।

(১৭)

পর দিন সকালে মোহিত খুঁজিয়া পাতিয়া চোরবাগানে একটি সস্তা হোটেলে গিয়া উঠে। সেখানে দিন আট দশ কাটাইবার পর সে দেখিল এরূপে আর বেশী দিন চলিবে না—কানপুর হইতে সে ত মাত্র তিরিশটি টাকা সম্বল লইয়া বাহির হইয়াছিল।

অবশ্য এ কয়দিনও মোহিত নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া ছিল না, সমস্ত দিন কোনও কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত। এক দিন ঐ হোটেলেরই একটি বাবু খবর দিলেন, কাছেই একটা ছেলে-পড়ান কাজ খালি আছে। সেই দিনই বৈকালে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া, সাহা মহাশয়ের প্রস্তাবিত সর্ত্তে সম্মত হইয়া মোহিত তিনটি ছাত্রকে পড়াইবার ভার লইল। থাকা, খাওয়া ও মাসিক চার টাকা মাহিনা—মোহিত ভাবিল তাহার পক্ষে উপস্থিত ইহাই যথেষ্ট।

পড়িবার ইচ্ছা মোহিতের বরাবরই ছিল, একটা আশ্রয় যোগাড় করিয়া লইয়াই মোহিত কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ঠিক সময়েই সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, কারণ এখানেও তখন সবে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, নূতন ছাত্রেরা কলেজে ভর্ত্তি হইতেছে। সন্ধানে সন্ধানে মোহিত বিদ্যাসাগর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের বাড়ীতে বাড়ীতে হাঁটাহাটি করিয়া, তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া, অনেক চেষ্টা যত্নে, উক্ত কলেজে কম মাহিয়ানায় অর্থাৎ পাঁচ টাকা স্থলে মাসিক তিন টাকা বেতন দিয়া, পড়িবার অনুমতি পাইল। ইতিমধ্যে এলাহবাদে সমরকে লিখিয়া তথাকার ইউনিভার্সিটির অনুমতি-পত্রও মোহিত সংগ্রহ করিয়াছিল। এবার নিজের কাছে একটী পয়সাও সম্বল না রাখিয়া সে কলেজে নাম লিখাইল। কানপুরে মাকে মোহিত পত্র লিখিল—সে ভালই আছে, কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, একটা কাজেরও যোগাড় হইয়াছে। উপস্থিত তাহার কোনও অভাব অসুবিধা নাই, কিছু দরকার হইলেই জেঠা মহাশয়কে জানাইবে, তিনি যেন দুঃখিত না হয়েন, ইত্যাদি। কিন্তু নিজের বর্ত্তমান ঠিকানা বা কলেজের নাম সে কিছুই জানাইল না। বিমলার প্রথম পত্র ও সমরের প্রেরিত অনুমতি পত্র হোটেলের ঠিকানাতেই আসিয়াছিল।

নিত্য সকালে উঠিয়া ছাত্রদিগকে দুই তিন ঘণ্টা পড়ান'—সে এক ভীষণ ব্যাপার! বড় দুইটির একটি ত একেবারেই গঙ্গারাম এক শ' বার বলিয়া দিলেও কোন কথাই তাহার মাথায় ঢুকে না, অতি কষ্টে যদি বা ঢুকিল, মনে আর তাহা এক মিনিটও দাঁড়াইতে চাহে না। দ্বিতীয় ছাত্রটি আবার সেই অনুপাতে অবাধ্য ও দুর্দ্দান্ত। কি করিয়া এই "ছোক্‌রা" মাষ্টার ম'শায়কে বিব্রত ও অপদস্থ করিবে এই তাহার একমাত্র চেষ্টা। তৃতীয়টি প্রথমভাগ

পড়ে, সেজ' কর্ত্তার একমাত্র বংশধর, আদুরে দুলাল সে। তাহার পর কর্ত্তাদের ব্যবহার, আহার, নিদ্রার ব্যবস্থা—যাক্ সে কথা। মোহিতের নিজের পড়িবার বিশেষ সময় হয় না, নিজের পুস্তকাদিও নাই, কলেজ লাইব্রেরীর ও সহপাঠিদের পুস্তক ধার করিয়া আনিয়া তাহাকে পড়িতে হয়।

যেমন করিয়াই হউক এক মাস কাটিয়া গেল। মধ্যে ছগনলাল বাবুর সহিত দেখা করিতে মোহিতকে তিনি এক মৎলব বাৎলাইয়া দিলেন—ইহারই মধ্যে সময় করিয়া লইয়া মোহিত কেন 'সেয়ার' বাজারে বা 'হেসিয়ন' বাজারে বাহির হয় না? বিনা মূলধনে অর্থ উপার্জ্জনের এই ত একটি সহজ উপায়। ইহার পর হইতে মোহিত নিত্য একবার করিয়া বাজারে বাহির হইতেছে। কোন দিন দশটা হইতে আরম্ভ হইয়া দুইটার সময়ে তাহার ক্লাস্ শেষ হয়, কোনও দিন বা দেড়টার পর হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ক্লাস বসে; সুতরাং কলেজের পরে বা পূর্ব্বে যে দিন যেমন সুবিধা মোহিত বাজারে বাহির হয়। অনেক ঘোরাঘুরিতেও এপর্য্যন্ত হাতে কোনও কাজ না পাইলেও, মোহিত ধৈর্য্যের সহিত একটু একটু করিয়া দালালী শিখিতেছিল।

দেড় মাসের মধ্যেই মোহিতের সুখপুষ্ট দেহে এতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিল যে পূর্ব্ব-পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলে, চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইত। মোহিতের মনের গতিও ইহার মধ্যে কোন্ দিকে ফিরিয়া কি ভাবে বহিতেছিল সে খবর সে নিজেও বুঝি ভাল করিয়া জানিতে পারিতেছিল না। কানপুর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, আত্মজনের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় মোহিতের প্রাণ-

ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, মাকে ছাড়িয়া, এত দূরে অপরিচিত বিদেশে সে কি করিয়া থাকিবে ভাবিয়া, মোহিত মনে মনে কাতর হইয়াছিল; ইন্দুকে এত দিন না দেখিয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে মনে হইতে তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আর আজ সেই মোহিত উন্নতির নেশায় এতই মাতিয়াছে যে, সে সব কথা ভাবিয়া দেখিবারও এখন তাহার অবসর ঘটিয়া উঠে না। একটু নিরবিলি হইলে যদিবা আপনা হইতেই কোনও কথা তাহার মনে উঠে, অমনই সে কাজের চাপে তাহাকে ঢাকা দিয়া দেয়। তাই বলিয়া ইন্দুর জন্য, মায়ের জন্য, কি তাহার একটুও প্রাণ কেমন করিত না? করিত বই কি, কিন্তু চক্ষের সন্মুখে সে সতত ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল মধুর ছবি কল্পনায় খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তাই বর্ত্তমানের দুঃখ কষ্টে সে কাতর হইতেছিল না।

(১৮)

যত কষ্টে, অসুবিধায়ই হউক, মোহিতের দিন কাটিতেছিল।

পূজার ছুটী হইবার এখনও দশ বার দিন বাকী। মোহিত আশা করিতেছিল, ছুটী হইলে এবার বাজারের কাজ কর্ম্মের সে কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ইহারই মধ্যে সাহা মহাশয়ের একদিনকার কথায় তাহার সে আশা ত নিভিয়া গেলই, উপরন্তু মনের মাঝে আরও অনেকখানি অন্ধকার স্তূপ বাঁধিয়া বসিল। পূজার বন্ধে মধুপুরে যাওয়ার উপলক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা, মোহিতের কাজে জবাব দিয়া বলিলেন—ছেলেদেরও

পড়া শুনা ভাল হচ্ছে না, তুমিত ওদের মোটে ম্যানেজ্ ই কর্ত্তে পার না। সে যাক্, যাবার আমাদের এখনও পাঁচ সাত দিন দেরী আছে, এর মধ্যেই তুমি অন্য কোথাও একটা কাজের যোগাড় করে' নিতে পারবে নিশ্চয়। শনিবারে তোমার পাওনাটা চুকিয়ে নিয়ো তা হ'লে।

শনিবার রাত্রে মোহিতের পাওনা ৪৮৶৹ আনা মিটাইয়া দিয়া কর্ত্তা বলিলেন—কাল ত রবিবার আছে, নিজের জায়গায় উঠে যাবার সুবিধা হবে তোমার।

কিন্তু এই নিজের জায়গাটি যে কোন্ চুলায় জুটিতে পারে, মোহিত ত তাহা গত পাঁচ দিনের মধ্যেও খুঁজিয়া পায় নাই।

পরদিন মোহিত বেলা পাঁচটার সময় তাহার পূর্ব্ব পরিচিত সেই হোটেলে গিয়া উঠিল। সোমবারে দু' মাসের কলেজের মাহিনা দিয়া আসিয়া মোহিত দেখিল তাহার নিকট মাত্র এক টাকা দশ আনা আছে। ইহাতে কয় দিনই বা হোটেলে থাকা চলিবে? সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়াও মোহিত কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না। সকাল হইতেই একজন আলাপী বাবুর জিম্মায় তাহার জিনিস পত্র রাখিয়া দিয়া ও গত দুই দিনের হোটেলের পাওনা টাকা ম্যানেজার বাবুকে দিয়া, মোহিত পথে বাহির হইল।

আজ এত দিন পরে হঠাৎ পিয়ারী জেঠার নিকট সাহায্য চাহিতে মোহিতের কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেকিতেছিল।

সমস্ত দিন সম্ভব অসম্ভব অনেক স্থানেই সে ঘুরিয়া বেড়াইল-কিন্তু কোথাও কাজের সন্ধান মিলিল না, বা আশ্রয় জুটিল না।

ভাগ্য-নিরূপিতা

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মোহিতের ভাবনা হইল—দিন ত অনাহারেই কাটিল এখন রাত্রে কোথায় আশ্রয় মিলিবে?

মোহিত সারকুলার রোড্ ধরিয়া আসিতেছিল। শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকট আসিতেই মোহিতের মনে হইল—কলিকাতায় তাহার প্রথম রাত্রি ষ্টেসনেই যাপিত হইয়াছিল, আজও কেন সে রেল্ওয়ে কোম্পানীর এই মুসাফিরখানা ওয়েটিং রুমে রাত্রি কাটাইবে না?

পয়সা কয়েকের চিঁড়া মুড়্কি কিনিয়া লইয়া মোহিত ষ্টেসনে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার অবসন্ন দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

সকালে বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে মোহিত মনে মনে স্থির করিয়া লইল—আজ সমস্ত দিনের চেষ্টাতেও যদি কোথাও আশ্রয় না মিলে তাহা হইলে রাত্রে সে কান্পুরে মায়ের নিকট গোটা কয়েক টাকা চাহিয়া পাঠাইবে। গত আড়াই মাস তিন মাস মোহিত মধ্যে মধ্যে বিমলাকে পত্র দিয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে কানপুরের কোনও খবর লয় নাই—নিজের ঠিকানা সে সেখানে কাহাকেও জানায় নাই। কেন?—তাহার উদ্দেশ্য সে-ই জানিত!

সেদিনও কোনই কাজের যোগাড় হইল না। দুপুরে একটা হোটেলে ঢুকিয়া মোহিত তিন আনা খরচে কোনও প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কলেজ স্কোয়ারের নিকট একটি পোষ্টের গায় মোহিত দেখিল কে এইমাত্র একখানা নূতন প্ল্যাকার্ড্ মারিয়া গিয়াছে—গৃহ-শিক্ষক আবশ্যক।—নং নেপাল ভট্টাচার্য্যের লেন, ভবানীপুর।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, এখন যাইলে কোন ফল নাই, কাল সকালেই যাওয়া যাইবে, স্থির করিয়া মোহিত আজও শিয়ালদহ ষ্টেসনে রাত্রি কাটাইতে চলিল। কাল কি হয় দেখা যাউক মনে করিয়া আজও মোহিত কানপুরে সংবাদ দিল না।

রাত্রে ষ্টেসনে বসিয়া বসিয়া মোহিত অনুভব করিতে লাগিল, তাহার গা-হাত-পা দারুণ বেদনা করিতেছে, গাও বুঝি একটু গরম ঠেকিতেছে।

তবুও সকাল হইতেই মোহিত হাঁটিয়াই ভবানীপুরের অভিমুখে চলিল। সে গড়ের মাঠের মাঝামাঝি আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি আসিয়া মোহিতকে একেবারে স্নান করাইয়া দিয়া গেল। যাহা হউক ভিজা কাপড় জামায় হাঁটিতে হাঁটিতে মোহিত সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুরে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইল।

তিন মিনিট পরে পথে বাহির হইয়া আসিয়া মোহিতকে বড় দুঃখের সহিতই মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, সকাল বেলা এতখানি পথ হাঁটা ও অসুস্থ শরীরে এমন করিয়া ভিজাটা একেবারে নিস্ফল গেল। কারণ এখানে একটি 'ভারিক্কি' গোছের লোক আবশ্যক, মোহিতের মত 'ছেলে ছোক্‌রা' লইয়া ইঁহাদের কাজ চলিবে না।

কতকটা পথ আসিয়াই মোহিতের কেমন শীত শীত বোধ হইতে লাগিল, মাথাটাও ক্রমে ভার হইয়া আসিতেছিল, মোহিত মনে করিল ভিজা কাপড় জামায় অনেকক্ষণ থাকায় জন্যই শীত করিতেছে। এবার জামাটি খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া ও রাস্তার যে

দিক্‌টায় রৌদ্র মোহিত সেই দিক দিয়াই পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু তবুও শীত না কমিয়া বরং বাড়িতে লাগিল, দেহটাও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। মোহিতের আশঙ্কা হইল, তবে কি সত্যই জ্বর আসিতেছে নাকি? তাহা হইলে এখন কি উপায় হইবে?

আর ইতস্ততঃ না করিয়া মোহিত একখানি ট্রামে উঠিয়া বসিল. শেষ সম্বল সতেরটি পয়সা হইতে ছয়টি পয়সা দিয়া সে বৌ'বাজারের মোড় পর্য্যন্ত একখানি ট্রান্‌স্‌ফার টিকিট লইল। কয়েক মিনিট পরেই ট্রাম ধর্ম্মতলায় পৌছাইল। নামিতে গিয়া মোহিত দেখিল, ইতিমধ্যেই তাহার হাত পা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, মাথাও বিষম ঘুরিতেছে; জিভ শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছে, একটু দূরে গিয়া কল হইতে জল পান করিবে সে সামর্থও যেন তাহার আর নাই।

বৌ'বাজারের মোড়ে কন্‌ডাক্টর্ মোহিতকে ট্রাম হইতে নামাইয়া দিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে ফুটপাথ পর্য্যন্ত গিয়াই মোহিত একটা পোষ্ট ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বৃষ্টির পরের প্রখর রৌদ্র, তবুও মোহিতের গায় কাঁটা দিতেছে। একবার বমি হইয়া কতকটা জল ও পিত্ত উঠিল।

মোহিত ভাবিতে লাগিল, নিরাশ্রয় নিঃসম্বল সে, তাহার উপর এই বিপদ! এখন কোথায় যাওয়া যায়? এ অবস্থায় কে আশ্রয় দিবে, কে দেখিবে? এক চোরবাগানের মেস্, তা' সেখানে তাহারা বিনা স্বার্থে এ অবস্থায় তাহাকে থাকিতে দিবে কেন? আর এ জ্বর যে এক দিনে এখনই ছাড়িয়া যাইবে তাহার স্থিরতা কি? মোহিত বুঝিল নিরাশ্রয় হইয়া প্রথমেই তাহার

উচিত ছিল কানপুরে লিখিয়া কিছু টাকা আনাইয়া লওয়া ; তাহা হইলে এরূপ অবস্থাতেও আজ কতকটা ভরসা ছিল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মোহিত আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পথ চল্‌তি লোকেরা তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিল।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা মোহিতের মনে পড়িল—হাঁ, হয়েছে। দেবেন দাদা বাবু,—পটলডেঙ্গায় না ? ঠিক্‌নাও লেখা ছিল না—

কম্পিত হস্তে নোট্‌বইখানি বাহির করিয়া পাতা উলটাইতে ঠিকানা পাওয়া গেল। তিন মাস পূর্ব্বে দেবেন কানপুরে মোহিতকে এই ঠিকানা বলিয়া আসিয়াছিল।

একখানি খালি রিক্‌স যাইতে দেখিয়া মোহিত রিক্‌সওয়ালাকে ডাকিয়া, বাকী এগারটি পয়সাই তাহার হাতে দিয়া বলিল,——নং প্রেমচাঁদ বড়াল লেন্। তাহার পর রিক্‌সওয়ালার কাঁধে ভর দিয়া মোহিত গাড়ীতে উঠিয়া চোখ বুজিল।

মিনিট দশেক পরে গাড়ী দাঁড়াইতে মোহিত চোখ চাহিয়া দেখিল, লাল রঙের ছোট একখানি বাড়ী। রিক্‌সওয়ালা দ্বারের কড়া নাড়া দিল।

একটি বৃদ্ধ—বোধ হয় বাড়ীর ভৃত্য—দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল।

—দেবেন রায়ের বাড়ী এই ?

গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া মোহিত পড়িয়া গেল। রিক্‌স-ওয়ালা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া একেবারে বাড়ীর ভিতরে দালানে বসাইয়া দিল। যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, হঠাৎ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে সে কেমন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়াই ছিল।

রিক্সওয়ালা মোহিতকে তুলিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিতেই তাহার যেন হুঁস্ ফিরিয়া আসিল—আরে লোকটা মাতাল নাকি, একেবারে যে বাড়ীর মধ্যেই ঢুকে পড়্ল' ? প্রকাশ্যে সে বলিল—দেবেন বাবুর সঙ্গে এখন দেখা হবে না, বাড়ী নেই। এই এ রিক্সওয়ালা অভী ঠারে—

—দেবেন বাবু বাড়ী নেই ? তবে উপায় ! আমার যে বড্ড জ্বর এসেছে—দেবেন বাবু আমার ভগিনীপতি হন্—তা—

দাশু রায়-পরিবারের বহু পুরাতন চাকর, মোহিতকে ছেলেবেলায় একবার সে দেখিয়াছিলও বোধ হয়। এবার সে বিস্মিত ভাবে মোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ওঃ কান্পুর থেকে এসেছেন আপনি ? তা পথেই কি জ্বর এসেছে ?

মোহিত শেষ চেষ্টায় সোজা হইয়া বসিয়াছিল, এবার দাশুর স্বরে একটু ভরসা পাইয়া আবার দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বলিল—হুঁ, বড্ড জ্বর এসেছে—উঃ ! মোহিত আবার চোখ বুঁজিল।

দাশু তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে একখানি মাদুর বিছাইয়া মোহিতকে ধরিয়া তুলিয়া তাহার উপর শোয়াইয়া দিল।

স্নানান্তে ভিজা কাপড় লইয়া সোনালী ছাদে গিয়াছিল। ইতিমধ্যে রিক্সওয়ালার ডাকাডাকি ও মোহিতের আগমন ; কাপড় মেলিতে ব্যস্ত সোনালী উপর হইতে কিছুই জানিতে পারে নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সে দেখিল, নীচের দালানে দাশু কাহাকে কোলে করিয়া শোয়াইয়া দিতেছে।—কে ও, দেবেন নাকি !

সোনালী ভাল করিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু সে অন্য দিকে ফিরিয়া ছিল, সোনালী তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। বারাণ্ডায় নামিয়া আসিয়া সে দাশুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। জল আনিতে দাশু রান্না ঘরের দিকে যাইতেছিল, সোনালী উপর হইতে একবার অনুচ্চ স্বরে তাহাকে ডাকিল, কিন্তু সে ডাক তখন দাশুর কানে গেল না। সোনালী নীচে নামিয়া গেল।

লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও সোনালী মনে মনে স্থিরই বুঝিয়াছিল—দেবেন ছাড়া এ আর কেহই না। মাতাল হ'য়ে এসেছে আবার কি !

মোহিতকে জল পান করাইয়া বাহিরে আসিয়া দাশু দেখিল রান্না ঘরের দরজায় ঠেস্ দিয়া সোনালী অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রথম যে দিন দেবেন অন্য কথায় দাশুকে ভুলাইয়া দেশের বাড়ী হইতে আনিয়া, এখানে তাহার রক্ষিতা, সোনালীর পাহারায় নিযুক্ত করে, তখন দাশু খুবই চটিয়া উঠিয়াছিল, বহু দিনের পুরাতন চাকরীর মায়াও ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কি জানি কি কারণে সে সোনালীর প্রতি তাহার পূর্ব্ব ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে নিজেকেই অনেকখানি ধরা দিয়া ফেলিয়াছিল।

অপ্রতিভ ভাবে কাছে আসিয়া দাশু বলিল—এই যে দিদিমণি, এখানে !—তাহার পর বিনা আড়ম্বরে ঘটনাটি বলিয়া সে বলিল, — ছেলে মানুষ বড়ই বিপদে পড়েছে, আপনার লোক ওর বোধ হয় এখানে কেউ নেই, দেবুভাই এখানে আছে মনে করে' এসেছে

এখন ও'কে বিদায় ক'রে দেওয়া যায়ই না কি ক'রে, দেবুভাই শুন্‌লে হয়ত রাগ কর্‌বে।

সোনালী, তাহার কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই দাশু আবার বলিল—চট্‌ করে দু'টো টাকা বার ক'রে আন' দেখি দিদি, ছুটে একবার ডাক্তার বাড়ী যাই, ফির্‌বার মুখে অম্‌নি কিছু ফল পাকড় কি'নে নিয়ে আস্‌ব'।

দাশুর ব্যবহারে সোনালী একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল —দেবেনের স্ত্রীর ভাই সোনালীর বাড়ীতে? সে পীড়িত, তাহার চিকিৎসা করাইতে হইবে, এ সব কি? প্রতিবাদ করিবারও বুঝি তাহার অধিকার নাই।

সোনালী টাকা আনিয়া দাশুর হাতে দিল, কোনও কথা বলিল না। টাকা লইয়া দাশু বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, সোনালীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রাগ কল্লে দিদিমণি?

সোনালী প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দাশুর দিকে চাহিল, এবারও কোন কথা বলিল না। তখন তাহার মনে কি ভাব হইতেছিল সে নিজেই বুঝিতেছিল না, প্রথমেই মনে হইল—দেবেনের শালা, সে কেন তাহার ভার ঘাড়ে লইয়া হাঙ্গাম্‌ পোহাইতে যাইবে, সে না হয় দেবেনের মাহিয়ানা খায়, তাই বলিয়া ত,— দেবেন রাগ করিবে? ইস্‌, সে ত আর দেবেনের ঘরের মাগ্‌ না বা তাহার কেনা দাসীও নয়।—পরের সুখ দুঃখের দিকে লক্ষ্য মাত্র না রাখিয়া অর্থশোষণ করাই যাহাদের পেশা, তাহাদেরই একজন সে, হঠাৎ আজ এমন করিয়া একটা কোথার কে তাহাকে আশ্রয় দিয়া

অনর্থক অর্থব্যয় ও হাঙ্গামা বহন করিতে সোনালীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিষেধ করিতেছিল। দাশুর এই কর্ত্তামীতে তাহার খুবই রাগ হইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল দাশুকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, লোকটাকে ঘাড়ে ধরিয়া রাস্তার বাহির করিয়া দেয়।

সোনালীকে এখনও নীরব দেখিয়া দাশু মুসড়াইয়া গেল, ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলিল—তবে থাক্ দিদিমণি, ডাক্তার ডেকে কাজ নেই, একখানা পাল্কী ডেকে এনে আপদটাকে হাঁসপাতালে রেখে আসি, মরে মরুক্‌গে সেখানে, মা বাপ কেউ ত আর দেখ্‌তে আস্‌বে না, আমাদেরই বা অত মথাব্যথা কিসের ?— মরে মরুক্‌গে! সত্যই কি লোকটা হাঁসপাতালে গেলে মারা পড়িবে? দাশুর ব্যথিত অভিমানের সুরটা সোনালীকে যেন কেমন অভিভূত করিল, তাইত!—এবার সোনালী কথা কহিল—ঘরের মধ্যে তুলে' এনে, এখনিই আবার হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না, দেখ' ডাক্তার কি বলে, তার পর তোমার বাবুকে খুঁজে এনে যা হয় কর্‌তে ব'লো।

সোনালী রাগ করিয়া একথা বলিল কি না বুঝিতে না পারিয়া দাশু তাহার মুখের দিকে চাহিল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সত্যি দিদিমণি, অত বড়লোকের বেটা, শেষ্‌টা হাঁসপাতালে পড়ে' মর্‌বে? তা বেচারা তোমারও ত ভাই হয় দিদিমণি!

সোনালী আর কোনও কথা বলিল না, দাশু ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে বলিয়া গেল—বেশী ডাকাডাকি করে যদি, একবার উঁকি দিয়ে দেখো দিদি।

সোনালী দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া আবার ঠিক্ তেমনই ভাবে রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিল। ভিজা চুল

তখনও মোছা হয় নাই, উনানে আঁচ দিতে হইবে, গামছায় বাঁধা বাজার এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কেমন কৌতূহল হইল—সত্যই কি লোকটার বড়ই অসুখ?—নিঃসাড়ে গিয়া সে দরজার ফাঁকে চোখ রাখিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, ময়লা কাপড় পরা, দাগুর একখানা আধ ময়লা থান গায়ে, লোকটা দরজার দিকে ফিরিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া আছে, ঘুমাইতেছে বোধ হয়; চুল উস্কখুস্ক, গৌরবর্ণ মুখখানি জ্বরের তাপেই বোধ হয় একটু আরক্ত, এখনও দাড়ি বা গোঁপ ভাল করিয়া উঠে নাই। সোনালী আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লোকটি কাতর স্বরে বলিল—উঃ! বড় তেষ্টা।

জল লইয়া সোনালী ঘরে ঢুকিল, জ্বরের ঘোরে লোকটি তখন আবার ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বার খোলার শব্দে ফিরিয়া চাহিতেই জলের ঘটির উপরেই লোকটির দৃষ্টি পড়িল, পাত্রধারিনীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে হাত বাড়াইয়া জলের ঘটীটি সজোরে টানিয়া লইয়া, এক চুমুকেই অর্দ্ধেকখানি জল শেষ করিল। ঘটী ফিরাইয়া দিতে হাত বাড়াইয়া, এবার সোনালীর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, দৃষ্টিতে যেন এক ঝলক কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। কিন্তু এ রমনী কে, কোথা হইতে আসিল, এ সকল স্বাভাবিক প্রশ্ন তখন তাহার মনে উঠিল কি বুঝা গেল না। একবার আঃ, বলিয়া সে আবার চোখ বুঁজিল। লোকটির এক মুহূর্ত্তের সেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিটুকু এক টানেই সোনালীর মনের এতক্ষণের বিরাগ অসন্তোষ দূর করিয়া দিল। কি যেন একটা অনাস্বাদিত আনন্দে সোনালীর নিস্ফল প্রাণ চঞ্চল হইয়া

উঠিল। শূণ্য পাত্র হস্তে কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটির আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, বোধ হয় জল পান করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সোনালী সতর্ক পদে বাহির হইয়া আসিল। ঘটী রাখিয়া তাড়াতাড়ি একখানি ছোট টুক্‌রিতে তরকারী পাঁতি উঠাইয়া রাখিল, কাপড়ের আঁচলেই চুল মুছিল, ক্ষিপ্র হস্তে উনানে অনেকগুলি ঘুঁটে দিয়া আধ বোতল কেরাসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া বাহিরে আসিল।

ভাল করিয়া হাত ধুইয়া বড় একটি ঘটীতে করিয়া এক ঘটী খাবার জল ও ছোট একটি গ্লাস্ লইয়া সোনালী নিঃশব্দে আবার দাশুর ঘরে ঢুকিল। ঘটীটি নামাইয়া রাখিয়া গ্লাসটি তাহার মুখে ঢাকা দিল, লোকটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া, সোনালী আগুন ধরিবার অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল।

(১৫)

ডাক্তার আসিয়া মোহিতকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—Influenza জ্বর, বুকের দু'ধারেই বেশ সর্দ্দি আছে, আজ কাল প্রায় প্রত্যেক Influenza caseএ Pneumonia দেখা যাচ্ছে। তা ওবেলা আর একবার না দেখ্‌লে এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না। রোগীকে মেঝের ওপর থেকে তুলে একটা খাটের ওপর শোয়ালেই ভাল হয়, তবে বেশী নাড়াচাড়া কর্‌বে না, এ অসুখে Complete rest আর ভাল সেবাই এখন একমাত্র ওষুধ।—ডাক্তার দর্শনী লইয়া, বৈকাল ৫টার সময় আবার দর্শন দিবার আশা দিয়া বিদায়

হইলেন। দাশু ভয়ে ভয়ে সোনালীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল —দেবুভায়ের দেখা এখন কোথায় মিল্‌বে? ডাক্তার যা বল্লে, শুন্‌লে ত। যদি বাড়াবাড়িই হয়, তা এই বেলা হাঁসপাতালে দিয়ে' এলে হ'ত না?

সোনালী একটা বেদানা ভাঙ্গিয়া দানাগুলি ছাড়াইতেছিল, আর মনে মনে বুঝি কি ভাবিতেছিল; অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—কানপুরের ঠিক্‌না তুমি জান?

মোহিত তখন বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দাশু বলিল,—জানি না বটে, ওঁকে জিজ্ঞেস্ কল্লেই ত জানা যাবে।

সোনালী সে কথায় আর কিছু না বলিয়া আবার হাতের কাজে মন দিল। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলিল—ওপর থেকে একখানা তোষক ও লেপ এনে বিছানাটা ঠিক ক'রে দাও।—দাশু বুঝিল এবার দিদিমণি নিজের হাতেই সব ভার লইয়াছে, তাহার আর দায়িত্ব নাই। নিশ্চিন্তমনে সে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

বৈকালে আবার ডাক্তার আসিলেন, ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন—যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি, দু'টো সাইডেই সর্দ্দি বসেছে। খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে, বুকে পিঠে Bandage করা দরকার। এখনও এই damp এ শুইয়ে রাখা হয়েছে দেখছি, এ রকম ত চল্‌বে না।

ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন। এ বেলা মোহিত কেমন বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল, ডাক্তারের কথা

তাহার কানে গিয়াছিল কি না বুঝা গেল না। তাহাকে একবার চোখ চাহিতে দেখিয়া দাশু যখন জিজ্ঞাসা করিল—কানপুরের ঠিক্‌না ত আমার জানা নেই, সেটা একবার দিদিমণিকে বলে' দিন্ সে সেখানে খবর দেওয়া যাক্,—তখন সে সভয়ে বলিল—না না এখনই খবর দিয়ে কাজ নেই।—দেবেন বাবু কৈ ?

দাশু আবার সোনালীর দিকে চাহিয়া, দেবেনের কথাই বুঝি মোহিতকে কি বলিতে যাইতেছিল, সোনালী ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—ওষুধটা চট্ করে নিয়ে এস।

সন্ধ্যার পরে মোহিতের গায়ের উত্তাপ আরও বাড়িল, তাহার কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না, যন্ত্রণায় সে এক একবার উঃ আঃ, করিতেছিল মাত্র। ইতিমধ্যে সোনালী উপরে নিজের ঘরের পাশের ঘরটি, যেটিতে দেবেন আসিলে বাস করিত, ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়াছিল, এবার দাশুকে দিয়া মোহিতকে সেই ঘরে আনাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিল। মোহিতের জামার পকেটে দাশু একখানা বইয়ের মত খাতা দেখিয়া সোনালীর নিকট আনিয়া বলিল—দেখ' দেখি দিদিমণি, এটাতে ঠিকানা লেখা আছে কি ? সেখানি হাতে লইয়া সোনালী প্রথমেই দেখিল বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে উপরেই লেখা আছে—মোহিত মোহন ঘোষ, কান্‌পুর, মল্ রোড। আরও দু'এক পাতা উল্টাইয়া সে দেখিল সেখানা একখানা নোট্ বুক্। সোনালী কিছু কিছু ইংরাজী পড়িতে জানিলেও ভিতরের আর কোথাও না পড়িয়া দেখিয়াই খাতাখানা দাশুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—এখন থাক্।

পর দিন দুপুরের পর অসুখ আরও বাড়াবাড়ি হইল, সারা

ক্ষণ মোহিত আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া রহিল। দু' একবার সে চোখ চাহিতেছিল বটে কিন্তু তাহার তখন কোনও জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সোনালী এখন হইতে দাশুর সহিত পালা করিয়া তাহার নিকট বসিতে লাগিল, নিজ হাতে ঔষধ পথ্য মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল।

সোনালীর জীবনে একদিনেই যেন মস্ত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এমন করিয়া পরের জন্য নিস্বার্থ ভাবে কষ্ট স্বীকার করা তাহার জীবনে এই প্রথম। নরকের মধ্যে তাহার পাপ জীবনের প্রভাত হয়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষা ও দীক্ষা সেই নরকের অনুযায়ীই হইয়া আসিতেছিল। তাহার মা একজন উচ্চ দরের রূপসী ছিল, পশারও ছিল তাহার খুবই। কন্যাকে কাছে রাখিবার বা আদর করিবার তাহার ফুরসৎ হইত না। সোনালী, মাসি নামধেয় একটি বুড়ীর পিঠে ভর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। নানারূপ বেশভূষা ও সৌখীনতায় তাহার দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল। সোনালীর বয়স যখন দশ এগার বৎসর, তাহার গর্ভধারিণী একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, পর দিন হইতে সোনালীকে সকালে ও দুপরে পড়া শুনা করিতে হইবে, মাষ্টার ঠিক করা হইয়াছে। পর দিন মলিন বেশ, রোগা ছিপছিপে একটা যুবক যখন তাহাকে পড়াইতে আসিল, সোনালীর মনে আছে, তাহার বাঙ্গাল্ কথার টানে সে কতই হাসিয়াছিল। পড়া শুনা করিতে সোনালীর বেশ ভালই লাগিল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাহাকে শুধু বই পড়াইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছিল না, ছাই গাদায়

ফোটা এই ফুলটীর বুকে সে সতত নীতি-জল সেচন করিতে লাগিল,—সোনালীর অবস্থা কতটা হেয়, ও কতটা দয়ার পাত্রী সে এই সব কথাই সে পাকে প্রকারে সোনালীর মনে আঁকিয়া দিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

বৎসর খানেক পরে কন্যা একদিন মায়ের একটা প্রস্তাবে গর্জিয়া উঠিয়া যে সব কথা বলিল, তাহাতে তাহার মা পরদিনই সোনালীর লেখা পড়া শেষ করিয়া দিলেন। মাষ্টার বিদায় হইল বটে, কিন্তু সে সোনালীর সহজ চিন্তাশীল মনে যে বীজ পুঁতিয়া গেল, তাহা শীঘ্র নষ্ট হইল না।

আরও বৎসর খানেক পরে, মায়ের তাড়নায় বাধ্য হইয়া অবশেষে সোনালীকে বারাণ্ডায় দাঁড়াইতে হইল—উঃ সে কী ভয়! কী বিড়ম্বনা! কত যন্ত্রণা! ইহার কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন অতিরিক্ত নেশা করিয়া তাহার মা মারা গেল। সোনালী আবার দিন কতক চেষ্টা করিল ব্যবসা ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু ব্যবসা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না—তাহার অসামান্য রূপ, বয়সও তখন সবে সতের!

দেবেন রায়ও এই সময় অনেক দিন হইতে তাহার পাছে লাগিয়াছিল। একদিন বিরক্ত হইয়া সোনালী দেবেনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। তাহার মাসী ও ব্যবসা সঙ্গিনীরা তাহাকে এই বোকামী হইতে নিরস্ত করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়া এখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সোনালীও অনেকটা নিরুপদ্রব হইয়াছে। একটা আশ্রয় না হইলে চির-দিনই নানা অনিশ্চিত প্রলোভন, উত্তেজনা ও উৎপীড়ন সহ্য

করিতে হইবে, তাই সে বড় বড় প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আজ দেবেনের এই অনাদৃত আশ্রয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটাইতেছিল, তাহার জীবনের যেন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

হঠাৎ আজ বিপদের বোঝা মাথায় করিয়া মোহিত যখন অনাহূত তাহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল, তখনই সোনালীর অন্ধকার নিষ্কর্ম্মা জীবনে কোথা হইতে একটা আলোক কণা দেখা দিল। সোনালী দেখিল, ইচ্ছা করিলে সেও কিছু একটা করিতে পারে। জগতে তাহার মুখ চাহিতে কেহ নাই, সমাজ তাহাকে আশ্রয় ত দিবেই না, সে সমাজের পরিত্যক্তা, অস্পৃশ্যা; কিন্তু সেও ইচ্ছা করিলে এই দাম্ভিক সমাজের অনেক কাজই করিতে পারে, তাহার দ্বারা জগতের এক ফোঁটা উপকারও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহার কি লাভ তাহাতে?—কি লাভ?—আর কিছু লাভ না হউক, নিজের হাত হইতে ত সে পরিত্রাণ পাইতে পারে,—পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্ব্বে পাপে গড়া এ দেহটার ময়লা যাইবে না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এই পাপ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াও তাহার মন ত কতক পরিমাণে পুতিগন্ধটা ভুলিয়া থাকিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, এই অসহায় অপরিচিত বিপন্নকে আশ্রয় দিয়া যে তৃপ্তি সে আজ লাভ করিয়াছে, কই, এতদিন এত বিলাস, স্বেচ্ছাচারিতায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত সে তাহা অনুভব করে নাই।

সোনালী অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক যত্নে মোহিতের সেবা করিতে লাগিল। জ্বরের ঘোরে মোহিত কত কথা বলিত, কখনও সে, মা মাগো, বলিয়া করুণ কণ্ঠে কাতরাইত, আবার কখনও যেন কত অভিমানভরা স্বরে বলিত—কথা কইলে না,

কিছু বল্‌লে না ইন্দু!—আর ত দেখা হবে না।—কত সময় বোধ হইত সে যেন কাহার পড়া বলিয়া দিতেছে, রাগ করিতেছে, হাসিতেছে, আবার ধম্‌কাইতেছে। কত সব নাম, কত স্থানের কথা বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকিত। কখনও বা পার্শ্বোপ-বিষ্টা, সেবাপরায়ণা সোনালীর শীতল হাতখানি নিজের কপালের উপর টানিয়া লইয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিত। চোখ চাহিয়া সোনালীকে দেখিয়া অনেক সময় সে লক্ষ্যহীন :ক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

গোড়াতেই মোহিত অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, সোনালী কান-পুরে খবর দেয় নাই, কিন্তু অসুখ যখন হু হু করিয়া বাড়িয়াই চলিল তখন সে বড়ই ভাবনায় পড়িল। মোহিতের নোট-বইয়ে যাহা লেখা ছিল, সংবাদ দিবার পক্ষে তাহা ত যথেষ্ট নহে, দাশুর শুনা ছিল, দেবু ভাইয়ের শ্বশুর কানপুরে, খুব বড় ডাক্তার, কিন্তু তাঁহার নাম ত আর তাহার মনে ছিল না। কয়েক দিন দাশু সম্ভব অসম্ভব অনেক স্থানে দেবেনের খোঁজ করিল, কোথাও তাহার পাত্তাই পাইল না। সমস্ত ঝুঁকি আপনা হইতে সোনালীর উপর পড়াতে, সে নিজের শরীর পাত করিয়া সেবা করিয়া, হাতের পাতের সম্বল ভাঙ্গিয়া মোহিতের চিকিৎসা করাইতে লাগিল। এমন করিয়া পরের বিপদে নিজের বিপদ মানিয়া লইয়া, আশঙ্কা উদ্বেগের মধ্যে সোনালী যেন কি একটা অনাস্বাদিত আনন্দের গন্ধ পাইতেছিল, তাহার উপর এমন করিয়া কেহ ত কখনও নির্ভর করে নাই, নিজের জীবন মরণের দায়িত্ব তাহার হাতে তুলিয়া দিতে বিশ্বাস করে নাই!

সতের দিনের দিন ডাক্তার বলিয়া গেলেন—রোগীর অবস্থা এবার ভালর দিকেই ফিরিতেছে।—সোনালী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দৈবাগত এই বিপন্ন অতিথিটি আজ এতকাল পরে সোনালীর নারীত্বকে জাগাইয়া দিয়াছিল।

(২০)

সোনালীর দেহ বেচা অর্থ প্রায় নিঃশেষ করাইয়া ও তাহার শরীরের অনেকখানিই রক্ত জল করিয়া দিয়া, মোহিত এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। ডাক্তার বলিয়াছেন—এখনও খুব সাবধানতা আবশ্যক। মোহিত ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছিল, আর দিনের পর দিন এই নিস্পর, অচেনা নারীটির এমন নিস্বার্থ যত্নে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইতেছিল। তাহার নিজের ভগিনী ছিল না, থাকিলে কোনও স্নেহময়ী ভগিনী বুঝি ইহার অপেক্ষা অধিক করিতে পারিত না। সত্য বটে, যে দিন দাশু স-সঙ্কোচে তাহাকে সোনালীর প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিল, হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া মোহিতের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল, নিজের উপর তাহার অনেকখানি ঘৃণা ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই কৃতজ্ঞতা আসিয়া জোর করিয়া তাহার মনের সকল গোল মিটাইয়া দিয়াছিল। মোহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সোনালীর বেশভূষা ও আচরণে কই এতটুকুও ত খুঁৎ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তাহার কোনও কথাটিতে, কি কাজটিতে একটুও বিসদৃশতা প্রকাশ পাইতেছিল না!

অসুখের কয়দিন সোনালী যে জলের মত কত অর্থব্যয়

করিয়াছিল, সে কথা মোহিতের জানিতে বাকী ছিল না, কিন্তু এখনও কেন মিছামিছি আঙুর, বেদানায় এত পয়সা খরচ করা? ইহাদের ঋণ শোধ করা কোনও দিন ত তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, তবে অনর্থক ঋণ বাড়াইয়া কি লাভ? দাশুকে একদিন সেই কথাই সে বলিল, এবং বারণ করিয়া দিল আর যেন এসব বাজে খরচ করা না হয়। পরদিন সকালেই কিন্তু, সোনালী নিজ হাতে একখানি রেকাবী ভরিয়া, অন্যদিনের দ্বিগুণ ফল পাকড় ও বড় এক গ্লাস্ গরম দুধ আনিয়া যখন বলিল,—খেয়ে নিন্, ওষুধ খাবার সময় হ'ল,—তখন আর দ্বিরুক্তি করিতে মোহিতের সাহসে কুলাইল না।

কয়দিন হইতে মোহিত ভাবিতেছিল, আর ক'দিন এমন করিয়া চলিবে? আর ত এখানে থাকিয়া ইহাদের বিব্রত করা ভাল হয় না। তাহা ছাড়া তাহার বিবেকও বুঝি মাঝে মাঝে তাহাকে বিঁধিতেছিল। ঔষধ খাওয়ার পর আজ সারা সকালটি বসিয়া বসিয়া মোহিত সেই কথাই ভাবিতেছিল; কানপুরে ফিরিয়া যাওয়া অথবা পিয়ারী জেঠার নিকট অর্থ সাহার্য্য চাহিয়া পাঠান ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাহার মাথায় আসিতেছিল না। কিন্তু একদিন না সে বড় দম্ভ করিয়াই সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল—নিজের উপর নির্ভর করিয়া সে উন্নতি করিবে? আর আজ ভিখারীর মত কোন্ মুখে সে আবার সেখানে ফিরিয়া যাইবে, নিজের এই অক্ষমতার লজ্জা হইতেই বা কি বলিয়া পরিত্রাণ পাইবে?

কতক্ষণ হইল দাশু সোনালীর একখানি ধোপদস্ত স্বল্প চওড়া-

পাড় কাপড় রাখিয়া মোহিতকে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া গিয়াছিল, মোহিতের সে কথা মনেই ছিল না। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিতেছিল, নীচে রাস্তায় কত লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছে,—ইহাদের মধ্যে যদি তাহার পরিচিত কেহ থাকে—

—এখনও কাপড় ছাড়েন নি, বেলা ত অনেক হয়েছে?—সোনালী কখন ঘরে ঢুকিয়া মোহিতের চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, এবার কথা কহিতে মোহিত চম্‌কাইয়া উঠিল, তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। সোনালীর কথা বোধ হয় ভাল করিয়া তাহার কানে যায় নাই, উঠিবার বা কাপড় ছাড়িবার তাহার বিশেষ তাড়া দেখা গেল না।

মোহিত বলিল—আজ আমি কানপুর যা'ব। আপনার দয়ার ঋণ আমি কোন দিনই শুধ্‌তে পার্‌ব না। অনেক করেছেন আপনি, নিজের ব'নও এতটা করে না বোধ হয়।

প্রশ্নপূর্ণ বিস্ময়ে সোনালী, মোহিতের মুখের দিকে মিনিট খানেক নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—এখনও ত আপনি সারেন নি, সার্‌লে আর দু'দিন পরে যাবেনইত।—শেষের দিক্‌টা সোনালীর স্বর যেন কেমন গাঢ় হইয়া আসিল,—এখানে অনেক অসুবিধেই হচ্ছে আপনার, কিন্তু—

সোনালীর স্বরে যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল তাহা মোহিতেরও লক্ষ্য এড়াইল না, সে কুণ্ঠিত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল—না না, তা নয়, আপনাদের আর কতদিন কষ্ট দে'ব সেই মনে করেই আমি যেতে চাচ্ছি।

সোনালী মুখ তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—আমাকে কষ্ট

দিচ্ছেন সেই মনে করে'—হঠাৎ আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সংযত স্বরে বলিল—এখনও ত আপনি ভাল করে' চলতে পারেন না, ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করে' তিনি যে দিন যাওয়া নিরাপদ বলবেন সেই দিনই যাবেন। আরও ক'টা দিন না হয় চোখ কান বুঁজিয়ে কাটিয়েই দিলেন।—সোনালী হাসিবার একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটা আপনা হইতেই কেমন বিসদৃশ হইয়া গেল।

সোনালী আরও কিছু বলিবে ভয়ে, মোহিত কাপড়খানি লইয়া তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় পলাইয়া গেল। কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া মোহিত দেখিল, সোনালী শূণ্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখখানি যেন কেমন অপ্রসন্ন ও চিন্তিত। মোহিত ঘরে ঢুকিতে, সোনালী তাহার দিকে না চাহিয়াই ক্ষিপ্র হস্তে আহারের স্থান করিয়া দিয়া, নীচে খাবার আনিতে গেল।

আরও দু'দিন এই ভাবেই কাটিল। তৃতীয় দিন সকালে মোহিত মুখহাত ধুইয়া নিজের সেই ময়লা কাপড় ও জমাটি খুঁজিয়া পরিয়া, সোনালী কখন বাহিরে আসিবে সেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সোনালী বিস্কুটের টিন ও গোটা দুই আস্ত ফল হাতে করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল। মোহিতের ঘরের সম্মুখ দিয়া সে নীচে যাইতেছিল, মোহিত দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল—আমি চোরবাগানে, মেসে যাচ্ছি। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল—যে ক'দিন কানপুর যাওয়া ঘ'টে না ওঠে সেখানেই থাকবো ভাবছি। এখন ত বেশ সেরেছি।

মোহিতের কথায় ফিরিয়া চাহিতেই সোনালীর চোখে পড়িয়াছিল মোহিতের পরিচ্ছদ; সে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল, মোহিতের কথা তাহার কানে গিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না। চাহিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি কেমন আদ্র হইয়া আসিতেছিল। মোহিত আবার বলিল—সকাল সকালই যাওয়া যাক্।

আস্তে আস্তে হাতের জিনিসগুলি পাশের জানালার উপর নামাইয়া রাখিয়া সোনালী বলিল—কেন?

সোনালীর চাহনিতে ও স্বরে মোহিত কেমন অস্বস্তি বোধ করিল।

সোনালী বলিল—কে আছেন সেখানে?

ব্যাপারটি লঘু করিবার আশায় মোহিত হাসিয়া বলিল—মেসে আর কবে ক'র মা-ভাই থাকে? দিন কতক সেখানে ছিলুম্, জিনিস পত্র যা' কিছু সেখানেই রয়েছে।

তাহার হাসিতে সোনালী যোগ দিল না, মোহিত দেখিল তাহার মুখখানি আরও গম্ভীর ও অন্ধকার হইয়া উঠিল। মোহিত মহা মুস্কিলেই পড়িল। আবার সে বলিল—আপনার দয়া কখনও ভুল্‌ব না, সে দিন আপনার দয়া না হ'লে হয়ত আমাকে পথে পড়েই মর্‌তে হ'ত! আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনার কতখানি ক্ষতি, কতটা কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়েছে তা'ত বুঝ্‌ছি—এখন আর কেন?

কথা শেষ করিয়া মোহিত একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া, সোনালীকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছিল, সোনালী হঠাৎ সজীব হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বিদ্রূপের স্বরে বলিল—

এরই নাম বুঝি কৃতজ্ঞতা ? তা' আমার মত পাপী, অস্পৃশ্যাকে এর বাড়া আর কি কৃতজ্ঞতাই বা দেখাবেন ! কিন্তু আপনার ব্যাপারটা ত আজও আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, অসুখের সময় কানপুরে খবর দিতে নিষেধ করেন, তারপর সেখানে যাবার জন্যে সেদিন ব্যস্ত হলেন্‌, এখন আবার বল্‌ছেন, মেসে চল্‌লুম্‌। শুনেছি আপনার বাবা খুব বড়লোক, তা আপনি এমন কাঙ্গালের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন ? এত অসুখে পড়ে'ও তাঁকে খবর দিতে চাইলেন না। তার পর এই দুর্ব্বল শরীরে কোথায় কোন্‌ হোটেলে গিয়ে পড়ে থাক্‌বেন সেই ভাল, এখানে থাক্‌লে যে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হবে ! আচ্ছা সত্যই কি আপনি একেবারেই ছেলে মানুষ ?

বাবা বড় লোক !—তাইত—মোহিতের মনে পড়িল, আজও যে সে তাহার নিজের পরিচয়, এমন কি নামটি পর্য্যন্তও ইহাদের বলে নাই। প্রথম দিন আসিয়া সে বলিয়াছিল, দেবেন তাহার ভগ্নিপতি, কোন কথাইত আর তাহার পর সে খুলিয়া বলে নাই, বলিবার দরকারও এতদিন মনে হয় নাই। কিন্তু সোনালী এখন পিয়ারী বাবুর ঐশর্য্যের কথা উল্লেখ করিতে তাহার কেমন খট্‌কা লাগিল, সোনালীর এত দিনের এত খানি যত্নের হেতু যেন হঠাৎ তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল, সোনালীর ব্যবহারটাও ক'দিন যেন সম্ভবাতীত কোমল বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল। তবে কি—তাইত সব কথা না জানাইয়া মোহিত কি তবে বেচারাকে ঠকাইল নাকি ? মোহিত আবার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমারই দোষে

দেখ্‌ছি আপনারা মস্ত বড় একটা ভুল করেছেন, পিয়ারী বাবু অর্থাৎ দেবেন বাবুর শ্বশুর ত আমার বাপ নন্‌, বড় অসময়ে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমাকে মানুষ করেছিলেন, লুকিয়ে ফল কি, আমার মা আজও তাঁর বাড়ীর রাঁধুনী।—মোহিত থামিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোনালীর মুখের দিকে চাহিল, সে মনে করিয়াছিল, সেখানে আশা ভঙ্গের একটা ক্রুদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিবে, সোনালী এইরূপে প্রতারিত হইবার জন্য খুবই চটিয়া যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া সে দেখিল, সোনালীর মুখে সেরূপ এতটুকুও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বরং, তাহার মনে হইল, সেখানে যেন একটা আশ্বস্ত ভাবই দেখা যাইতেছে। মোহিত অতিশয় বিস্মিত হইল। আবার সে বলিতে লাগিল—নিজের উন্নতি কর্‌বার জন্যে সেখান থেকে চলে আসি, সে আজ প্রায় চার মাস হবে। একটা ছেলে পড়ান' জুটেছিল, কলেজেও পড়্‌ছিলুম্‌। হঠাৎ তারা জবাব্‌ দিলে। বড়ই মুস্কিলে পড়্‌লুম, ক'দিন পথে পথেই কাট্‌ছিল। তার পর সেদিন ভবানীপুর থেকে ফির্‌বার মুখে খুব জ্বর এল'। আগের দিন রাতেই একটু জ্বর হয়েছিল। পয়সা কড়িও হাতে কিছুই ছিল না, কোথাও কোন আত্মীয়ও এখানে নেই, হঠাৎ দেবেন বাবুর কথা মনে পড়্‌তেই এখানে এসে উঠ্‌লুম—সেবার কানপুরে গিয়ে তাঁর এই ঠিকানাই দিয়ে এসেছিলেন তিনি। তখন আমি জান্‌তুম্‌ না যে, তিনি এখানে থাকেন না, তা হ'লে হয়ত এখানে এসে আপনাদের এত ভোগানি দিতুম্‌ না।

সোনালী বলিল—বরং পথে পড়ে' কি হাঁসপাতালে—থামিয়া গিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখুন ও সব কথা শুন্‌বার আমার

কোনই দরকার ছিল না। আপনি কে, কি মনে করে এসেছিলেন, সে খবর প্রথম দিন হয়ত জান্‌বার আমার দরকার ছিল, এখন আর নেই। আপনার যেখানে ইচ্ছে যাবেন তা'তে বাধা দেবার আমার কি অধিকার? তবে এখনও আপনার শরীর ভাল ক'রে শুধ্‌রোয়নি, তাই নিষেধ করা, নইলে আমার কি?

সে কথায় বলিল বটে 'আমার কি', কিন্তু তাহার স্বরে যে ক্ষুব্ধ অভিমান কাঁদিয়া উঠিল, তাহা ত সে লুকাইতে পারিল না। জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া সোনালী খড়্‌খড়ীটা নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। মিনিট খানেক পরে, বাহিরের দিকে তেমনই চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ্‌ চোরবাগানে যেতে হয়, ওবেলা যাবেন, এখন এই উঠ্‌তি রোদে না গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে না নিশ্চয়।—ঘরের মধ্যে আর না চাহিয়াই সে নীচে চলিয়া গেল। মোহিত যাইবে কি যাইবে না, ভাবিয়া পাইল না।

ঘণ্টা খানেক পরে সোনালী জল-খাবার লইয়া আসিল, মোহিত দেখিল, মুখখানি তাহার অত্যন্ত ভার ভার। মোহিতের খাওয়া হইল, সোনালী নিজ হাতে উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া লইয়া নীরবেই চলিয়া গেল।

বেলা তখন বোধ হয় ৪টা, এমন সময় দাশু এক জোড়া জুতা ও কাগজের একটা বড় মোড়ক লইয়া মোহিতের ঘরে ঢুকিল। সে গুলি চৌকির উপর রাখিয়া বলিল—নিন্‌ দাদা বাবু কাপড় জামা ছেড়ে নিন্, ওগুলো ত বিশ্রি ময়লা হয়েছে, ও সব প'রে ত বাইরে বেরুতে পার্‌বেন না। তা দেরী কর্‌বেন না আর, আমি চট্‌ করে, একখানা গাড়ী ডেকে আনি।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মোহিত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাইতে যাইতে দাশু বলিল—বেশী দেরী করবেন না, সন্ধ্যের আগেই ফিরতে না পারলে আবার দিদিমণি আমাকেই বকবেন'খন্।

দাশু চলিয়া গেল, মোহিত চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল, কতক্ষণ পরে উঠিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখিল ভিতরে দেশী কালা-পাড় মিহি ধুতি একখানি, একটি তসরেটের কোট্ ও একটি ছিটের কামিজ। জুতা জোড়ার দিকে চাহিয়া বুঝিল সেটিও নিহাত কম দামের নয়। যথাস্থানে সেগুলি রাখিয়া দিয়া মোহিত আবার খাটে আসিয়া বসিল।

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল। দাশু নীচে হইতে ডাকাডাকি করিতে লাগিল—কই গো দাদা বাবু নেমে আসুন না, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে যে।

পাশের ঘরে সোনালী বসিয়া ছিল, দাশুর ডাকাডাকিতেও মোহিত বাহির হইতেছে না বা কোন সাড়াই দিতেছে না, সোনালী উঠিয়া আসিয়া মোহিতের দ্বারের বাহির হইতে বলিল—গাড়ী এনে দাশু ডাকাডাকি করছে যে।

ঘরের মধ্য হইতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল—ফিরিয়ে দিতে বলুন গাড়ী, আমি যা'ব না।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সোনালী দেখিল, মোহিত মুখ গোঁজ করিয়া খাটের একধারে বসিয়া আছে, জামা জুতা এখনও পরা হয় নাই। তবুও রক্ষা, সে ভয় করিয়াছিল আবার বুঝি জ্বর টর আসিল।

সোনালীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া মোহিত কুপিত স্বরে বলিয়া উঠিল—এ সব কি? নিরাশ্রয়ে বিপদে প'ড়ে তোমার দোরে এসেছিলুম্ তাই বুঝি ভিখারীর মত অপমান ক'রে তার শোধ নিচ্ছে'?—দাশুর পাহারায় তবে এক ঘণ্টার জন্যে যেতে পা'ব! কেন, তাই শুনি? মনে করেছ' বুঝি, অসময়ে আমার সাহার্য্য করেছ' বলে' আমাকে ভেড়া বানিয়ে রাখ্‌বে? বটে তা হচ্ছে না।

কুৎসিত কার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, কুৎসিৎ কথা শোনা বা বলা যাহাদের দৈনন্দিন অভ্যাস, সেই বেশ্যা সোনালী, কিন্তু আজ মোহিতের মুখে এরূপ একটা কদর্য্য ইঙ্গিত শুনিয়া, সোনালীর একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সে ঘাড় বাঁকাইয়া ফোঁস্ করিয়া উঠিল—যাও, এখুনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।—এক পা পিছাইয়া সে দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মোহিতও তখন রাগে ফুলিতেছিল, বাক্য ব্যয় না করিয়া সে বাহির হইয়াই যাইতেছিল, কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত আসিতেই, সোনালী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, প্রসারিত হস্ত দিয়া দ্বার রোধ করিল। অবজ্ঞার স্বরে বলিল—খুবই বীরত্ব দেখান' হয়েছে, আর থাক্। যাকে এমন যা তা ব'লে গাল দিয়ে যাচ্ছ, তার অনেকখানি নুন্ খেয়েছ, তাকে পথে বসিয়েছ',—কড়ায় গণ্ডায় তার ধার না শুধে এখন এক পা'ও কোথাও যেতে পাবে না। ভদ্র লোকের ছেলে হও, ভালয় ভালয় সব শোধ ক'রে তবে যাবার নাম করবে।—উত্তেজনায় বিক্ষিপ্ত চরণে টলিতে টলিতে সোনালী নিজের ঘরে ঢুকিয়া সজোরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

নিস্ফল ক্রোধে মোহিত নির্ব্বাক। এই চরিত্রহীনা সামান্ত নারীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। লজ্জায় ও ধিক্কারে তাহার সারা দেহ যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। এখনই দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া এই দর্পিতা বেশ্যার রক্ষিত তাহার ঘৃনিত প্রাণের অবসান করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উঃ! শেষে এই অপমান সহ্য করিবার জন্যই কি সে তুচ্ছ প্রাণ রক্ষায় লালায়িত হইয়া এখানে আসিয়াছিল? হায়, পথে পড়িয়া নিরাশ্রয়ে মরাও যে এর চেয়েও শতগুণে শ্রেয় ছিল। তাহার যেন বিশ্বাসই হইতেছিল না কেমন করিয়া সে নীরবে এতখানি অপমান সহ্য করিল, এখনও সে নিশ্চল পাথরের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কি করিয়া?

উপরের চেঁচামেচি কিছু কিছু বোধ হয় দাশুর কাণে পৌছাইয়াছিল, বুদ্ধিমানের মত সে গিয়া গ্লাড়ী ফিরাইয়া দিল, তাহার পর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া বাহিরে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধোঁয়ার পাহাড় গড়িতে বসিল।

সন্ধ্যার পর সোনালী দ্বার খুলিয়া নীচে আসিল, অন্য দিনকার মতই নিয়মিত কাজগুলি সারিয়া যাইতে লাগিল। উপরে আলো দিতে গিয়া দাশু দেখিল, মোহিত কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। ডাক্তার বাবু আজ হইতে মোহিতকে রাত্রে ভাত খাইবার অনুমতি দিয়াছেন। রান্না হইলে, একখানি থালায় সমস্ত গুছাইয়া দিয়া সোনালী, দাশুকে ডাকিয়া বলিল—ওপরে ঠাঁই ক'রে বাবুর খাবার দিয়ে এস'।

এরূপ আদেশে দাশু বিস্মিত হইলেও সোনালীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। দাশু ভাত লইয়া

গিয়া মোহিতকে কতক্ষণ ডাকা ডাকি করিতে সে রূক্ষ ভাবে বলিল —শরীর ভাল নেই, খা'ব না।

এতক্ষণ ভাবিয়া মোহিত স্থির করিয়াছিল, কোনও গতিকে এই রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে, কাল সকালেই টাকা চাহিয়া পিয়ারী বাবুকে সে 'তার' করিবে; আজ যে অপমান সে সহ্য করিয়াছে ইহার বাড়া আর কি অপমান থাকিতে পারে?

দুর্ব্বল শরীরে অতখানি উত্তেজনার একটা ফল ত ফলিবেই —মাথাটা তাহার কেমন ভার ভার ঠেকিতেছিল, চোখমুখ জ্বালা করিতেছিল, সন্ধ্যার পর গা'ও বুঝি বেশ একটু গরম হইল। সে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া রহিল। দাশু ডাকাডাকি করিয়া ফিরিয়া যাইবার পর অবসন্ন দেহ-মনে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২১)

অধিক রাত্রে ললাটের উপর একটা শীতল স্পর্শে সজাগ হইয়া মোহিত চোখ মেলিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে; মোহিতের মনে পড়িল, দাশু চলিয়া গেলে, সে একবার উঠিয়া আলোটা ত নিভাইয়া দিয়াছিল, আর, শুধু কোঁচার খুঁটটাই ত সে টানিয়া গায়ে দিয়াছিল, তবে এ শাল আসিল কোথা হইতে?

শিয়রের নিকট হইতে কে যেন একটু সরিয়া বসিল, মুখ ফিরাইয়া মোহিত দেখিল, পাখা হাতে সোনালী। বিরক্ত ভাবে সে আবার চক্ষু মুদিল। মাথায় তখন সে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিবার পর, সে আবার উঃ! করিল। অমনি কপালের উপর আবার শীতল

হস্তস্পর্শ—সোনালী ধীরে ধীরে তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। শীতল স্পর্শে মোহিত একটু যেন স্বস্তি অনুভব করিতেছিল, কিন্তু মনে পড়িতেই, সহসা সবলে হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া বিরক্ত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—আঃ! সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরিয়া সে বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিল।

আরও মিনিট দুই কাটিল। সহসা মোহিতের পিঠের উপর আর্দ্র মুখখানি রাখিয়া সোনালী ফোঁপাইতে লাগিল—ওগো আমায় ক্ষমা কর। রাগের বশে তখন তোমায় শক্ত কথা ব'লে সেই অবধি আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আমায় একটিবার মাপ কর, অমন ক'রে আবার অসুখ বাঁধিয়ো না। তোমার যে-খানে ইচ্ছে কালই চ'লে যেও, আমি কিছুই বল্‌ব' না, তোমার পায়ে পড়ি এবার আমায় মাপ কর।—সে আরও ফোঁপাইতে লাগিল। মোহিতের পিঠ ভিজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সোনালীর এরূপ আচরণে সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, কতক্ষণ সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর উঠিবার জন্য একটু নড়িতেই সোনালী দ্বিগুণ রোদনে বলিল—না, আগে বল আমায় ক্ষমা কর্‌লে, তারপর উঠে আমায় মার' ধর' যা খুসী বল'।

কণ্ঠস্বর একটু কোমল করিবার চেষ্টা করিয়া মোহিত বলিল—সরুন্, উঠুন্ দেখি, এসব কি?—একটু সরিয়া আসিয়া সোজা হইয়া বলিল—আমি রাগ কর্‌ব কেন? দোষ ত আমারি হয়েছিল, আপনি আমার ওষুধ কর্‌লেন, প্রাণ বাঁচালেন, আর আমি নিহাতই অভদ্রের মত, এতটুকু কৃতজ্ঞতা না দেখিয়েই চলে যাচ্ছিলুম।—এবার মুখ ফিরাইতে অশ্রুমুখী, আলুথালু-বেশ সোনালীর প্রতি মোহিতের দৃষ্টি

ড়িল, কণ্ঠ আরও একটু কোমল করিয়া সে বলিল—আপনিই বরং আমায় মাপ করুন, তখন আপনাকে অনেক অভদ্র কথা বলেছি।

আলুথালু বেশ সংযত করিতে করিতে সোনালী বলিল—না না, আপনার ত কিছুই অন্যায় হয় নি। নিজে আমি কতখানি হীন, তার হিসেব না করেই তখন অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে আপনাকে অত বড় অপমান করেছি। বিপদে পড়ে আপনি যে সকলের অস্পৃশ্যা এই পাপিষ্ঠার হাতের এতটুকুও উপকার নিয়েছেন, সেটাই আমার কত বড় সৌভাগ্য, তা' না ভেবে আমি মোহের বশে আরও অনেকখানির প্রত্যাশা করেছিলুম, তারই শাস্তির জন্যেই বুঝি আবার আপনার জ্বর এল। এখন ভালয় ভালয় সেরে উঠুন্, যেখানে খুসী চ'লে যাবেন, একবারও পিছনে ফিরে তাকাবেন্ না, আর আমি একটুও বাধা দেব' না,—তা আমার প্রাণ পুড়ে—হঠাৎ মোহিতের ভীত পাংশু মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে সোনালী আত্ম-সম্বরণ করিয়া নিরস্ত হইল।

সোনালী উঠিয়া গিয়া একবাটি দুধ আনিয়া মোহিতের সম্মুখে ধরিল, মোহিত দ্বিরুক্তি না করিয়া সব দুধটুকুই নিঃশেষে পান করিল। বাটী নামাইয়া রাখিয়া সোনালী মোহিতের শিয়রে বসিয়া নীরবে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল।

গভীর রাত্রি, বহু পূর্ব্বেই সহর নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মোহিত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল—ইন্দু এতক্ষণ ঘুমাইতেছে নিশ্চয়। আজ কতদিন যে মোহিত তাহাকে দেখে নাই, তাহার কোনও খবর পায় নাই! মোহিত ভাবিল, ইন্দু ভালই আছে।—আঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়্‌ছে!

কলিকাতায় আসিয়া অবধি মোহিত একদিনও এমন করিয়া ইন্দুর কথা ভাবে নাই। আসিবার সময় সারদা-পিসি ও ইন্দুর ব্যবহারে সে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিল, মনে মনে তাহার বড়ই অভিমান হইয়াছিল, রাগ করিয়া সে তাহাদের কোনই খবর লয় নাই। মোহিতের মনে পড়িল, সেই টাকা পাঠাইবার জন্য মা'কে পত্র দেওয়ার পর এ পর্য্যন্ত কানপুরে কোন খবর দেওয়া হয় নাই। এই একমাস দেড়মাস তাহার সংবাদ না পাইয়া হয়ত তাহার মা ভাবিয়া চিন্তিয়া কত ব্যস্ত হইতেছেন। সেও ত কলিকাতায় আসিয়া প্রথম একমাস ছাড়া এ পর্য্যন্ত কানপুরের কোন খবর পায় নাই, সেখানে সকলে ভাল আছেন ত? আচ্ছা, ইন্দুর যদি কোথাও বিবাহ হইয়া গিয়া থাকে?—মোহিত শিহরিয়া উঠিল। শীতে সে কাঁপিতেছে মনে করিয়া সোনালী মোহিতের গায়ের শালখানি আর ও একটু টানিয়া দিল।

মোহিত চম্‌কাইয়া চোখ চাহিতেই সোনালী উৎকণ্ঠিত ভাবে-বলিল—বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি? মাথায় একটু বাতাস দেব'?

মোহিত ক্ষুদ্র একটি নাঃ, উচ্চারণ করিয়া, পাশ ফিরিয়া আবার চোখ বুঁজিল

(২২)

মাস দুই পরে সেদিন দুপর বেলা সঙ্কুচিত পদে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে দেবেন দেখিল, এবার এই বাড়ীর যেন কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহারই এত কালের পুরাতন ভৃত্য দাশু আজ যেন কেমন থতমত খাইয়া গেল। দেবেন দেখিল

রেলিঙের সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সোনালীর নীলাম্বরী কি ডুরে সাড়ীখানি আজ শুকাইতেছে না, ২।৩টি শাদা ধব্‌ধবে টুইল সার্ট সেখানে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চারিদিকের এলোমেলো বিলাস ভাব আজ যেন গৃহস্থ বাড়ীর একটা সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছে। সিঁড়ির পাশের কুলুঙ্গিটি তাহারই আনিত পীতাভ বড় বড় বোতলে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত, দেবেন দেখিল সেখানে আজ কতকগুলি ঔষধের শিশি। বারাণ্ডা ও সিঁড়ির দেওয়ালে দেবেন কয়েকখানি নগ্ন, অৰ্দ্ধনগ্ন বিদেশিনীর ছবি টানাইয়া রাখিয়াছিল, এখন সেগুলি কে খুলিয়া লইয়া কোথায় সরাইয়া রাখিয়াছে বা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কতদিন দেবেন বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে শুনিয়াছে এমন সময় সোনালী হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া তাহার পাগল-করা সুরে গলা সাধিতেছে, আর আজ বাড়ীখানি মৃত্যু-পুরীর মতই নীরব ও প্রাণহীন।. দেবেন কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাশুর দিকে চাহিল। দেবেনের ইঙ্গিত না বুঝিয়া দাশু চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

বিরক্ত হইয়া দেবেন বলিল—এরা কোথায়?

দেবেনের বিরক্তভাব বুড়ার বড়ই প্রাণে লাগিল, সে বলিল—ওপরেই আছেন।

দেবেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সিঁড়ির উপর হইতে সোনালী জিজ্ঞাসা করিল—কে এল' দাশু-ভাই? দেবেন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—এই যে সোনা! ব্যাপার কি? বাড়ী ঢুকে'ই ভয় হচ্ছিল কোন্ রাজা মহারাজা বুঝি, মাথার মুকুট কর্‌বার জন্যে তোমায় তুলে নিয়ে গেছে!

তাহার এমন মোলায়েম ঠাট্টায় কোনও সাড়া না দিয়া সোনালী যখন বলিল—একটু আস্তে আস্তে আস্‌বেন, অত শব্দ করুবেন না, তখন দেবেন সত্যই কেমন ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। উপরে উঠিয়াই দেবেন দেখিল, সিঁড়ির পাশের ঘরখানি, যেখানিতে সে থাকিত, তাহার দ্বার ভেজান, সোনালী তাহা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন অগ্রসর হইতে সোনালী মৃদুস্বরে বলিল, ও ঘরে চলুন। বলিয়াই নিজে অগ্রসর হইল। দেবেন সবিস্ময়ে দেখিল সোনালীর দেহের সে বিলাস ভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পরিধানে একখানি মিলের মোটা ধুতি, হাতের ক' গাছা চুড়ি ছাড়া অঙ্গে দ্বিতীয় গহনা নাই; দেহের রঙের সে গোলাপী স্বচ্ছতা কিসের একটা মলিন ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছে, চোখের কোলে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেবেন ঘরের ভিতর ঢুকিল। ঘরের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, খাটে অনাদৃত মলিন বিছানা, আন্‌লায় ২।১ খানা মোটা কাপড় ও সেমিজ ছাড়া একখানিও ভাল কাপড় বা জামা নাই। দেওয়ালের ছবিগুলি, সব কয়খানিই বোধ হয় বাতাসে উপুড় হইয়া গিয়াছে। হারমোনিয়মের বাক্‌সোটি ধূলা ও মাকড়সার জালে আচ্ছাদিত। দেবেন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, আবার জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপর কি এসব?—খাটের এক পাশের ধূলা ঝাড়িয়া দেবেন বসিয়া পড়িল।

মেঝে হইতে বঁটী ও কলের চুপ্‌ড়িটা এক পাশ করিয়া রাখিতে রাখিতে সোনালী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—কিসের ব্যাপার কি? —চারিদিকে দারিদ্র চিহ্নের উপর দেবেনের দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

দেখিয়া বলিল—ওঃ এসব গরীবিয়ানী?—তা হ' মাস কোথা থেকেও একটা পয়সা না এলেও কি রাজাগিরী চাল্ দেখ্বার আশা ক'রে এসেছিলে না কি? যাক্ এখন তোমার কি দরকার শীগ্গীর ব'লে ফেল দেখি; আমার এখনও ঢের্ কাজ আছে, বাজে বক্বার সময় নেই।

অন্যদিন হইলে দেবেন সোনালীর এই ক্রুদ্ধ অভিমানে ব্যাকুল হইত, তাহাকে সাধাসাধি করিত। কিন্তু আজ ইহাতে সে একটু স্বস্তিই অনুভব করিল—যাক্ আপনা হইতেই সোনালী তাহার কাজটা সহজ করিয়া আনিতেছে।—দেবেন হাসিয়া বলিল—কেন, এবারের এ বোষ্টমটি একেবারেই কি কাঞ্চন বিরাগী নাকি?—পাশের ঘরের দিকে ইসারা করিয়া বলিল—তারপর কোন্ ভাগ্যবানের ওপর এবার সদয় হলে?

রুষ্টভাবে সোনালী উত্তর করিল—বল্ছি ওসব বাজে কথার আমার মোটেই সময় নেই, ইচ্ছেও নেই। কোন্ অভাগার বরাৎ খুল্লো কি কপাল পুড়্লো সে খবরে ত তোমার কিছু দরকার নেই। যদ্দিন তোমার মাইনে খেয়েছি তদ্দিন সব কথার জবাব-দিহি করেছি, এখন ত আর সে বাধ্য বাধকতা নেই। স্পষ্টই বল্ছি, হ' মাস তুমি এধারে এসনি বা টাকা দাওনি, সে জন্যে আমি এতটুকুও হুঃখিত নই, একটুও রাগ করিনি, বরং কৃতজ্ঞই হয়েছি। এক মাস আগেও যদি তুমি এসে হাজার টাকা হাতে তুলে দিতে, তখনও আমি এম্নি ক'রেই বল্তুম্—তোমার টাকা চাইনে, তুমি চলে যাও, আর অনুগ্রহ দেখাতে এস' না।

দেবেন বুঝিল, সোনালীকে এবার রোগে ধরিয়াছে, সে

শীরিতে পড়িয়াছে। মন্দ কি, সেও ত এত বড় একটা অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাইতেছে। সে বলিল—বেশ্ ভালই হ'ল, আমিও ঠিক এই রকম একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম আজ। আগে থেকেই তুমি নিজের পথ দেখে নিয়েছ, শুনে খুবই খুসী হলুম্। আমিও এ সব পুরান অভ্যেস ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। ভাঁড়া-ভাড়ির দরকার কি—এবার আমায় বাধ্য হয়েই ভাল হতে হচ্ছে। নিজের বিষয় কড়ি যা ছিল, তোমাদের পাঁচ জনের পায়ে ঢেলে সে ত অনেক দিন আগেই ফুঁকে দিয়েছি। জ্যাঠা ম'শয়ের সম্পত্তিটা, সেটাও বুঝি হাত ছাড়া হয়, আমার ছেলে না হ'লে সেটা অন্যের হাতে যাবে। মনে আছে তোমার, সেবার দাশুকে এখানে রেখে কানপুর গিয়েছিলুম্, আমার স্ত্রীকে আন্‌তে, সে ত এল না। এখন আর একটা বিয়ের চেষ্টায় এত দিন ঘোরা ঘুরি কর্‌ছিলুম্। তা বিয়ে এখনও হয়নি বটে, শীগ্‌গীরই হ'য়ে যাবে। তাই মনে কর্‌লুম পুরান দেনা গুলো এইবেলা চুকিয়ে দিয়ে আসি, দাশুটাকেও নিয়ে যেতে হবে ত।

পকেটে হাত দিয়া দেবেন এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল—তা গেল দু'মাস যখন তোমায় কোনও খবর্ দেই নি, তখন ও দুমাসের টাকাটা আমার কাছে তোমার পাওনাই হয়েছে, নিয়ে আমার ধার শোধ কর্‌লে খুসী হব। সোনালী বলিল—তুমি তোমার মনের ভাব না জানালেও আমি নিজেই অনেক দিন হ'ল তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছি, ওটাকা নেওয়ার আমার কোনও অধিকার নেই, গরীব দুঃখী কাকেও দিয়ে দিও, পুণ্যি হবে।

নোট গুলিকে পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া পাঠাইতে দেবেন একটুও দুঃখিত হইল না। দেবেন লক্ষ্য করিতেছিল, সোনালী বার বার দেওয়ালের টাইম্‌পিস্‌টার দিকে তাকাইতেছে, সে বলিল—আচ্ছা, তবে এখন যাওয়া যাক্‌, তোমারও মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে।—দেবেন উঠিল। কিন্তু গৃহের ও গৃহকর্ত্রীর আগাগোড়া এমন পরিবর্ত্তন, সোনালীর এতখানি নির্লোভ উদারতার কারণ কি জানিবার জন্য দেবেনের বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল, সোনালীকে জিজ্ঞাসা করা নিস্ফল, দাশু নিশ্চয় জানে, পথে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে; দেবেন এক পা এক পা করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, দাঁড়াইয়া পিছনে ফিরিয়া দেখিল সোনালী তখনও ঘর হইতে বাহির হয় নাই। দেবেন সন্তর্পনে বাঁ দিকের দ্বারটি একটু ঠেলিয়া ধরিল, —দেখাই যা'ক্‌ না লোকটা কে?—হঠাৎ কোনও বৈদ্যুতিক তারে হাত পড়িলে তড়িতের ধাক্কা খাইয়া লোকে যেমন করিয়া হাত টানিয়া লয়, দেবেনও তেমন করিয়াই দ্বারের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইল। তাহার পর আর পশ্চাতে না ফিরিয়া অতি দ্রুতপদে সে নীচে নামিয়া আসিল। দাশুকে দেখিতে পাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—তোমার কাপড় চোপড় কি আছে চট্‌ ক'রে নিয়ে এস, আমার সঙ্গে এখুনি দেশে যেতে হবে। ওপরে আমি ব'লেই এসেছি, কাকেও কিছু বল্‌তে হবে না।—অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি একখানা ট্যাক্সি পাই কি, সাড়ে চারটার গাড়ীখানা যদি ধরা যায়।

ভাগ্য-নিরূপিতা

দাশু বেচারা বড়ই সমস্যায় পড়িল—তাইত, দেবু ভাই হঠাৎ এমন তাড়াতাড়ি যেতে বল্লে, এদিকে দাদাবাবু আজও ভাল ক'রে সার্‌লেন্ না, দিদিমণি মেয়ে মানুষ, এ অবস্থায় একা ফেলে যাই বা কি ক'রে?—মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দাশু উপরে উঠিতেছিল, দেখিল সোনালী দুধ গরম করিতে নীচে আসিতেছে। বুড়ার শুষ্ক মুখ দেখিয়া সোনালী বলিল—কি দাশু-ভাই, মনিব ডেকে গেলেন বুঝি? তা যাও, তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার মিটিয়ে দিয়েছি। আমাদের জন্য তোমার ভাব্‌তে হবে না। বুড়ো মানুষ তুমি আমার অনেক ক'রেছ, তোমার কথা কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব' না। মধ্যে মধ্যে এ পাপী দিদিমণিকে এক এক বার মনে ক'রো।

দাশু কাতর নয়নে সোনালীর দিকে চাহিতেছিল, 'মুখ্যু সুখ্যু' মানুষ সে, চেখের জল চাপিতে পারিতেছিল না। সে বলিল—কি ক'র্‌বো দিদিমণি, দেবুভাইকে ত তুমি জানই, চিরদিনই তিনি এম্‌নি খামখেয়ালি, এ বুড়োর কথা মনে ক'রে তাঁকে শাপ তাপ দিও না। দাদাবাবু উঠেছেন কি, একবার দেখা ক'রে ব'লে এলে হ'ত না?

বৃদ্ধের এ অন্ধ প্রভুভক্তিতে সোনালী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।—তোমার দেবুভাই ত আমাকে কিছু বলেন নি, আমিই নিজে থেকে সম্বন্ধ কাট্‌ছি। মোহিত বাবু এখনও উঠেননি, এখন আর হঠাৎ তাঁকে ব'লে মনটা খারাপ ক'রে দিয়ে কাজ নেই। তুমি চ'লে যাচ্ছ শুন্‌লে বেচারা মনে বড়ই কষ্ট পাবে। পরে আমি গুছিয়ে সব কথা তাঁকে ব'লব'খন। সুবিধে মত তুমি আর একদিন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যেও।

দাশুও আর দেরী করিতে সাহস করিতেছিল না—দেবুভাই তাহার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছে। তাড়া তাড়ি সে দড়ির উপর হইতে আধ্ শুক্‌না কাপড়খানি পাড়িয়া গামছায় জড়াইয়া লইল। দূর হইতে সোনালীকে একটা নমস্কার করিয়া ও মোহিতের উদ্দেশ্যে সিঁড়ির ধাপে মাথাটা একবার ঠুকিয়া, বার বার পিছনে চাহিতে চাহিতে দাশু বাহির হইয়া গেল।

সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া, সোনালী মোহিতের জন্য দুধ গরম করিতে বসিল।

(২৩)

একটি পাথর বাটিতে গরম দুধ লইয়া সোনালী উপরে আসিয়া দেখিল মোহিত তখনও ঘুমাইতেছে। দুধের বাটি নামাইয়া রাখিয়া সোনালী ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। শিয়রের কাছে আসিয়া মোহিতকে ডাকিতে গিয়াই সোনালী কি ভাবিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। আহা! মাথার যন্ত্রনায় বেচারা কাল সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই, আর একটু ঘুমাক্—মোহিতের সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। মোহিত বয়সে ছোট না হউক তাহার সমবয়সীই হইবে। নানারূপ কষ্টে ও অসুখে তাহার শরীর অতিশয় রোগা, বর্ণও অতিশয় মলিন, বহুদিন তৈলাভাবে দীর্ঘ চুল গুলি রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। তবুও সোনালী এক দৃষ্টে সে মুখের কি দেখিতেছিল, সেই জানে। কত সময় সে নিজের অজ্ঞাতে এমন

করিয়াই চাহিয়া থাকিত। আজ চাহিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি ক্রমে পিপাসাতুর হইয়া উঠিল। সন্তর্পনে সে আঁচল দিয়া মোহিতের কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছাইয়া দিল। তখনও মোহিতের নিদ্রা ভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল না। সোনালী বার কতক ইতস্ততঃ করিল, তাহার ওষ্ঠ দু'টি কাঁপিতে লাগিল, হঠাৎ সে নত হইয়া মোহিতের কপালের উপর একবার ওষ্ঠ স্পর্শ করাইল—অমনি অভাগিনীর সমস্ত দেহে একটা মত্ত শিহরণ জাগিয়া উঠিল, তাহার বুভুক্ষু প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া আপনাকে মোহিতের পাছ্‌তলার দিকে টানিয়া লইয়া গেল—পাছে আবার প্রলোভন দমন করিতে না পারে, মোহিত জাগিয়া উঠিয়া বিরক্ত হয়, রাগ করে। মুখের আরক্ত তৃপ্তি চিহ্ন মুছিয়া যাইতে সময় দিয়া সোনালী এবার মোহিতের পায়ে হাত দিয়া ডাকিল—ওঠো অবেলায় আর কত ঘুমুবে? ওষুধ খাবার সময় হ'য়ে গেছে যে।

মোহিত চোখ চাহিয়া ক্লান্ত ভাবে বলিল—এই ত এই মাত্র ওষুধ খেলুম্, আবার এখনি খেতে হবে? ভালই আছি আজ, তবুও নিস্তার নেই,—পঞ্চাশ বার ওষুধ খেতে হবে।

মোহিতের কথায় কাণ না দিয়া সোনালী মেজার-গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া মোহিতের সম্মুখে ধরিল। মোহিত বিরক্ত ভাবে বলিল—আঃ! মুখটাও ধুতে সময় দেবে না নাকি?

সোনালী ঔষধের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া একহাতে পিক্‌দান ও এক হাতে জলের গ্লাস লইয়া মোহিতের সম্মুখে ধরিল। আপত্তি করিলে কোন ফল হইবে না জানিয়া, মোহিত মুখ ধুইয়া ঔষধ পান করিল।

গ্লাস রাখিয়া সোনালী মৃদু হাসিয়া বলিল,—দুধটুকু ভালয় ভালয় খাবে, না কচি খোকার নাকে কাঁদুনি সুরু হবে?

ভীত ভাবে মোহিত বলিল—মাপ কর দিদি, এখন আর দুধ টুধ্ খেতে পার্‌বো না।—কি জানি কি ভাবিয়া মোহিত আজ কাল সোনালীকে দিদি বলিয়া ডাকা আরম্ভ করিয়াছে। সোনালী ইহাতে কিছু প্রতিবাদ করে নাই, আর কিই বা প্রতিবাদ করিবে?

অনুযোগের সুরে সোনালী বলিল—আর বায়্‌না ক'রো না, লক্ষিটির মত খেয়ে নেও, একটু আধটু দুধ না খেলে চল্‌বে কেন? বোতল বোতল কুইনিন্ সাব্‌ড়ে দিচ্ছ, শেষ্‌টা কি কালা হবে? তা হ'লেই আর রক্ষে থাক্‌বে না, এমনিই ত দশবার না বল্‌লে কোন কথাই তোমার কানে যায় না।

ওজর আপত্তি এখানে কিছুই খাটিত না, কাজেই মোহিতকে অনিচ্ছা সত্বেও আধসের তিন পোয়া দুধ পার করিয়া দিতে হইল।

রাত্রে আবার মোহিতকে দুধ ও একবাটি বার্লি খাওয়াইয়া সোনালী তাড়াতাড়ি নিজের আহারাদি সারিয়া মোহিতের ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সেই ঘরের মেঝে, যেখানটিতে রোজ দাশু মাদুর পাতিয়া শুইত, সেইখানে সোনালী একখানি সতরঞ্চি বিছাইল, একটি ছোট বালিস রাখিল। দেখিয়া, মোহিত একটু বিস্মিত হইল। তারপর সোনালী আঁচল দিয়া মোহিতের বিছানাটি এক পাশ এক পাশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দিয়া আলো কমাইয়া দিল। মোহিত দেখিল সোনালী নিজের ঘরে শুইতে না গিয়া সেই খালি সতরঞ্চিখানির উপর বসিয়া পড়িল। সভয়ে

মোহিত বলিল—একি ? নিজের ঘরে গিয়ে শোও, ওখানে অমন ক'রে মাটিতে শুচ্ছ' কেন ?

আলোটি আবার উস্কাইয়া দিয়া সোনালী ক্ষণকাল মোহিতের ভীত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল—দাশু চ'লে গেছে, রাতে তোমার যদি কিছু দরকার হয়, এই অসুখ শরীর, একা থাক্‌বে ?

—তা হ'ক্ একাই থাকৃব আমি, কোন দরকার হবে না, দাশু হঠাৎ কোথায় চলে গেল ? কই আমি ত কিছু জানিনে। কখন গেল ?

—তার মনিবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় হঠাৎ তা'কে চ'লে যেতে হ'ল, বিকেলে তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে, তাই ব'লে যেতে পারে নি।

—কা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল বল্লে, মনিবের সঙ্গে ? কে, দেবেন বাবু ? কোথায় আছেন তিনি এখন ? এখানে এলেন না ?

নিরুৎসাহ ভাবে সোনালী বলিল—তা কি জানি আমি ? অত খবর কে নিতে গেছে !

নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া মোহিত বলিল—না না, দাশু যদি তোমাকে কিছু ব'লে গিয়ে থাকে তাই। দাশুর কাছে আমার কথা তিনি শুনেছেন নিশ্চয়, তা কই দেখা কর্‌তে এলেন না ত ?

তাহার কথার আর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া সোনালী আবার শুইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া মোহিত বলিল—

—না না ওখানে অমন ক'রে শু'লে তোমার ঘুম হবে না, উঠে শোও গিয়ে যাও।

সোনালী একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে চাহিল, পরে বলিল—আমার কিছুই কষ্ট হবে না। তুমি এখন ত ঘুমোও, মিছে রাত হচ্ছে।

মোহিত শুইল না, নীরবে বিছানার উপর বসিয়া রহিল। দেখিয়া, সোনালী বলিল—কি, ভয় হচ্ছে নাকি? তা সত্যিই কি আমি রাক্ষুসী না ডাইনী যে, তুমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে, টপ্‌ ক'রে তোমায় গিলে ফেল্‌ব'?—হাসিতে গিয়াই সোনালীর বৈকালের সেই চুম্বন চুরীর কথা মনে পড়িয়া গেল, অমনি লজ্জায় সোনালীর মুখখানি রাঙিয়া উঠিল।

বিরক্ত স্বরে মোহিত বলিল—বেশ্‌, না যাও, আমিও এম্‌নি ক'রে বসে বসেই রাত কাটাব'।

সোনালী উঠিয়া আসিয়া খাটের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আর আমিও না হয় সারা রাত বসে' বসে' তোমায় বাতাস কর্‌বো, পা টিপে দেব'। ক্ষতিটা কার' হবে, শুনি?—হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পাশে বসিয়া বলিল—শোও লক্ষিটি, বরং যতক্ষণ তোমার ঘুম না আসে, আমি না হয় ততক্ষণ তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেই।

মোহিত রাগিয়া, তড়াক্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু সোনালী খপ্‌ করিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ছিঃ, ছেলেমী ক'রো না, রুগীর ঘরে নার্স থাকে না?

বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, হয়ত সোনালী জোর করিয়াই

তাহাকে টানাটানি করিবে, মোহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, তাহা ছাড়া ও ত নীচেই শুইবে, তাহাতে মোহিতের এমন কি আপত্তি হইতে পারে? পরস্ত্রী, বেশ্যার সহিত একই ঘরে রাত্রি যাপনের সম্ভাবনাটা প্রথমে মোহিতের নিকট অনেকখানি বিভৎস ঠেকিয়াছিল, কিন্তু এখন ইহার প্রতিকার নাই দেখিয়া, মোহিত বিফল ক্রোধ ত্যাগ করিল, আস্তে আস্তে বিছানায় উঠিয়া সে শুইয়া পড়িল।

সোনালী একটু হাসিয়া নীরবে তাহাকে পাখা করিতে আরম্ভ করিল।

(২৪)

আরও চার পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। সকাল সকাল মোহিতকে ভাত খাওয়াইয়া, সোনালী তাহাকে উপরের খোলা বারাণ্ডায় বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, পাশে একখানি কি বইও রাখিয়া গিয়াছিল—ভাত খাইয়া ঘুমাইলে আবার মোহিতের শরীর খারাপ হইতে পারে। সোনালী কলতলায় কতকগুলা এঁটো বাসন লইয়া মাজিতে বসিয়াছে। দাশু চলিয়া গিয়াছে, ঠিকা ঝিও এখন আর দু'বেলা আসে না, সকালে একবার আসিয়া বাজার করিয়া দিয়া যায়। সোনালী আজ কাল খুবই হিসাবী হইয়াছে, সকল রকমে সে ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। গত দু' মাস আড়াই মাস তাহার এক পয়সাও আয় ছিল না, তাহার উপর মোহিতের অসুখে তাহাকে জলের মত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। যখন নগদ টাকা শেষ হইয়া গেল,

তখন সোনালী একে একে গায়ের গহনা খুলিয়া দাশুর হাতে দিয়াছে। সেদিনকার তাগা বেচা ৯০৲ টাকার ৬০৲ টাকা ত দু'মাসের বাড়ী ভাড়া দিতেই গিয়াছে; মোহিতের ঔষধ পথ্যের খরচ বাদে এখন মাত্র বার'টি টাকা তাহার হাতে আছে। আর আছে হাতের আটগাছি চুড়ি ও থালা ঘটী। উপায় কি হইবে, ভাবিয়া কিছু কুলকিনারা করিতে না পারিয়া, সোনালী এখন, যাহা হইবার হইবে, মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। মোহিতকে কিন্তু এ সব অনটনের কথা ঘুণাক্ষরেও সে জানিতে দেয় নাই। তাহার জন্য নিত্য সরু, পুরাতন চালের ভাত ও কই-মাগুর মাছের ঝোল যোগাইতেছিল, নিজে হয়ত দু'টি আলু ভাতে ভাত খাইয়া ও একবেলা না খাইয়াই দিন কাটাইতেছিল। সারাদিন সে দাসীর মত সংসারের সকল কাজ নিজ হাতেই করিতেছিল।

এতখানি স্বার্থত্যাগ, নিজের এতখানি পরিবর্ত্তনে সোনালী নিজেই মনে মনে আশ্চর্য্য হইতেছিল—তা'র এ কি হইল? বিলাস-ঐশর্য্য হেলায় ত্যাগ করিয়া, সে কিসের আশায়, কেন এতখানি দারিদ্র কষ্টকে বরণ করিয়া লইল? এখনও ইচ্ছা করিলে সে ত রাজরাণীর মত ঐশর্য্যে, সুখে থাকিতে পারে, তবে এ বোকামী খেয়াল কেন?

কেন?—সোনালী মরিয়াছে, তাহাদের জাতের যাহার বাড়া শাপ নাই, সেই শাপ সে স্বইচ্ছায় নিজের মাথায় টানিয়া লইয়াছে,—সোনালী মোহিতকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল ইহা উপকার-প্রার্থীকে উপকার দানের নেশা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে দিন মোহিত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে

সে আত্মহারা হইয়া অমন করিয়া বাধা দিয়াছিল, তাহার পর ভাবিতে বসিয়া সোনালী দেখিল—না, তাহার রোগ বড়ই কঠিন। মোহিতকে একমিনিট চোখের আড় করিলে, সে হয়ত বাঁচিবে না। তাহার এতদিনের ভিখারী অন্তর আজ সুধার আস্বাদ পাইয়া, আকণ্ঠ পান-প্রয়াসী হইয়াছে—এতদিনে তাহার অভিশপ্ত, ভ্রষ্ট জীবনের একটা লক্ষ্য মিলিয়াছে। ছুতায় নাতায় মোহিতকে স্পর্শ করিবার জন্য তাহার সারা প্রাণ আজ কাল সতত লালায়িত, স্পর্শ হইলে তাহার দেহের মধ্যে মদির বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিয়া যায়, মনে হয়, হায়! সারা জীবন যদি এমনই করিয়া সমস্ত দেহ দিয়া সে মোহিতকে ছুঁইয়া থাকিতে পারিত! এক এক বার নিজের অনিচ্ছা সত্বেও তাহার মনে হইত, মোহিত যদি চিরদিনই এমন অসুস্থ হইয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিত! মোহিতের নির্লিপ্ত ও বিরক্ত ভাবে সোনালীর পিপাসা আরও বাড়িয়াই যাইতেছিল।

মোহিতও যে সোনালীর ভাব গতিক একেবারেই লক্ষ্য করিতেছিল না, এমন নহে। সত্যই সে নিহাত বালক নয়, প্রাণের খেলা সেও একটু একটু বুঝিত, সেও ত ইন্দুকে ভালবাসে। মোহিত এখন সোনালীকে দিদি বলিয়া ডাকে, মনে মনে সে আশা করিতেছিল, যে কয়টা দিন তাহাকে বাধ্য হইয়া ইহার আশ্রয়ে থাকিতে হয়, সে কয়টা দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেলেই সে বাঁচে, নিজের মনে সে ত খাঁটী আছে তবে আর এত ভয় কিসের? অবশ্য, ইহার আশ্রয়ে এত দিন থাকা ও ইহার মনের ভাব জানিয়া শুনিয়াও এমন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে এখানে বাস করা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় হইতেছে। কিন্তু উপায় ত আর কিছুই নাই।

প্রথমে সে ত জানিয়া শুনিয়া এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন জানিল, যাইবার পা হইল, তখনই ত তাহার এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, সোনালী সত্যই ত আর জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। হাঁ, সে দিন সোনালীর দুটা ভয় দেখান কথায় কান দিয়া সে বড়ই মুর্খামি করিয়াছে। এখান হইতে চলিয়া গিয়া, পরে অর্থ দিয়া সোনালীর কৃত উপকারের যতটা প্রতিদান হয় তাহা করিলেই ত হইত; নিজের মনে ত সে নিষ্পাপই থাকিত, অকৃতজ্ঞতার কালিমা ত তাহাকে স্পর্শিত না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই আবার জ্বরটা আসিয়া এতদিনের জন্য তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। এবার আর এখানে থাকা নয়, সোনালীর মতে হউক বা অমতে হউক কালই সকালে মোহিত এখান হইতে বিদায় লইবে। একাকী বারাণ্ডায় বসিয়া মোহিত ভাবিয়া ভাবিয়া এরূপ সঙ্কল্প করিতেছিল। আকাশে মেঘ উঠিতেছিল, পাঁচীলের উপর কয়টা কাক কর্কশ স্বরে কা কা করিতেছিল।

সোনালী নীচের কাজ সারিয়া ভিজা কাপড়ে, মোহিতের পাশ দিয়া ঘরে যাইতেছিল। পদশব্দে মোহিত ফিরিয়া চাহিল, সোনালী এক ঝলক হাসিয়া ঘরে ঢুকিল।

কিছুক্ষণ পরে সোনালী একখানি লালপাড় নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া, গালে একটি পান দিয়া মোহিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার আর মোহিত মুখ তুলিয়া চাহিল না। মোহিতের অস্পৃষ্ট বইখানির উপর দৃষ্টি পড়িতে সোনালী বলিল—কি ভাবছ? হ্যাঁ ভেবে' ভেবে' মন খারাপ কর, আবার শরীর খারাপ হো'ক আর

কি! একটু হাসিয়া বলিল—শুন্‌তে পাচ্ছ কি? না, কোন্ ভাগ্যবতীর ভাবনায় একেবারে বিভোর হ'য়ে ব'সে আছ শুনি?

তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া মোহিত বলিল—সত্যই মনটা আজ ভাল লাগ্‌ছে না, দু'মাস হ'ল কানপুরের খবরও কিছু পাইনি।

অসহিষ্ণুভাবে সোনালী বলিল—আবার ঐ সব কথা ভাব্‌ছ? তবেই সেরেছে, জ্বর আস্‌তে দেরী হবে না। কানপুরে তোমার মা ছাড়া আর ত বিশেষ কেউই নেই, তা তিনি ভালই আছেন নিশ্চয়। মা ছাড়া আরও কেউ আছেন নাকি সেখানে, যাঁর জন্যে আজ মেঘ দেখে তোমার প্রাণ পুড়্‌ছে?

মোহিত সহসা সোজা হইয়া বসিল,—এইত উত্তম সুযোগ, অভাগিনীর ভুল আশা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাউক্। কাল ত মোহিত চলিয়াই যাইবে তবে সব কথা সোনালীকে বলিয়া গেলে হয়ত তাহার একটা সান্ত্বনাও মিলিতে পারে। মোহিত দৃপ্ত স্বরে বলিল —হাঁ, আরও অন্ততঃ একজন আছে, যা'কে আমি এক মিনিটও ভুল্‌তে পারি না, ছেলে বেলা থেকেই তা'কে আমি বড় আপনার ব'লেই ভাব্‌তে শিখেছি।

সোনালীর মুখের গোলাপী আভা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল, মুখখানি সাদা কাগজের মত শাদা হইয়া উঠিল। বহু চেষ্টায় সামলাইয়া লইয়া সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—কে—কে তিনি?

সোজা উত্তর না দিয়া মোহিত বলিল—ইন্দু আমার সমস্ত হৃদয়-খানিই জুড়ে আছে, আর সেও—

—ইন্দু! ওঃ, অসুখের সময় বার বার ঐ নামই কর্‌তে বটে।

—তা হবে, হয়ত জ্বরের ঘোরে ডেকেই থাক্‌ব।

ভাগ্য-নিরূপিতা

সোনালীর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই মোহিত কথা বলিতেছিল। সোনালীর বিবর্ণ, ব্যথিত মুখখানি দেখিয়া তাহার প্রাণে একটু মায়াও হইতেছিল, কিন্তু কি করিবে, তাহাকে বলিতেই হইবে, ইহাতেও যদি সোনালী একটু সজাগ হয়।

মোহিতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া সোনালী রেলিং ঠেস্ দিয়া আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার বুক ফাটিয়া একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বাহির হইতে চাহিতেছিল। হায় বিফল আশা! মন বলিতে লাগিল—স্থান নাই, স্থান নাই, দুরাশা ত্যাগ কর। ভিতর হইতে আবার কে যেন উত্তর করিল—আশা ছাড়িব? কখনই না। না হয় মরিব, তা' বলিয়া এ অন্ধকার জীবনে যে আলোর রেখা দেখিয়াছি, তাহাকে কি এত সহজেই ছাড়িতে পারি?—নিজের অজ্ঞাতসারে বড় বড় ক' ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া সোনালী নত মুখে ধরা গলায় বলিল—বৃষ্টি এল, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চল ঘরের মধ্যে চল।

অলসভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মোহিত নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, সোনালী বাধা দিয়া বলিল—ও ঘরে একা একা ব'সে আবার ভাব্‌বে'খন, বরং এ ঘরে এস, সেলাই কর্‌তে কর্‌তে আমি গল্প কর্‌ব'খন।

তাহার কথা কানে না তুলিয়াই মোহিত আবার প্রশ্ন উঠাইল। সোনালী বলিল—শোন', ক'টা দরকারী কথা আছে, এস এ ঘরে এস।

না গেলে সোনালী নিজেই ত এ ঘরে আসিয়া বসিবে, অতএব এ ঘর আর ওঘর একই কথা। মোহিত আজ প্রথম সোনালীর

ঘরে পা দিয়া, খাটে বসিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেখিয়া সোনালী ইজিচেয়ারখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—ব'স। কয়টা বালিসের ওয়াড় বাহির করিয়া সোনালী সেলাই করিতে বসিল।

মোহিত চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে সোনালী বলিল—যাবার জন্যে তোমার মন খুবই ব্যস্ত হচ্ছে তা বুঝ্তে পারছি, আজ না যেতে পার, কাল হয়ত আর এখানে থাক্তে চাইবে না। কিন্তু যাবার আগে, আমার ক'টা কাজ তোমায় ক'রে দিয়ে যেতে হবে। এ বাড়ীখানার ভাড়া মাসে তিরিশ টাকা, এ বাড়ীতে থাকা আর আমার চল্‌বে না। কোন ভদ্র পাড়ায়, খুব কম ভাড়ায় একখানা একতলা ছোট বাড়ী না হয় খোলার বাড়ী আমার জন্যে তোমায় ঠিক ক'রে দিতে হবে। এত সব আসবাব পত্তর আমি কি কর্‌বো? এ গুলো বিক্রীর চেষ্টা দেখ্তে হবে। হাতের এ চুড়ি ক'গাছাও বিক্রী কর্‌বো মনে কর্‌ছি। শ' তিনেক টাকা তা' হলে আমার হাতে আস্‌বে। এই টাকা দিয়ে মাসে ১৫।২০ টাকা যাতে ভদ্রভাবে রোজগার কর্‌তে পারি তার উপায় একটা তোমার ক'রে দিতে হবে। ঘৃণায় হ'ক্, অনিচ্ছায় হ'ক্, এতদিন যখন এখানে কাটাতে পেরেছ, তখন আরও দু'টো দিন দেরী ক'রে আমার এই উপকার গুলো তোমার ক'রে যেতে হবে। এ অনুরোধ কর্‌বার বোধ হয় আমার অধিকার আছে।

'সোনালীর মনের ভাব ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মোহিত বলিল—তার মানে?

—তার মানে?—দেবেন বাবুর আশ্রয় আমি অনেক দিনই

ত্যাগ করেছি, তা ছাড়া, এখন আর অন্য পুরুষের কাছে বিক্রীর জন্যে এ দেহটাকে বা'র কর্‌বার শক্তিও আমি নিজেই হারিয়ে ফেলেছি। হাতে যা' দু'পয়সা ছিল সবই ফুরিয়ে এসেছে। বেঁচে ত থাক্‌তেই হবে, তা বুকই ফাটুক্‌ আর প্রাণই পুড়ুক্‌। জন্ম থেকে পাপের ত শেষ নেই, আত্মহত্যা ক'রে আর বোঝা বাড়িয়ে কি হবে? যা'ক্‌ সে কথা—লোকের দোরে যে গতর খাটিয়ে খা'ব, তাতেও এই দেহটাই বাদ সাধ্‌বে। ভিক্ষে কর্‌বো সে উপায়ও নেই, পদে পদে বয়েস আর রূপ আমার শত্রুতা কর্‌বে। দোষ ত লোকে একা আমাদেরই দিয়ে থাকে, কিন্তু বল' দেখি, মেয়ে মানুষের খারাপ হবার গোড়া কে? পুরুষের লোভ, লালসা, না, তার নিজের অন্তরের পাপ বাসনা? জগত যদি আমায় ঠাঁই দিতে পার্‌বে না, তবে আমাকে টেনে আন্‌বার কি দরকার ছিল? আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপের শাস্তির জন্যে, না, জগতের পাপ ভার আরও বাড়াতে? থাক্‌ সে কথা,—জীবনে আমার ঘৃণা জন্মে গেছে, যে ক'টা দিন বাধ্য হ'য়ে বাঁচ্‌তে হবে, পুড়ে পুড়ে ছাই হ'তে হবে, সে ক'টা দিন যাতে লোভী পুরুষের অত্যাচার ও নিজের দুর্ব্বলতা থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারি, তারই একটা উপায় ক'রে দিতে তোমায় বল্‌ছি। অদিনে তোমার যা' হ'ক্‌ এতটুকুও উপকারে এসেছি, তুমিও না জেনে তার খুব বড় প্রতিদানই দিয়েছ, তবুও আরও একটু কষ্ট তোমায় স্বীকার কর্‌তেই হবে; লোকের আশা পূরণে বাড়ে বই কমে না। কতখানি আশা তুমি আমার—সোনালী হঠাৎ থামিয়া গেল।

সোনালীর আর্থিক অবস্থা ইতিমধ্যে যে এরূপ হইয়াছে,

মোহিত তাহা জানিত না, সে বুঝিল ইহার জন্য সে-ই কতক পরিমাণে দায়ী, মনে মনে একটু অনুতাপ হইল। সোনালীর নিজেরও যে একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই বটে, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধানে মাথা ঘামান সে কোনও দরকার মনে করে নাই। তাহার প্রতি সোনালীর এই কেমন কেমন ভাবটা মোহিত অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল, মনে করিয়াছিল, এটা বোধ হয় তাহাদের জাতিগত লালসারই অভিব্যক্তি। আজ মোহিত দেখিল এটা শুধু লালসাই নহে, জল অনেক দূরেই গড়াইয়াছে, সোনালী সত্যই বুঝি তাহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে! তবে? বেচারী ত বড়ই আঘাত পাইবে! একটা করুণায় সোনালীর প্রতি মোহিতের বিদ্বেষ ভাব অনেকখানি দ্রব করিয়া দিল।

মোহিত চিন্তিত ভাবে বলিল—আমার নিজের অবস্থাত তোমার কিছু অগোচর নেই, আমার দশাও ত কতকটা তোমারই অনুরূপ; আমি কি করতে পারি? অবশ্য সাধ্যে যতটা কুলোয় আমি চেষ্টা কর্‌ব। মনে করেছিলুম্, কালই আমি যা'ব, তা না হয় দু'দিন পরেই যা'ব। দেখ্‌ছি আমার জন্যে তুমি সকল রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, এ ধার শুধতে চেষ্টা কর্‌বো।

সোনালী বলিল—ভবিষ্যতের উপায় কিছু ক'রে দিতে না পার, আর কাজ ক'টা কর্ত্তে পার' ত। তারপর আমার বরাতে যা' আছে তাই হবে। শুনেছি, সুপুরী কেটে দিয়ে, ঠোঙা বানিয়েও অনেকের দুবেলা দু'টো ভাত জোটে। যুদ্ধের দরুণ কাপড় মাগ্যি হওয়ায়, শুন্‌ছি লোকে আবার চরকার আদর কর্‌ছে।

তা চেষ্টা করলে, সুতো কেটেও আমার পেট চল্‌বে। আর, টাকার কথা বলছ', কত টাকা দিয়ে তুমি আমার ক্ষতি পূরণ করবে মনে করেছ' শুনি? তুমি পৃথিবীর সব টাকা এক সঙ্গে এনে দিলেও আমি তার এক কড়িও স্পর্শ করবো না! সে দিন রাগের মাথায় এই টাকা শোধের কথাই কি যেন তোমায় বলেছিলুম্, দেখ্‌ছি এখনও তুমি সেটা মনে ক'রে রেখেছ'। কিন্তু কি জ্বালায় পাগল হ'য়ে সেদিন তোমাকে অত বড় অপমান করেছিলুম্, তা যদি জানতে তুমি! নিষ্ঠুর, তুমি ত বুঝ্‌বে না, টাকা দিয়ে কি প্রাণের খিদে মেটান' যায়?

ব্যাপার আবার কোন্‌দিকে গড়াইতেছে বুঝিয়া, মোহিত অস্বস্তি অনুভব করিল। সোনালীকে অন্যমনস্ক করিবার আশায় সে বলিল—খাটের নীচে ওটা কি? হারমোনিয়মের বাক্‌সো নাকি? দেখি।

বাহিরে তখন জোর বৃষ্টি আসিয়াছে। সহরের কোলাহল ছাপাইয়া শুধু বৃষ্টি পড়ার ঝম্‌ঝম্ শব্দ হইতেছে। সোনালী বাক্‌সো বাহির করিয়া অনেক দিনের সঞ্চিত ধূলা ঝাড়িতেছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া মোহিতের মনটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল।

সোনালী নীরবে হারমোনিয়মটি বাহির করিয়া মোহিতের সম্মুখে রাখিতে মোহিত হাসিয়া বলিল—আমি কি বাজাতে জানি?

মোহিতের সহাস্য মুখ দেখিয়া সোনালী সাহস পাইয়া বলিল—আমি বাজা'ব, শুনবে তুমি?

শেষ কথাটায় যেন একটু অভিমান বাজিয়া উঠিল, মোহিত অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—ক্ষতি কি?

সোনালী হারমোনিয়মটি তুলিয়া লইয়া কতক্ষণ এটা ওটা বাজাইল। খোলা দ্বারের ভিতর দিয়া তাহার দৃষ্টি বর্দ্ধমান, উদাস আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অভ্যস্ত আঙ্গুলগুলি, না দেখিয়াই ঠিক্ পর্দ্দায় সরিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সোনালীর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়া মোহিতের মুখের উপর পড়িল, আবার ফিরিয়া বাহিরের শূন্যে গিয়া মিশিল। সোনালী গান ধরিল—

নয়নের বারি নয়নে রেখেছি,
হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
শুকায়ে গিয়াছে প্রাণের হরষ,
শুকায়ে গিয়েছে মালা।

* * *

'হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা'—গাহিতে গাহিতে সত্যই বুঝি কিসের জ্বালায় সোনালীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, 'নয়নের বারি' আর সে গোপনে রাখিতে পারিল না, আপনা হইতেই তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠে বিষাদ ব্যথা মূর্ত্তিমতি হইয়া কাঁদিতে লাগিল—'ভেঙ্গে গেছে বুক ভেঙ্গেছে পরাণ'।—বাহিরেও তখন ঝরঝর বৃষ্টি ঝরিতেছে। সোনালী বার বার গাহিতে লাগিল—'ভাঙ্গা হৃদয়ের যাতনা লও'—তাহার প্রাণের যাতনা বুঝি কাঁদিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, তাই সোনালী এমন করিয়া মেঘ-ভরা আকাশে, সজল বাতাসে ও সন্ধ্যার শূন্যতায় ব্যথা নিবেদন করিতেছিল—ভাঙ্গা হৃদয়ের যাতনা লও।

মোহিত স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল—মানুষের স্বর এত করুণ হয়! একি কণ্ঠ-সৌন্দর্য্য! মুগ্ধ হৃদয়ে মোহিত চাহিয়া দেখিল, সোনালী এত সুন্দর! এমন রূপ ত সে কোথাও দেখে নাই, এমন সজীব সঙ্গীতও ত মোহিত কখনও শুনে নাই! ইন্দুও ত খুবই সুন্দরী, কিন্তু এত সৌন্দর্য্য বুঝি পৃথিবীর আর কাহারও নাই।—মোহিতের শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। নিজের দুর্ব্বলতায় ভয় পাইয়া মোহিতের ইচ্ছা হইতে লাগিল উঠিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সহসা গীত থামিল, আশ্বস্ত ভাবে মোহিত নিশ্বাস লইল। কিন্তু একি! আবার যে—

সোনালী আবার গান ধরিল। এবার আরও তরলকণ্ঠে ক্ষুধাতুর প্রাণে সোনালী গাহিতে লাগিল। সভয়ে মোহিত দেখিল সোনালীর অশ্রু-সরস বুভুক্ষু দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর নিবদ্ধ।

সোনালী গাহিতেছিল—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন বিহারী।

ভাগ্য-নিরূপিতা

• • •

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম জীবন মরণ বিহারী।

বাহিরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল। মেঘের আঁধারে সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া চারিদিকে এক উদাস গাম্ভীর্য্য ছড়াইতেছিল। তখনও দরদর ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণবক্ষ মেঘগুলি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ঘরের ভিতরে মদির সুরলহরী অধীর তানে রোদন করিতেছিল—'তুমি আমারি যে তুমি আমারি, ওগো জীবন মরণ বিহারি, তুমি আমারি তুমি আমারি।' গায়িকার দেহের প্রতি লোমকূপ পিপাসায় আকুল আহ্বানে কাঁদিতে লাগিল—ওগো তুমি আমারি তুমি আমারি'—ঘরের রুদ্ধ বায়ুও গুম্‌রাইতে লাগিল—তুমি আমারি ওগো তুমি আমারি—আমারি—ই—

মোহিতের দেহ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, সর্পের দৃষ্টিতে স্তব্ধগতি ভেকের ন্যায়, তাহার নড়িবার শক্তি রহিত হইয়া গেল। নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে সে বসিয়াই রহিল। ক্রমে, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যেমন করিয়া, স্মৃতি, চিন্তা, ভয়, লজ্জা, একে একে চলিয়া গিয়া সারা অন্তরখানি একটা স্থির শূন্যতায় ভরিয়া উঠে, তেমন করিয়াই, ধীরে ধীরে মোহিতের জ্ঞান লোপ হইতে লাগিল, সে যেন আপনাকেই ভুলিয়া যাইতেছিল। ইন্দু যেন কতকাল পূর্ব্বে

স্বপ্ন-দৃষ্টা মূর্ত্তির ন্যায় কোথায় সরিয়া যাইতেছে। মোহিতের মনে হইতে লাগিল, ইন্দু যেন কত দূরে, কোন্ যুগের ছায়াময়ী মূর্ত্তি, বুঝি শুধু তাহার কল্পনারই সৃষ্টি! জগতে যেন আর কেহ নাই, কিছু নাই, আছে শুধু ঐ করুণ মধুর সুরের উৎস, প্রেমময়ী সোনালী,—আর এই পথশ্রান্ত, চির-তৃষিত মোহিত।—

"মম জীবন মরণ বিহারি, তুমি আমারি তুমি আমারি"—কই এমন করিয়া আর কেহ ত তাহাকে চাহে নাই। একি চাওয়া! এ চাওয়া ব্যর্থ করিবার শক্তি বুঝি দেবতাদেরও নাই।

মোহিতের দুর্ব্বল শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, প্রাণ যেন তাহার ডাক্ ছাড়িয়া বলিতে চাহিল—ওগো আমি তোমারি, আমি তোমারি! স্বর না পাইয়া প্রাণের কথা বুঝি দৃষ্টিতেই ফুটিয়া উঠিল।

সোনালী হারমোনিয়ম ফেলিয়া মোহিতের পায়ের কাছে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া, সজল ভিখারী আঁখি দু'টি উঁচু করিয়া গাহিতেছিল—

'মম জীবন মরণ বিহারি তুমি আমারি ওগো তুমি আমারি।'

গাহিতে গাহিতে সোনলী সহসা মোহিতের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, দৃঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার রক্তশূন্য শুষ্ক মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া দিল—

ওগো আমি তোমারি, আমি তোমারি,
তুমি আমারি, আমারি—

---

(২৫)

পরিবারে, অন্তর্জগতে সম্প্রতি কতখানি ঝড় ঝাপটা বহিতেছিল সে খবর রাজাবাবু কিছুই রাখিতেন না। দেবেনের পরামর্শ অনুযায়ী একদিন তিনি হঠাৎ সারদাকে বলিলেন—কল্‌কাতায় ইন্দুর বে'র কথা হচ্ছে, অনেক দিন থেকেই তারা লেখা লেখি কচ্ছে। আগেকার জানা শুনো ঘর, খুব বড়লোক তা'রা। মেয়ে দেখ্‌তে তা'রা এখানে আস্‌তে পার্‌বে না, কল্‌কাতায় গিয়ে মেয়ে দেখাতে হবে, খরচ খরচা সবই তা'রা দিচ্ছে, যাবার খরচ ব'লে আজই একশো টাকা পাঠিয়েছে। মেয়েও ত চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়্‌তে চল্‌লো।

সারদা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে এ সব কথা ত তিনি কিছুই শুনেন নাই? সত্য বটে, আজ কাল স্বামীর নামে প্রায়ই খামে চিঠি আসিতেছিল, এই মাত্র ত স্বচক্ষেই একশত টাকার নোটখানি দেখিলেন।

রাজাবাবু আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—যত শীগ্‌গীর হয়, ২।১ দিনের মধ্যেই সব গোছ গাছ ক'রে নাও। আর সেখানে বে'ই যদি হয়, তা হলে এখন অনেক দিনই ত সেখানে থাকতে হবে। জিনিষ পত্তর, বাসন কোসন যা' আছে সবই ত নিয়ে যেতে হবে।

সারদা এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—স্বামী বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বলিলেন—সব কথা দাদাকে বলা হয়েছে? তিনি কি যেতে বল্লেন? আগেই টাকাটা হাতে নেওয়া—

রাজালাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—আমি কি তোমার দাদার কেনা চাকর, 'দাদাকে' জিজ্ঞেস না কর্‌লে চল্‌বে না? কই 'দাদা এদ্দিন পনেরো বছুরে মেয়ের বে 'দিয়ে দেয় নি? আমি অত দাদা টাদার তোয়াক্কা রাখিনে, আস্‌ছে বুধে দিন আছে, ইন্দুকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাবো, ইচ্ছে হয় সঙ্গে যাবে, না হয় দাদার ব'ন হ'য়ে এখানে চিরজন্ম দাসীবিত্তি কর্‌বে।

রাজাবাবু সশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি বড়ই চটিয়া ছিলেন, কারণ এই দাদার পরামর্শ লইতে যাওয়া আর এই খানেই সব খতম্ করা যে এক কথা তাহা তিনি ভালই বুঝিয়াছিলেন। তাই না তিনি দাদার ভগিনীকেও সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না? দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কথাটা তিনি এখানেই রফা করিয়া গেলেন।

ইন্দু নিকটেই ছিল, সেও সব কথাই শুনিল। সারদা দেখিলেন ইন্দু কানেই শুনিল, মুখে তাহার ভাল মন্দ এতটুকু পরিবর্ত্তন হইল না।

সারদা বুঝিলেন, স্বামী এবার একটা অনর্থ না ঘটাইয়া ছাড়িবেন না, কোথায়, কাহার নিকট হইতে, ইহারই মধ্যে টাকা লওয়া হইয়া গিয়াছে, কথা দেওয়া হইয়াছে, কেহ কিছু জানিল না, তিনি কিছুই শুনিলেন না, দাদাকেও কোন কথা বলা হইল না! স্বামীর প্রকৃতি সারদা ভালরূপই জানিতেন, তাঁহাকে নিরস্ত করার চেষ্টা বিফল। সারদা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পরদিন পিয়ারী বাবুর সহিত দেখা করিলেন। দুই দিকই বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করিয়া তিনি দাদাকে এই বিবাহ প্রস্তাবের কথা বলিয়া

কলিকাতায় যাইবার অনুমতি লইলেন! অবশ্য তিনি বুঝিয়াই আসিলেন, দাদা মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

তাহার পর গোছ গাছের তাড়া পড়িয়া গেল। ঠিক হইল শচী ও মেজ' খোকা এখন মামার বাড়ীতেই থাকিবে, পরে বিবাহের দিন স্থির হইলে তাহারা কলিকাতায় যাইবে।

এই গোছ-গাছ ব্যাপারে ইন্দুও যথা কর্ত্তব্য সাহায্য করিতে লাগিল, কোনও ঔৎসুক্য বা বিরাগ ভাব দেখাইল না। সারদা ভাবিলেন মেয়ে বুঝি একটু সামলাইয়াছে।

ইহার ছয় দিন পরে সকাল বেলা গাড়ী যখন হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিল, সারদা দেখিলেন, দেবেন ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছে। অমনি কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি এই বিবাহের সঙ্গে দেবেন রায় কোনও রকমে সংশ্লিষ্ট নাকি? তাঁহার মনে হইল, দেবেন যেন বার বার প্রশংসমান দৃষ্টিতে ইন্দুর ভাবহীন শুষ্ক মুখের দিকে চাহিতেছে।

দেবেনের তত্ত্বাবধানে, ঘোড়ার গাড়ী, ছোট রেল গাড়ী ও অবশেষে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বেলা দেড়টার সময় রাজাবাবু সপরিবারে বিষ্টুপুরে বাগান-ঘেরা, চুণ-বালি-খসা, ছোট একখানি একতালা বাড়ীর সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দেবেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সারদা দেখিলেন সম্প্রতি ভিতরটায় এক পোঁচ করিয়া কলি দেওয়া হইয়াছে, ছাতাধরা সুর্‌কীর মেঝের উপর জায়গায় জায়গায় নূতন চুণের দাগ লাগিয়া আছে। আর অধিক কিছু লক্ষ্য করিবার মত তাঁহার তখন দেহের বা মনের

অবস্থা ছিল না। একটা ঘরের মেঝে, আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া তিনি কাৎ হইলেন। পিতার আদেশে, ইন্দু কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দেবেনের নির্দ্দেশমত আহারাদির যোগাড়ে ব্যাপৃতা হইল। সব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়া দেবেন কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইল। রাজা-বাবু বাড়ী পৌঁছাইয়াই বেশ করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া একটা বিছানার মোটের উপর বসিয়া নিরুদ্বেগে তামাকু সেবনে মন দিয়াছিলেন। এই বাড়ী ঘর, অত বড় বাগান সবই ত এখন হইতে তাঁহার নিজের হইল—স্ফূর্ত্তিতে রাজাবাবুর ট্রেণের কষ্ট ক্ষুধাতৃষ্ণা আর কিছুই মনে রহিল না।

সারদা আসিয়াই সেই যে শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মধ্যে একবার মাত্র উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া দু'টা দাঁতে কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পর সমস্ত দিনের মধ্যে তিনি আর উঠিলেন না। ট্রেণের কষ্টে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছিল, প্রাণটাও যেন কেমন ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সমস্তই অগোছান পড়িয়া রহিল, তিনি সেইখানে সেই শূন্য মেঝেতেই চোখ বুঁজাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

ইন্দু সব কাজ কর্ম্ম এক রকম সারিয়া আসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—দুপরের রৌদ্র কেমন করিয়া নধর সবুজ গাছপালা গুলি পুড়াইয়া বিশীর্ণ করিতেছিল।

পরদিন বৈকালে সাড়ে তিনটা চারিটার সময় দেবেন একজন ব্রাহ্মণ ও একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল। রাজাবাবু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন—ওগো, এঁরা যে সব এসে পড়েছেন, পাঁচটার মধ্যেই আশীর্ব্বাদের সময়। ইন্দুকে শীগ্‌গীর একখানা ফর্সা কাপড় পরিয়ে

যাও, ওরে ও ট্যাম্‌টেমী খপ্‌ ক'রে ও' উঠোন্‌ থেকে দু'টো দূর্ব্বো তুলে নিয়ে আয়, আর একটু চন্নন্‌ টন্নন যোগাড় করতে পারিস্‌ কি দ্যাখ্‌ দিকি।—মহা ব্যস্তভাবে আবার তিনি বাহিরে ছুটিলেন।

সারদা কতক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি ধারণাও করেন নাই, এত তাড়াতাড়ি বিবাহের একটা পাকা-পাকি হইতে পারে। বরপক্ষ এখনও পাত্রী দেখেন নাই, পাত্রটি কেমন কি বৃত্তান্ত তাহাও তিনি কিছুই জানিলেন না, আচম্‌কা এমন করিয়া কিরূপে কন্যা আশীর্ব্বাদ হইতে পারে? সারদা মনে করিয়াছিলেন, সকলেরই যেমন হইয়া থাকে ইন্দুর বিবাহেও তেমনই কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান চলিবে, পাত্র-পাত্রী দেখা-দেখি হইবে, এখনও বিবাহের অনেক দেরী। কিন্তু এখানে আসিবার পরদিনই রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে যখন শুনিলেন, এখনি এই দণ্ডেই ইন্দুর পাকা দেখা হইবে, একটা আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চিরটা কাল হাড়ে নাড়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া সারদা স্বামীর বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া আসিতেছিলেন, তিনি ভাবিলেন হয়ত বা স্বামী জাতি-কুল হানি করিয়া কিম্বা অপাত্রে কুপাত্রে, কন্যাদানে উদ্যত হইয়াছেন, নতুবা আজ কালকার দিনে কোন্‌ সৎপাত্র আবার, অর্থ সামর্থহীন দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে এতখানি উদ্‌গ্রীব হইবে? কিন্তু সৎপাত্রই হউক আর কুপাত্রই হউক এখন ত ভদ্রলোকেদের বাড়ী ডাকিয়া আনা হইয়াছে, এখন তিনি কি করিবেন? স্বামীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বা বলিতে যাওয়া শুভজনক হইবে না, হয়ত তিনি চীৎকার করিয়া এখনই একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবেন, এ অভিজ্ঞতা ত সারদার

খুবই ছিল। এদিকে কন্যার মনের অবস্থাও তাঁহার অগোচর ছিল না, সেও যে হঠাৎ এমন করিয়া হাঁড়ি কাঠের মধ্যে মাথা গলাইতে একটুও প্রতিবাদ করিবে না, সে বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না।

মনে একরাশ আশঙ্কা লইয়া তিনি চিন্তিতভাবে ইন্দুর খোঁজে চলিলেন, সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া অবশেষে ছাদের এক কোণে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া, সারদা ধপাস্ করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—আর ত আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে।

এই রৌদ্রের মাঝে ইন্দু ছাদে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিল, সেই জানে, মায়ের কথায় তাহার যেন যোগভঙ্গ হইল। গ্রামের বাহিরের রৌদ্রতপ্ত সীমাহীন প্রান্তর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া সে মায়ের মুখের উপর স্থাপন করিল।

মা আবার বলিলেন—কিছুই বুঝ্‌বেন্ না সুঝবেন্ না, বলা নে-ই, কথা নেই, কোথার কোন্ ভদ্রলোকদের মেয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে ডেকে এনেছেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আয় দু'জনে এই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি, তুইও মর্ আমিও মরি, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাক্।

চির-সহিষ্ণুশীলা মা আজ কতখানি উত্যক্ত হইয়া এমন কথা বলিতেছেন তাহা বুঝি ইন্দু মুহূর্ত্তেই বুঝিল, সে বলিল—নীচে চল মা, বাবা হয়ত এখনি বকাবকি আরম্ভ কর্‌বেন।

ইন্দু আগে আগে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল, যন্ত্র চালিতার ন্যায় মাও তাহার অনুসরণ করিলেন। নীচে আসিয়া সারদা নীরবে ইন্দুকে একখানি ফর্সা কাপড় পরাইয়া তাহার এলো চুলগুলি

একটু আঁচড়াইয়া দিয়া ভিজা গামছায় তাহার ভাবহীন মুখখানি মুছাইয়া দিলেন।

যথাবিহিত ইন্দুর আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। বিবাহের দিন ধার্য্য হইল, আগামী ১২ তারিখে।

রাত্রেও রাজাবাবু আপনা হইতে বিবাহের কোন কথাই তুলিলেন না। এমন করিয়া এই অনিশ্চয়ের বোঝা সারদা আর নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না, হঠাৎ মুখ খুলিলেন—মনে মনে তুমি কি মতলব এঁটেছ' বল দেখি, মেয়ের বি'য়ে দিচ্ছ', পাকা দেখা হ'য়ে গেল, এখনও কেউ জানতে পার্ল্লে না, ছেলে কে, কোথায় তা'র বাড়ী ঘর, কি বিত্তান্ত।

রাজাবাবু প্রথমেই খুব এক চোট হাসিয়া লইলেন, তাহার পর হাসিতে হাসিতে কাশিতে কাশিতে বলিলেন—সব খোঁজ খবর না নিয়েই কি আমি অম্নি অম্নিই মেয়ের বে' দিচ্ছি, তেম্নিই কাঁচা ছেলে পেলে আমায়? ইন্দুর নাকি কপালভাঙ্গা, হিঃ হিঃ! খুব কপাল জোর না হলে আপনা থেকেই এমন ঘর বর জোটে কিনা! ওঃ কতবড় লোক একটা সে, কি প্রকাণ্ড বাড়ীখানা তার, কত টাকার মালিক সে। ভালয় ভালয় একবার বে'টা হ'য়ে যাক্ তখন দেখো মেয়ের তোমার কতখানি বরাৎ জোর। তখন বলো।

ইহার পর আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার সারদার প্রবৃত্তি রহিল না। রাজালালও নাক ডাকাইতে সুরু করিলেন।

কন্যার আজিকার ব্যবহারে সারদার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইতে লাগিল, হয়ত ইন্দু কি একটা মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছে!

সতর্ক মনোযোগের সহিত তিনি কন্যাকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজাবাবু পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। তখনও সারদা পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী কিছুই জানিতে পারিলেন না। এমন ভাবেই আরও দুই দিন কাটিয়া গেল, বিবাহের আর মাত্র চারিদিন দেরী। এমন সময় হঠাৎ সেজ খোকার অসুখ করিল।

(২৬)

সে দিন দেবেনের সঙ্গে যাইতে যাইতে দাশু অনেক নূতন খবর শুনিল। তাহার দেবু ভাইয়ের আবার বিবাহ, মাঝে আর মোটে সাত দিন বাকী, এরই মধ্যে দেশের বাড়ী-ঘর পরিস্কার ঝরিস্কার করিতে হইবে, সব যোগাড় যন্ত্র করিতে হইবে। অনেক ঝঞ্ঝাটে দেবেনকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, টাকা যোগাড়ের জন্য একবার হাড়োয়া কাছারীতে গিয়া বিশ পঁচিশ দিন থাকিতে হইয়াছিল। 'মেয়েদের' থাকিবার জন্য ও' পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীখানা ঠিক করিতেও তাহাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, অবশেষে অনেক চেষ্টায় সে আড়াই হাজার টাকায় বাড়ী খানি একেবারে কিনিয়া লইয়াছে। তাহার ভাবী শ্বশুর সপরিবারে এখন বরাবর ওখানেই বাস করিবেন। অনেকদিন আগেই তাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু ক'নের বুঝি জ্বর না কি হইয়াছিল তাই তাঁহাদের আসিতে বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে, এই ত সবে দিন চারেক হইল তাঁরা আসিয়া ও' বাড়িতে উঠিয়াছেন।

দাশু ভাবিল, টাকার লোভে পড়িয়া কোন্ হতভাগা আবার এমন পাত্রে মেয়ে দিতেছে? তা' হউক তাহার দেবু-ভাই ত সংসারী,

হইবে, ঘরের বিষয় ঘরেই থাকিবে, তা'রও আবার একটি নূতন দিদিবাবু আসিবে। ছ্যাঁৎ করিয়া দাশুর মনে পড়িল তাহার প্রথম দিদিবাবুর কথা, মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু দাশু নিজের মনকে বুঝাইল, তিনি ত সব কথা জানিয়া শুনিয়াও ফিরিয়া আসিলেন না, তবে আর কি হইবে, অন্য উপায় কি ?

বাড়ী পৌঁছিয়াই দাশু যেমন তেমন একটা উপলক্ষ্য করিয়া 'ও'বাড়ীতে তাহার ভাবী দিদিবাবুকে দেখিতে যাইতেছিল, দেবেন ডাকিয়া বলিয়া দিল, সেখানে যেন সে বিবাহের কোন কথাই না তুলে। দাশু বিস্মিত ভাবে যাইতে যাইতে ভাবিল, এর কারণ কি ? সেখানে গিয়া সে তাহার 'হবু' দিদিবাবুকে দেখিয়া ও তাঁহার মা'য়ের কথা বার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইল। ইহার পর ছুতায় নাতায় সে আরও কয়েক বার ওবাড়ী যতায়াত করিল। তৃতীয় দিনে দেবেন আবার কলিকাতায় গেল—গহনা ও অন্যান্য জিনিষ পত্র আনিতে হইবে, উকীল বাড়ী যাইতে হইবে। সে বলিয়া গেল পরদিন বৈকালের পূর্ব্বে খুব সম্ভব ফিরিতে পারিবে না।

সন্ধ্যা জ্বালিয়া দাশু, এক রাশ্ কাচা ওয়াড় লইয়া বালিশ বিছানায় পরাইতেছিল। বাহিরে কে ডাকিল—বাবাজী বাড়ী আছ, বাবাজি ?—তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দাশু দেখিল, দেবু ভাইয়ের ভাবী শ্বশুর মহাশয়। নমস্কার করিয়া দাশু বলিল—তিনি ত দুপরের ট্রেণে কল্‌কাতায় গেছেন।

—তা ত জানুতুম্। সেজ' ছেলেটার কাল একটু জ্বর-ভাব হয়েছিল, এই কতক্ষণ হ'ল আজ আবার ভয়ানক জ্বর এসেছে, বড় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। এখানকার ডাক্তার কব্‌রেজ কা'কেও ত

জানিনে। তুমি যদি বাবা, একটা ডাক্তার ডেকে দিতে, বুড়ো মানুষ আমি কোথায় ঘুরে বেড়া'ব ?

—আজ্ঞে বেশ ত, আমি ছুটে ঘোষাল মশায়কে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি, চাকরকে আজ্ঞা ক'রে পাঠালেই হ'ত কষ্ট ক'রে এতটা আসবার দরকার ছিল না।

—কা'কে দিয়ে আর খবর পাঠাই ব'ল, তাই নিজেই এলুম। তামাক টামাকের যোগাড় আছে, না ওসব পাট্ কিছু নেই ? তা' থাক্ বাড়ী ফিরেই হবে'খন।

ঘণ্টা খানেক পরে গ্রামের একমাত্র ডাক্তার ঘোষাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া দাশু রাজাবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল।

দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—আজ আর ওষুধ দিয়ে কাজ নেই, চুপ চাপ শুয়ে থাকৃতে দিন্—কথা বলিতে বলিতে তিনি রাজা বাবুর সহিত বাহিরে গেলেন। আলো লইয়া তাঁহার চাকরও আসিয়াছিল, সুতরাং দাশুকে সঙ্গে যাইতে হইবে না, সে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার আসিতে, ইন্দু উঠিয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন খোকার কাছে সরিয়া আসিল। ডাক্তার-বাবু কি বলিয়া গেলেন শুনিবার জন্য সারদাও ঘরে ঢুকিলেন। মিনিট দুই পরে, ডাক্তার বাবুকে বাহিরে পৌছাইয়া রাজাবাবু ফিরিয়া আসিলেন, পত্নিকে দেখিয়া বলিলেন—মুস্কিল দেখ একবার এমন সময়েও ছোঁড়া অসুখ বাঁধিয়ে বস্‌লো! ডাক্তার ত ব'লে গেলেন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, এখন সারৃতে ক'দিন লাগে তার ঠিক্ কি ?

দাশু চিন্তিত ভাবে বলিল—তাইত বড় মুস্কিলেরই কথা! ইন্‌ফেঞ্জা, না কি, জরের নাম কর্ল্লেন না ? তা ও জর ভারী

বদ্ জ্বর, দু'চার দিনে ত সারেই না, মোহিত দাদাবাবু কি ভোগান-টাই ভুগ্‌লেন্ পনেরো দিন এক ভাবে বেহুঁস হ'য়েই পড়ে রইলেন। সে যাত্রা ত আর বাঁচবার আশাই ছিল না। তবে না, সোনাই-দিদি রাতে দিনে এক ক'রে, জলের মত পয়সা ঢেলে তাঁ'কে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন।

মোহিত দাদাবাবু!—ইন্দু উৎকর্ণ হইয়া দাশুর কথা শুনিল। সারদা কৌতূহলের সহিত প্রশ্ন করিলেন—কোন্ মোহিতের কথা ব'ল্‌ছো?

দাশু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কানপুরের মোহিতবাবু। সে দিন কোত্থেকে জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এসে, আমাদের পটল ডেঙ্গার বাসায় উপস্থিত হ'লেন। দেবুভাই বাসায় ছিল না, আমরা ত বড়ই মুস্কিলে পড়লুম্। শেষ-পরে সোনাই দিদি কি সেবাটাই ক'র্‌লে! এক রকম সেরেই উঠেছেন দেখে এসেছি। তাই ত ব'ল্‌ছিলুম্ ও' লড়ায়ে জ্বর ভারী পাজী জ্বর, একেবারে হেস্ত নেস্ত ক'রে তবে ছাড়ে।

দাশু লক্ষ্য করিল না তাহার ভাবী দিদিবাবু, কিরূপ ক্ষুধিত ভাবে তাহার কথাগুলি গিলিতেছিলেন। সারদাও বিস্ময়ে, কৌতূহলে কেমন আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মোহিতের খবরে এখন আর তাঁহার কোন স্বার্থই ছিল না, তবুও পূর্ব্ব স্নেহের বশে তিনি দাশুকে তাহার বিষয় আরও ২।৪টি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এতক্ষণে দাশুর হুঁস হইল তাইত, খুঁটী নাটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? এ সব কথা বলিয়া হয়ত সে ভাল কাজ করিতেছে না, দেবুভাই হয়ত

রাগ করিবে। সত্যই ত, বুড়া হইয়া সে মরিতে চলিল, এখনও এটুকু তাহার বুদ্ধিতে আসিল না যে, ইঁহারা যদি খবর পা'ন্ সোনালীটা কে, দেবুভায়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটাই বা কি ছিল, তাহা হইলে ত বড়ই একটা গোল বাঁধিবে। দাশু এবার সতর্ক হইল, সোনালীর আসল পরিচয়,—সে কে, দেবেনের সহিত তাহার কি সংশ্রব সে সব কথা চাপা দিয়া, মোহিতের পটল ডাঙ্গার বাসায় আসার পর হইতে দাশুর বিদায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্য অনেক কথাই বলিল।

শুনিতে শুনিতে সারদা ইন্দুর শঙ্কিত চঞ্চল ভাব লক্ষ্য করিলেন। পাছে মেয়েটি এই বাহিরের লোকের সাম্‌নেই কোনও কিছু বলিয়া বা করিয়া বসে, এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি দাশুকে বলিলেন—বুড়ো মানুষ, মিছেমিছি আর তোমায় রাত ক'রাব না, গিয়ে এখনও ত তোমায় যা'হক দুটো পাক্ শাক্ কর্‌তে হবে।—দাশু বিদায় লইয়া বাহিরে গেল। রাজাবাবু তামাকের চেষ্টায় বহু পূর্ব্বেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

(২৭)

গত কয়েক মাস হইতে সারদার প্রাণে একটুও শান্তি ছিল না, নানা অপ্রীতিকর সংবাদে ও ঘটনায় তাঁহার দিন গুলি বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে দিন সেই গঙ্গার ঘাটে যখন তিনি বিধুর নিকট শুনিয়া আসিয়াছিলেন—পিয়ারী বাবু মোহিতের সহিত নিজ কন্যা, স্নেহের বিবাহ দিতে কৃত-সঙ্কল্প, তখনই তাঁহার মন অনেকখানিই দমিয়া গিয়াছিল। এ সংবাদ যে ইন্দুর বুকে এক

দিন কতখানি বাজিবে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কানপুর ত্যাগের পূর্ব্বে মোহিত বিদায় লইতে আসিলে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ইন্দুর সহিত একান্তে দেখা করিতে দিলেন না। ইন্দুর বিশ্বস্ত হৃদয়ে একদিন ত দারুণ আঘাত পড়িবেই, তবে আর জানিয়া শুনিয়াই সে আঘাতের গুরুত্ব বাড়িতে দিয়া ফল কি? মোহিত চলিয়া গেল, যাইবার সময় ইন্দুকে একটি কথাও বলিয়া গেল না, ইন্দুর প্রাণেও বড় অভিমান হইল। তখন ত বেচারা জানে না তাঁহার এ অভিমান কতখানি অশোভন হইতেছিল। বিধুর রসনা প্রসাদাৎ শীঘ্রই সকলে শুনিল, মোহিত—এই "রাধুনীর পুত্তুর" মোহিত, পিয়ারী ডাক্তারের কন্যা, স্নেহের ভবিষ্যৎ স্বামী।

ইন্দুও একদিন শুনিল। ইন্দু বরাবরই চিন্তাশীল, সে বড় চাপা মেয়ে। এমন করিয়া হঠাৎ তাহার আবাল্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, হৃদয়ও ভাঙ্গিল, কিন্তু সে খবর বাহিরের কেহ জানিল না। তবে সারদা বুঝিলেন, তাঁহার স্বল্পভাষী কন্যার বুকে কতখানি ব্যথা জমাট বাঁধিয়া উঠিল। দিন দিন ইন্দুর শরীর কেমন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল, মধ্যে দিন কতকের জন্য একবার অসুখও হইল। মামা দেখিয়া বলিলেন, ও কিছু নয়, বদ্‌হজম আর অনিদ্রার জন্য দুর্ব্বলতা মাত্র, আপন হইতেই সারিয়া যাইবে। কিছু নহে বটে, কিন্তু ইন্দুর প্রাণে তখন কত বড় একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এক তাহার অন্তরাত্মাই জানিলেন, আর একটু একটু জানিলেন তাহার মা। কিন্তু মা'য়ের ত করিবার কিছুই ছিল না, এতটুকু আশার প্রলেপে কন্যার হৃদয়ের ক্ষত ঢাকা দিবারও কোন সম্বলই ত তাঁহার ছিল না। একবার তাঁহার মনে হইয়া-

ছিল—দাদাকে সব কথা খুলিয়া বলি, মোহিতকে তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিয়া লই, তাঁহার ত আরও অনেক সুপাত্র জুটিবে। কিন্তু তখনই সারদার মনে পড়িল, তবে কি তিনি নিজের স্বার্থের জন্য মোহিতের সৌভাগ্যে অন্তরায় হইবেন? আর স্নেহ, সেও ত চির দিন মোহিতের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মনের কথা ত তিনি কিছুই জানেন না, নিজের কন্যাকে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য তবে কি তিনি আর এক জনকে সেই দুঃখেই নিক্ষেপ করিবেন?—অমনি সারদা সভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া মাতৃহৃদয়কে নিরস্ত করিলেন।

দু' কথায় বলা গেল বটে আঘাতটা ইন্দুর বড়ই বাজিল, কিন্তু এই 'বড়ই' যে কতখানি বড়, তাহা ত সহজে প্রকাশ করা যায় না। আঘাতে তাহার হৃদয় কতখানি ফাটিল, কতখানি ছিঁড়িল, কতটাই বা রক্ত ক্ষরিল, তাহা ত আর কথায় বলিবার জিনিষ নহে, সে ত শুধু হৃদয় দিয়াই অনুভব করিবার বিষয়। ইন্দুর নবীন জীবন, তরুণ ভরসায় সফল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, সহসা ঝড় উঠিল, বাজ পড়িল, তাহার ফোটা আর হইল না। মন জোর করিয়া আশা করিতে চাহিল,—হায় যদি একবার সে মোহিতের দেখা পাইত! নিরাশা অমনি কাঁদিয়া উঠিল—বৃথা আত্ম-প্রবঞ্চনা! আশা নাই, আশা নাই!—নিরাশার চাপে ইন্দুর বালিকা হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তারপর শুকাইয়া শুকাইয়া সত্যই বুঝি তাহার প্রাণ এক দিন ভস্ম হইয়া গেল, নিজের ইচ্ছা বা জীবনের সাধ বলিতে আর তাহার কিছুই রহিল না, বাতাসে ভস্ম উড়াইয়া যেখানেই লইয়া যাউক, ইন্দুর আর কোন

গ্রাহ্য রহিল না। আশা গেল, প্রাণ ফাটিল, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহটা গেল না, কাজেই ইন্দুকে আবার উঠিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইল।

অপ্রত্যাশিতভাবে দাশুর মুখে মোহিতের সংবাদ শুনিয়া, এতদিন পরে ইন্দুর প্রাণহীন দেহে আজ একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। সমস্ত রাত্রি তাহার ছট্‌ফট্ করিয়াই কাটিল। পরদিনও সারদা লক্ষ্য করিলেন, কন্যা কেমন যেন অস্থির উৎকণ্ঠায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার ভয় হইল আবার বুঝি তাহার বুকের সুপ্ত আগ্নেয়-গিরি সজীব হইয়া উঠিল।

আশা ত অনেকদিন পূর্ব্বেই শুকাইয়া গিয়াছিল, অন্তরে মঙ্গলা-মঙ্গলের সমাধি করিয়া ইন্দু ত পরম নির্ব্বিকারভাবেই অদৃষ্টের কষাঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তবে আজ আবার তাহার মৃত প্রাণ ভুতাবিষ্টের মত এক এক বার নড়িয়া চড়িয়া উঠিতে লাগিল কেন? যেদিন বাধ্য হইয়া তাহার হৃদয় মোহিতের আশাকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিল, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ইন্দু মরিল না, তখনই সে বুঝিয়াছিল, আজই হউক বা দু'দিন পরেই হউক্ সমাজ ও ধর্ম্ম জোর করিয়া তাহার দেহটাকে একজনের পায়ে বলি দিবেই। মরণ ভিন্ন নিস্তারের উপায় নাই। মরিবার কথাও একবার ইন্দুর মনে হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছিল—মরিলেই ত আর সে মোহিতকে পাইবে না, আর তাহার, এই আশাহীন দেহটা সহিয়া সহিয়া ক'দিনই বা টিকিবে? আত্মহত্যার চিন্তা হইতে ইন্দু বিরত হইয়াছিল। পাত্রের কথা ভাবিয়া মা যখন উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, ইন্দু তখন নির্ব্বিকারভাবেই

আপনাকে স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু আজ যে আবার সে মোহিতের খবর শুনিয়াছে—মোহিত অতি নিকটেই আছে। দুপর বেলা, সে হঠাৎ মাকে বলিল—কাছেই ত আছেন, একবার খবর দিলে হয় না?

পুত্রের জ্বর বৃদ্ধিতে সারদা সমস্ত দিন বড় উদ্বেগেই কাটাইতে-ছিলেন, কন্যার প্রতি আজ বড় একটা দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ইন্দুর দিকে চাহিয়া তিনি কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন —কোথায় আছে সে, তা'ত জানিনে মা।—আরও একটু নিবিড় ভাবে ইন্দুর শুষ্ক মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—এখন তা'র না আসাই ভাল, গোড়াতেই হয়ত তাকে বুঝ্‌বারই আমাদের ভুল হয়েছিল, মিছেমিছি চিরদিনের মত তা'র মনেও একটা কাঁটা বিঁধিয়ে দিবি কেন ইন্দু?

কন্যা কথা কহিল না, সে ভাবিতেছিল—বুঝিবার ভুল হইয়া-ছিল?—হুঁ তাহাই বটে! একবার যদি দেখা হয়!

ইন্দু আর কিছু বলে না দেখিয়া সারদা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন—আচ্ছা দেখি, ওবেলা দেবেন আসুক, তা'কে জিজ্ঞেস্ করব'খন। আজ ত খোকার জ্বরটা খুব বেশীই হয়েছে, এ তারিখে বোধ হয় বে' বন্ধই থাক্‌ল।—সস্নেহে একবার কন্যার মুখে হাত বুলাইয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া পীড়িত পুত্রের কাছে গেলেন।

বৈকালে দেবেন আসিল, রাজাবাবু তখন ঔষধ আনিতে ডাক্তার বাড়ী গিয়াছেন, দেবেন সোজা রোগীর ঘরে আসিয়া

ঢুকিল। খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া সারদা ঘোমটার ভিতর হইতে বলিলেন—ব'স বাবা।—খাটের পাশে বসিয়া সেজোর সহিত কথা বলিতে বলিতে দেবেন বার বার ইন্দুর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—ছোঁড়াটা জ্বর বাঁধাইয়া সব গোল বাঁধাইল, নহিলে আর দু'টো দিন পরেই ত ঐ সুন্দর মুখখানি দেবেন বুকে ধরিতে পারিত।

দেবেনের বুভুক্ষু দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া ইন্দু বার বার করুণ দৃষ্টে মায়ের দিকে চাহিতে লাগিল। সম্বন্ধে দেবেন তাহার ভগিনীপতি হইলেও ইন্দু তাহার সহিত এ যাবৎ বড় একটা কথা কহে নাই, আজ নিজ হইতে তাহাকে মোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইন্দুর কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। তাই সে কাতর দৃষ্টিতে মাকে অনুরোধ করিতেছিল।

ওবেলা সারদা বিশেষ না ভাবিয়াই, ইন্দুকে উপস্থিত প্রবোধ দিবার জন্যই বলিয়াছিলেন, মোহিতের খবর লইবেন। পরে ভাবিয়া দেখিলেন তাহাতে ফল কি? এপর্য্যন্ত একদিনের জন্যও ত তাঁহার মনে হয় নাই, তিনি নিজে মোহিতকে এ বিষয়ে কোনও কথা বলিবেন। তাহা হইলে ত সেই যেদিন বিধুর নিকট পিয়ারীবাবুর অভিপ্রায়ের কথা জানিয়াছিলেন, সে দিন তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন না, মোহিত বিদায় লইতে আসিলে, ইন্দুর সহিত তাহাকে দু'টা কথা বলিতে না দিয়াই বিদায় করিতেন না। তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল, মোহিত এখন ইন্দুর দুঃখ বুঝিলে হয়ত তাহার মুখ চাহিয়া, নিজের মায়ের মনে ব্যথা দিবে, পিয়ারীবাবুর আদেশ অবহেলা করিবে ও নিজের প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিসর্জন

দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। কিন্তু সেটা ত সারদার নিজের দিক দিয়াও ভাল হইবে না। মোহিত এখনও অক্ষম, সে নিজে ত আশ্রয়চ্যুত হইবেই সঙ্গে সঙ্গে সারদাও ভ্রাতার আশা ভঙ্গের কারণ হইয়া এতগুলি বাচ্ছা কাচ্ছা লইয়া নিরাশ্রয়ে পড়িবেন। আর তাঁহার সেই সদা-হাস্যময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী স্নেহ! হয়ত তাহার মুখের হাসি মুছিয়া যাইবে। নিজের কন্যার সুখের জন্য অদৃষ্টের চোখে ধূলা দিবার চেষ্টায় এতখানি অধর্ম্ম করা সারদার পক্ষে অচিন্তনীয়ই ছিল। তাই ওবেলা হঠাৎ ইন্দুকে কথাটা বলিলেও, এখন তিনি কন্যার বার বার অনুনয় উপেক্ষা করিয়াই, দেবেনকে মোহিতের বিষয় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কতক্ষণ চুপ চাপ বসিয়া থাকিয়া দেবেন উঠিয়া পড়িল। ইন্দু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—মা কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন আপনাকে—

দেবেন বিস্মিত ভাবে একবার ইন্দুর মুখের দিকে একবার সারদার অবগুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া, আবার বসিয়া পড়িল।

মনে মনে বিরক্ত হইলেও সারদাকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইল—কাল তোমার চাকর বল্‌ছিল, মোহিতের নাকি বড় অসুখ হয়েছিল, তোমার কল্‌কাতার বাসায় ছিল। এখন সে কেমন আছে, কোথায় আছে তাই জিজ্ঞেস্‌ কর্চ্ছিলুম।

দেবেনের মুখ শুকাইয়া গেল, বোকা বুড়োটা হয়ত এঁদের কাছে সোনালীর সব কথাই বলিয়া দিয়াছে। আত্ম-গোপনের চেষ্টায় সে উদাসীন ভাবে বলিল—হ্যাঁ অসুখ হয়েছিল, এখন সেরেই গিয়েছে।

—এখন সে কোথায় আছে? অনেক দিন তা'কে দেখিনি, আস্‌বার জন্যে একবার তা'কে খবর দেওয়া যায় না?

সর্ব্বনাশ! মোহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সারিয়াছে আর কি! বোকা রাজালালকে প্রলোভনে বশ করিয়া ও আর সকলের চোখে ঠুলি দিয়া যে কাজটা দেবেন এতদূর আগাইয়া আনিয়াছে, মোহিত আসিয়াই হয়ত সব পণ্ড করিয়া দিবে। ইন্দুর সহিত মোহিতের একদিন কত বড় একটা সম্বন্ধের সম্ভাবনা ছিল, দেবেন তাহা না জানিলেও, তাহার ভয় হইল, মোহিত হয়ত সোনালীর কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া বা পিয়ারী বাবুকে জানাইয়া তাহার এত আয়োজন, এত খরচ পত্র বিফল করিয়া দিবে, তাহার মুখের গ্রাস টানিয়া বাহির করিবে। আর কি জানি দাশুটাই বা ইহার মধ্যে সোনালী ঘটিত ব্যাপার কতটা ফাঁস্ করিয়া বসিয়াছে তাহারই বা ঠিক কি? হঠাৎ দেবেনের মাথায় একটা মতলব আসিল। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়াই সে বলিল—আপনাদের এখানে আসার কথা কি আর সে জানে না, সব কথা আমি নিজেই তা'কে বলেছি। কত বুঝিয়েছি, সঙ্গে ক'রে বাড়ী আন্‌তে কত চেষ্টা করেছি, কোন কথাই সে কানে তোলে নি। এই বয়েসেই এতখানি অধঃপাত, বড়ই দুখের কথা।

সারদার স্নেহশীল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অতিশয় শঙ্কিত-ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন কি করেছে সে?

দেবেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল—কল্‌কাতায় আমার একখানা ভাড়াটে বাড়ী ছিল। দাশুকে সেখানে রে'খে দিন কতকের জন্যে জমিদারীতে গিয়েছিলুম, তার পর আপনাদের

এখানে আসার জন্য ব্যস্ত ছিলুম, অনেক দিন সে বাসায় যেতে পারি নি। সে দিন দাশুকে আনবার জন্যে সেখানে গিয়েই ত একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। দিন কতক আগে মোহিত কোথা থেকে অসুখ বাঁধিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তার পর একটু সেরে উঠেই বাসার ঠিকে ঝি মাগী, সোমবালী না কি নাম তার, তা'কে নিয়েই মহা কেলেঙ্কারী জুড়ে দিলে। ক'দিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও কিছুতে কিছু না কর্ত্তে পেরে, আমি ত বাড়ী-খানার ভাড়া টাড়া চুকিয়ে দিয়ে, দাশুকে নিয়ে সে নরক থেকে পালিয়ে এলুম। শুনছি এখনও সে সেই বাড়ীতেই ধাস্টামি কচ্ছে।

শুনিয়া সারদা ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; ইহারই মধ্যে মোহিতের এত অধঃপতন হইয়াছে! এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? বোধ হয় দেবেনেরই ভুল হইয়াছে, অথবা সে ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বলিতেছে। তাই কি, মিথ্যা বলিবার তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? চাকরটাও ত কাল এই কথাই বলিতেছিল, কোন্ মাগী সেবা করিয়া, খরচ করিয়া মোহিতকে বাঁচাইয়া তুলে। তবে সত্যই কি, এখানে অভিভাবকশূন্য ও আত্মীয়-বন্ধু-হীন মোহিত প্রলোভনে পড়িয়া গোল্লায় যাইতে বসিয়াছে? বড় বিপদের কথা ত! কানপুরে দাদা বা বিমলা কেহই ত এ কথা জানেন না, তাঁহারা মনে করিতেছেন মোহিত কলিকাতায় উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। এখন উপায়?

আর ইন্দু? ইন্দুর মনে তখন কি হইতেছিল? কাল না মোহিতের কথা শুনিয়া সে বড় চঞ্চল হইয়া মনে মনে আবার গড়া

পেটা করিতে বসিয়াছিল, এখন সেই মোহিতের এতখানি অধঃ-পাতের সংবাদে মন তাহার কি বলিতেছিল ? দেবেনের সব কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিলেও মোহিতের প্রতি ইন্দুর মন হঠাৎ বিমুখ হইয়া উঠিল—এত অপদার্থ সে !—নিজেকে ইন্দু প্রবোধ দিল—বাস্ তবে আর কি ! এইবার নিশ্চিন্ত। যাক্ মোহিত গোল্লায় যা'ক্ ; ইন্দুর কি ? ইন্দু এবার আর মোহিতের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে আসিতে দিবে না, ঘৃণার সহিত তাহার স্মৃতিকে সে ত্যাগ করিয়া চলিবে।

এক চালে দুই দিক রক্ষা করিয়া দেবেন আপনার বুদ্ধির তালিম করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেই রাত্রে সেজোর জ্বর ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিল। সারদা মোহিতের কথা ভুলিয়া গেলেন।

(২৮)

সেজোর অসুখের জন্য ১২ তারিখে বিবাহ হইল না। এখন ছোঁড়া শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া না উঠিলে অথবা একটা কিছু অমঙ্গল ঘটিলে বিবাহ আরও অনেক দিন পিছাইয়া যাইতে পারে, এমন কি না হইতেও পারে। দেবেন বড়ই উৎকণ্ঠিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয়ের চিকিৎসায় ৫।৬ দিনেও যখন কোনও সুফল দেখা গেল না, তখন দেবেন কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিল, নিজে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ১৩ দিনের দিন ডাক্তার আশা দিয়া গেলেন-এবার রোগ ভালর দিকেই যাইবে, তবে একেবারে সারিয়া উঠিতে দেরী হইবে।

এই মাসের ২৭ তারিখে বিবাহের শেষ দিন, তাহার পর পৌষ মাস পড়িবে, এক মাস আর বিবাহ হইতে পারে না। রাজাবাবুকে এ সব কথা বুঝাইয়া ও নিজে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইতে স্বীকার হইয়া দেবেন অনেক কষ্টে রাজাবাবুর মত করাইল, এই ২৭ তারিখেই বিবাহ হইবে। ২৬ তারিখের শেষ বেলায় এই কথা ঠিক হইল।

সকাল বেলা, ইন্দুকে সেজোর কাছে বসাইয়া সারদা মুখ হাত ধুইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত দেখা হইতেই তিনি বলিলেন—ইন্দুকে আজ আর কিছু খেতে টেতে দিও না, ১০টার পর তা'র গায়ে হলুদ, আর আজ রাত্রেই বে'। সেজো ত সেরেই উঠেছে, এ দিকে এ মাস ত কাবার হ'য়ে এল, তার পর পোষ মাস পড়্‌বে। দেবেন বড্ডই ধ'রে পড়েছে, তা লোক জন পাঠিয়ে সে-ই সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবে, তোমার্ কিছুই ব্যস্ত হ'তে হবে না, তুমি সেজোকে নিয়ে থেকো, এ দিকের জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না, পা'র ত এক এক বার উঁকি দি'য়ে দেখো কদ্দুর কি হচ্ছে।

এতক্ষণে সারদার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের প্রতি রাজা বাবুর দৃষ্টি পড়িল, উচ্চ হাসিয়া তিনি বলিলেন—আরে রাম! তুমি যে দেখ্‌ছি ভয়েই একেবারে মুসড়ে পড়্‌লে! মনে ক'র্‌ছো কি, গণ্ডগোলই হবে। তা হবে না গো তা হবে না। আমি কি তেমিই বোকা যে, সব দিক না বেঁধে ছেঁদে হঠাৎ এতটা সাহস ক'র্‌ছি? নাও এখন চট্ ক'রে বাসি পাট্‌টা সেরে ফেল দিকি। এখুনি সব লোক জনেরা আস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে! দেবেন, পাড়ার মেয়েদের পাঠিয়ে

দেবে, কুটুম বাড়ী থেকে আইবড়' ভাত নিয়ে এখুনি সব এসে পড়্‌বে। আজকের দিন একটু চট্ পট্ গতর নাড়িয়ে কাজ সেরে নেও।—মহা ব্যস্ত ভাবে রাজাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সারদা কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মনেই রহিল না। তিনি সিঁড়ির পাশে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক'দিনের দুশ্চিন্তা ও রাত্রি জাগরণে এমনেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর স্বামী এই মাত্র যে খবর দিয়া গেলেন তাহাতে তাঁহার মনের ও দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও কোথায় উড়িয়া গেল।

কতকগুলি অপরিচিতা স্ত্রীলোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বার বার সারদার দিকে চাহিতে চাহিতে রাজালালের নির্দ্দেশ মত হল্‌ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সারদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেজোর ঘরে ঢুকিলেন, কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়াই মেঝের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ওদিকে ইহারই মধ্যে কর্ম্ম বাড়ীর কোলাহল সুরু হইয়া গিয়াছে।

মাকে বাহিরে পাঠাইয়া ইন্দু নিদ্রিত ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়াছিল। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে লোক সমাগমের শব্দ তাহার কানে গেল, এমন সময় মা'ও ঘরে আসিয়া কেমন করিয়া বসিয়া পড়িলেন, ইন্দু ভয় পাইয়া প্রথমেই নিদ্রিত ভাইয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, ত্বরিতে একবার তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিল। তাহার পর ভয়ের কারণ এখানে নয় বুঝিয়া, সে খাট হইতে নামিয়া মায়ের পাশে যাইতেছিল। এমন সময়, একটি আধা বয়সী রমণী, এটি যে

রোগীর ঘর, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—কি গো, এ ক্যামন্‌ধারা, ক'নে কই গো? ওমা তুমিই বুঝি ক'নে? তা বেশ্, ঐ যে কথায় বলে, যার বে' তার মনে নেই, পাড়া পড়্‌সীর ঘুম নেই। তা এস এখন, শাস্তর নিয়ম ত কর্ত্তে হবে।—ইন্দুকে একরকম টানিতে টানিতেই তিনি বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। সারদা উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কে তাঁহার ইন্দুকে এমন করিয়া তাঁহার বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবে? কখনই না, তিনি বাধা দিবেন।—কিন্তু তখনই বুঝি তাঁহার মনে পড়িল, কন্যাকে ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাঁহার কই, বাধা দিয়া ফল কি, অদৃষ্ট ত বাধা মানিবে না? বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি ধীরে ধীরে পীড়িত পুত্রের কাছে গেলেন। নবাগতা স্ত্রীলোকটির সুউচ্চ কণ্ঠধ্বনিতে সেজোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেও মাথাটি হেলাইয়া বাহিরের দিকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল।

বাড়ীর একটী ছেলে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, বাড়ীর গৃহিনী—ক'নের মা, কোনও কাজে যোগ দিলেন না, ক'নেও স্বয়ং নির্জ্জীব কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট রহিল, তবুও বিবাহ বন্ধ রহিল না।

বর আসিল, বাহিরে কলরব উঠিল, সারদা একবার দ্বারের ফাঁক দিয়া বাহিরে চাহিলেন। দেবেন রায়কে বিবাহ-বেশে ঢুকিতে দেখিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পীড়িত পুত্রের পাশেই ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য কেহ বাতাস করিল না, চোখে মুখে জলও দিল না। কতক্ষণ পরে আপনা হইতেই তাঁহার

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তখন বুঝি বর-বধূকে বাসর করিতে পাশের ঘরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

অনুষ্ঠানের ভিতর একবার বুঝি ইন্দু চোখ তুলিয়া চাহিয়াছিল, বরবেশী দেবেনকে দেখিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর একবার শিহরিয়া উঠিল মাত্র, তাহার পর দেবেনের হাতের মধ্যে তাহার হাতখানি পাথরের মত ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

যথা বিহিত বিবাহ হইয়া গেল—উপন্যাস—সম্ভব কোনও ঘটনা ঘটিয়া শেষ মুহূর্ত্তেও বিবাহ পণ্ড হইল না। বর কন্যা বাসরে নীত হইল। অভ্যাগতগণ দেবেন রায়ের বন্দোবস্তে পরিতোষ সহকারে ভোজান করিতে লাগিলেন। রাজাবাবু নির্ব্বিকারচিত্তে বাহিরে বসিয়া তাম্রকুট ধুমে দিকাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

(২৯)

পূর্ব্বরাত্রের কথা মনে করিয়া মোহিত সকাল বেলা ঘরের বাহিরে আসিতে পারিতেছিল না। দারুণ লজ্জায় তাহার হাত পা সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে কতখানি নীচে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা দেখিবার সাহস তখন তাহার ছিল না। পতন ত হইয়াছেই তবে কতখানি উচ্চ হইতে কতখানি নিম্নে, সে বিচার তখন মোহিত সভয়ে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। সব দোষটাই যে সোনালীর ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে মনের সে দৃঢ়তাও তাহার ছিল না। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলেও মাতালের মনে এক একবার সেই মত্ত মুহূর্ত্তের উত্তেজনা ও তৃপ্তির স্মৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়া, আবার তাহাকে পিপাসাতুর করিয়া

তুলে। মোহিতের মনে এখনও যে একটা মদির চরিতার্থতার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাহার সমস্ত দেহটাকে মাঝে মাঝে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে। যেমন করিয়া যেখানেই হউক সে যখন চির অনাস্বাদিতের আস্বাদ পাইয়াছে, সহজে ত আর তাহার ওষ্ঠ হইতে সে আস্বাদ স্মৃতি মুছিয়া যাইতেছিল না। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক প্রথমবার সুরাপানের পর নেশা টুটিয়া গেলে, যেমন অত্যধিক ভয় ও অনুতাপ উপস্থিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তেমনই এই নবাস্বাদিতের প্রতি একটা উৎকট আকর্ষণ ও লালসা জাগিতে থাকে। যাহার মনের জোর আছে, আর পাঁচটা আকর্ষণ আছে, অনুতাপের কষাঘাতে তাহার এই আকাঙ্খা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়া যায়, আর যাহার মনের সে শক্তি নাই লালসা তাহাকে টানিতে টানিতে অন্ধকূপের মধ্যে লইয়া যায়। মোহিত আজ অস্থির হইয়া, বিবেক, লালসা, মঙ্গলামঙ্গল, ভূত-ভবিষ্যৎ, মনের সকল তর্ক বিচার ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্তই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা ত আর সম্ভব নহে—মন কাহারও কথার বাধ্য নয়, চিন্তা করিব না বলিলেই মন স্থির হইয়া শূন্য পড়িয়া থাকে না। সমুদ্রের একস্থানের লোনা জল তুলিয়া লইলেও সে স্থানটি শূন্য পড়িয়াই থাকে না।

মোহিতকে ডাকিতে বা তাহার সম্মুখে যাইতে আজ সোনালীরও কেমন ভয় ভয় হইতেছিল। বেলা ৮টা বাজিল, ক্রমে ৯টাও বাজিয়া গেল, মোহিত বাহির হইল না। তখন অন্য প্রকার ভয়ে সোনালী শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল কাল রাত্রে দু'জনের কাহারও খাওয়া হয় নাই, সেই রাত্রি ৯টার পর

মোহিত টলিতে টলিতে নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছে, তবে এখনও সে উঠিতেছে না কেন? শঙ্কিত হইয়া সোনালী মোহিতের দ্বারে বার কয়েক মৃদু করাঘাত করিল। মোহিত উঠিয়া দ্বার খুলিল, সোনালীর দিকে মুখ না ফিরাই য়াই নতনেত্রে সে নীচে নামিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া মোহিত আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সোনালী জল-খাবার রাখিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

বৈকাল বেলা সোনালী ঘরে ঢুকিয়া পূর্ব্বেরই মত সহজ কণ্ঠে বলিল—এ সব কি ছেলেমী হ'চ্ছে? এমন ক'রে কা'র কাছে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? যাও একবার বাইরে বেড়িয়ে এস। ওকি ছেলেমী! অমন ক'রে মন খারাপ ক'রে শরীর মাটী ক'রো না ছিঃ!

সোনালী আজ কোন্ সাহসে আপনা হইতেই তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিতেছে? মোহিত ভাবিল, হায়! সোনালীও তাহা হইলে বুঝিয়াছে, কল্যকার সে মোহিত আর নাই, আছে শুধু, নরকের পূতিগন্ধমাখা তাহার প্রেতমূর্ত্তি। তবে সোনালীর এটুকু সাহস হইবে না কেন?

সোনালীও বোধ হয় মোহিতের মনের কথা বুঝিল,—হাসিয়া বলিল—কি, আশ্চর্য্য হ'চ্ছ, কোন্ সাহসে আজ আমি নিজে থেকেই তোমায় বাইরে ছেড়ে দিচ্ছি? তা, সে কথা আর একদিন ব'লবো, শুনো তখন। এখন ত কোণ ছেড়ে একবার ও'ঠ, আজ দু'মাস যে সূয্যি মামার মুখ দেখ'নি।

মোহিত নড়িল না, চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। সোনালী

আন্‌লা হইতে সার্টটি আনিয়া তাহার কাঁধের উপর ফেলিয়া দিল, জুতা জোড়া ঝাড়িয়া মুছিয়া পায়ের কাছে রাখিল। মোহিত তবুও কথা বলে না, তাহার উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

সোনালী হাসিয়া বলিল—তোমার দেখ্‌ছি জোর না ক'র্লে নিজে থেকে কিছুই হ'বার যো নেই।—বলিতে বলিতে সে কামিজটি তুলিয়া লইয়া নিজ হাতে মোহিতের গায়ে পরাইয়া দিল, পায়ের কাছে বসিয়া জুতা পরাইল, ফিতা বাঁধা শেষ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। মোহিত নির্ব্বাক নিথর বসিয়া ছিল। সোনালী নিজের ঘর হইতে একখানি চিরুণী আনিয়া মোহিতের রুক্ষ ও উস্কাখুস্কা চুলগুলি বেশ করিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া দিল। তাহার পর কতক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সোনালী সহসা দুই হাতে মোহিতের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া পূর্ণ আবেগে তাহার ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন করিল। আবার মোহিতের পা হইতে চুল পর্য্যন্ত আগুনের হল্কা খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মুখ হইতে তখনও শব্দমাত্র বাহির হইল না। ডাকিনী সত্যই বুঝি যাদুমন্ত্রে মোহিতের মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছে। নচেৎ একদিনের সেই তেজস্বী মোহিত আজ এতখানি অপদার্থ হইয়াছে যে, একটি ঘৃণিত বেশ্যার পাপ স্পর্শ হইতেও আপনাকে মুক্ত করিবার তাহার ক্ষমতা হইতেছিল না?

সোনালী আবার এক ঝলক হাসিয়া বলিল—কিগো প্রস্তর-মূর্ত্তি, এবার নিজে থেকে যাবে? না, আমাকে হাত ধ'রে বাইরে

নিয়ে যেতে হবে ?—সত্যই সে মোহিতের হাত ধরিয়া নীচে টানিয়া আনিল, বাহিরের দরজা খুলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল—যাও চট্ ক'রে একটু ঘুরে এস, সন্ধ্যে ক'রো না, অন্যমনস্কে যেন বেশী দূরে চ'লে যেও না। পকেটে রুমালে বাঁধা টাকা আছে, ভাঙিয়ে একখানা বড় পাঁউরুটী কিনে এনো, সকালে ঝি মাগী যে বেলা ক'রে আসে, রোগা শরীরে তোমার ততক্ষণে পিত্তি প'ড়ে যায়।

মোহিত এক পা এক পা করিয়া রাস্তায় নামিল। সোনালী দরজা বন্ধ করিয়া দিল, খিল আঁটিয়া দিতে গিয়াই, হঠাৎ আবার তাড়াতাড়ি দরজা খুলিল—মোহিত যদি আর ফিরিয়া না আসে ? সোনালী সভয়ে বাহিরের দিকে চাহিল, মোহিত তখন বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া গলির মোড় ঘুরিতেছিল, সোনালীর ভীত ব্যাকুল চাহনি তাহার চোখে পড়িল। সোনালী আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ঘরে আসিয়া সোনালী কাজে মন লাগাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মন তাহার তখন কেবলই সেই বন্ধ দরজার বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল।

বঁড়্সীতে গাঁথা মাছকে প্রথমে একটুও সূতা না দিয়াই জোর করিয়া টানিয়া ডেঙ্গায় তুলিতে গেলে, হয় বঁড়্সী ভাঙ্গিয়া বা ফস্‌কাইয়া যাইবে নয়ত সূতা কাটিয়া জলের মাছ জলেই থাকিবে। মাছ যখন টোপ্ গিলিয়াছে, বঁড়্সীতে গিঁথিয়াছে, তখন একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাকে খেলাইয়া তুলিতে হইবে। সোনালী বুঝিয়াছিল, একবার যখন মোহিতের দর্পচূর্ণ হইয়াছে, সে যখন ফাঁদে পা দিয়াছে, তখন একবারেই বেশী টানাটানি করিলে মগ্ন সূতার ফাঁস্ ফস্‌কাইয়া যাইবে নয়ত পাখীর পা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ'টা

সে তাহাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা। সমস্ত দিন ধরিয়া মোহিতের সলজ্জ নীরবতায় সোনালী এই কথাটা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল, তাই না, সাহস করিয়া সে এখন মোহিতকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে পারিল।

কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া মোহিত সোনালীর আদেশ মত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিল। আজ এমন সুযোগ পাইয়াও তাহার চলিয়া যাইবার কথা মনে হইল না, মনে হইলেও হয়ত সে যাইতে পারিত না। কেন?

সকাল সকাল মোহিতকে খাওয়াইয়া, নীচের কাজ সারিয়া লইয়া, সোনালী নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

এইভাবেই ৩।৪ দিন কাটিল। সোনালী এ কয়দিন সস্নেহ যত্নে মোহিতের সেবা করিয়া অথচ তাহাকে একটু দূরে দূরে রাখিয়াই চলিতেছিল। মোহিত কথাই কহে না, সোনালী দেখিত সময়ে সময়ে মোহিতের মুখে কেমন একটা বিরক্তি ও অসন্তোষ ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। সোনালীর যত্নে মোহিতের নষ্ট-স্বাস্থ্য ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার দেহের সহজ কান্তি দেখা দিতেছিল। লুব্ধ আনন্দে সোনালীর হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন ১০টা বাজিবার পূর্ব্বেই মোহিতকে খাওয়াইয়া দিয়া সোনালী বলিল—ইস্কুল কলেজ ত ছেড়েই দিলে, তা আগের মত কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখ না, সেই দালালী না কি কাজ শিখ ছিলে, তা যাও না একবার বাজারে বেরোও না। এমন ক'রে চুপ চাপ বাড়ী ব'সে থাক্‌লে, আর ক'দিন চ'ল্‌বে? হাতের সম্বল ত সব

ফুরিয়েই এসেছে, এক এক ক'রে গিয়ে চুড়িগুলো ত এখন চার গাছায় ঠেকেছে, তা তা'তেই বা আর ক'দিন চ'লবে ?

সোনালী মোহিতের জামা কাপড় গুছাইয়া আগাইয়া দিল। মোহিত সুবোধ ছেলেটির মত জামা-জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল। আজ কাল সে সোনালীর কোনও কথায় বা কাজে এতটুকু প্রতিবাদ করে না। আপনা হইতে একটি কথাও ত সে বলে না। সোনালীর তাড়ায় এখন হইতে মোহিত নিত্যই আবার বাজারে বাহির হইতে লাগিল।

সোনালীও দুপর বেলাটা ঘুমাইয়া কাটাইতেছিল না। সেই যে সেদিন সে মোহিতকে বলিয়াছিল, চর্‌কায় সূতা কাটিয়াও তাহার দিন চলিয়া যাইবে, সে খেয়ালটা বরাবরই তাহার মনে ছিল। কি উপায়ে সে একটা চর্‌কা যোগাড় করিল, সেটা লইয়া সমস্ত দুপরটা সে সূতা কাটা শিখিতে লাগিল। দু'চার দিনেই সে বেশ সূতাও বাহির করিতে লাগিল।

দিন পনেরো পরে সেদিন দুপর বেলা নীচের ঘরে বসিয়া সোনালী একটি শিক্ষার্থিনীকে চর্‌কার ব্যবহার বুঝাইতেছিল। বাহিরের দরজা ভেজানই ছিল। এমন সময় মোহিত বাড়ী ঢুকিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে উপরে চলিয়া গেল। সঙ্গিনীকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিয়া, বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া সোনালী ব্যস্ত ভাবে উপরে আসিল। মোহিতের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল জামা-জুতা-শুদ্ধ মোহিত বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সোনালী সভয়ে মোহিতের ঘাড়ের উপর হাত রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল, উত্তাপের কিছু বৃদ্ধিই বোধ হইল, কিন্তু তাহা

এত অধিক নহে যে, এমন করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। সন্তর্পনে সে মোহিতের জুতাজোড়া খুলিয়া দিল, তাহার পর তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—কি হয়েছে, অমন ক'রে শুয়ে রইলে কেন ? কি অসুখ কর্চ্চে, মাথা ধরেছে ?

মোহিত সোজা হইয়া শুইল, কোনও উত্তর করিল না, আরক্ত চক্ষে শূন্য দৃষ্টিতে সোনালীর অবনত উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মন দৃষ্টিতে বা দৃষ্ট বস্তুতে ছিল না—সে যেন কোথায় কোন্ সুদূরে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সোনালী মোহিতের বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ব্যাকুল ভাবে বলিল—কি হয়েছে বল, অমন ক'রে তাকিয়ো না।

সহসা সজোরে সোনালীকে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া মোহিত খাট্ হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে গর্জ্জিয়া উঠিল—দূর হ' রাক্ষসি, দু'জনে মতলব এঁটে আমার সর্ব্বনাশ করেছিস! এখনও আশ্ মেটে নি? বটে! দূর হ' ব'ল্‌ছি—অমানুষিকজোরে বিস্ময়ে বিমূঢ়-গতি সোনালীকে মোহিত ধাক্কা দিল। অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া সোনালী টাল্ সাম্‌লাইতে পারিল না, 'মাগো' বলিয়া সশব্দে সে পড়িয়া গেল। দ্বারের পাশে একখানি চৌকি রাখা ছিল, মোহিতের অসুখের সময় উহার উপর ঔষধ পথ্য রাখা হইত। পড়িবার সময় বুঝি ইহারই একটা কোণে লাগিয়া সোনালীর কপাল খানিকটা কাটিয়া গেল। মোহিত অশান্ত ক্রোধে আবার সোনালীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ সোনালীর মুখময় রক্ত দেখিয়া তাহার রাগ উড়িয়া গেল, সে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কপালে আঘাত পাইয়া

সোনালী সংজ্ঞা-হীনের ন্যায় পড়িয়াছিল। মোহিত তাড়াতাড়ি তাহার রক্তাক্ত মুখের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া কোঁচার মুড়া দিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল।

সোনালী চোখ চাহিল, মোহিতের ভীত ত্রস্ত মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই ধুড় মুড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। মোহিতের কাপড়ে ও হাতের রক্ত সোনালীর চোখে পড়িল, নিজের কপালে হাত দিয়া হাতের রক্ত দেখিয়া বলিল—আঃ কপালটা বুঝি কেটে গেছে।—তাহার পর সেই রক্তমাখা মুখে খানিক্টা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—কি ছেলে মানুষ তুমি! কি হয়েছে বলা নেই কহা নেই, থাম্কা মার ধর্ আরম্ভ ক'রে দিলে? দেখত ফর্সা কাপড়খানা কি ক'রে রক্তমাখা কর্ল্লে।

সোনালী উঠিয়া মোহিতের হাত ধরিয়া তুলিয়া খাটে বসাইল, সোরাই হইতে ঘটী করিয়া জল আনিয়া তাহার হাতের রক্ত ধুইয়া দিল। নিজের কপাল হইতে তখন মুখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া রক্ত গড়াইতেছিল, ঘটীর জলে সোনালী মুখের ও কপালের রক্ত ধুইয়া ফেলিল, তাহার পর একখানি ন্যাকড়া বাহির করিয়া আনিয়া, সেখানি জলে ভিজাইয়া, মোহিতের হাতে দিয়া বলিল—তা এখন দয়া ক'রে কপালটা বেঁধে দেবে?—মোহিতের অতি নিকটে বিশ্বস্ত ভাবে মাথা বাড়াইয়া দিয়া সোনালী অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একটু পূর্ব্বে মোহিত বাহির হইতে একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া আসিয়াছিল। দুঃখে ও ক্রোধে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই সোনালীকে আক্রমণ করিয়াছিল, অতি নীচের ন্যায়

তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সোনালী ধাক্কা খাইয়া, রক্তাক্ত হইয়াও হাসিমুখে যখন নিজের আঘাত উপেক্ষা করিল; লজ্জায় ও অনুতাপে তখন মোহিতের মাথা কাটা যাইতেছিল। যন্ত্র চালিতের ন্যায় সে নীরবে সোনালীর ক্ষত স্থান ব্যাণ্ডেজ্ করিতে লাগিল। আঘাতটি বেশ গুরুতরই হইয়াছিল, ক্ষতটি অনেক খানি ও গভীর দেখাইতেছিল, কিন্তু সোনালীর মুখে এতটুকু যন্ত্রণার চিহ্ন বা ক্রোধ ভাব দেখা গেল না, সে আবার হাসিয়া বলিল—মেরে-ধরে' এখন ত রাগ একটু পড়েছে, এবার বল দেখি ব্যাপার কি ?

ব্যাণ্ডেজ বাধা শেষ হইল, সোনালী মাথা সরাইয়া লইতে যাইবে এমন সময়ে মোহিত সহসা তাহার সিক্ত-শীতল হাত দু'খানি সোনালীর কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—মাপ্ কর সোনালী। পথে দাশুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার মুখে শুনলুম দেবেন ইন্দুকে দেশে এনে বে' করেছে। শোকে পাগল হ'য়ে প্রথমেই মনে হ'ল, আমার বিরুদ্ধে মস্ত একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে দেবেনের পরামর্শে তুমি এখানে আমাকে আট্‌কে রেখেছ' আর ও' দিকে দেবেন নিঝঞ্ঝাটে ইন্দুকে বে' ক'রে বসেছে। তাই রাগে আত্মহারা হ'য়ে তোমাকে আঘাত করেছি। আমায় মাপ কর।

ক্রোধের মূর্ত্তি ধরিয়া, শোকের প্রথম তীব্রতা কতকটা কমিয়া গিয়াছিল। এখন মোহিত ভাবিয়া বুঝিল—নিজের অদৃষ্ট ছাড়া এ বিষয়ে আর কাহারও হাত নাই। প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়া শুনিয়া সোনালী ত দেবেনকে কোন সাহাযাই করে নাই। দেবেনের ও বিশেষ দোষ কি ? স্বার্থান্বেষণে রত হইয়া সে নিজের স্বার্থোদ্ধার করিয়াছে মাত্র, তাহার জন্য মোহিতের নিকট জবাব-

দিহি করিতে সে বাধ্য নয়। ইন্দু যদি বাধা দিত, না আসিত, দেবেনের কি সাধ্য ছিল ইন্দুকে কাড়িয়া লয়? কি করিয়া ইন্দু এত শীঘ্র মোহিতকে ভুলিতে পারিল, কেন সে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিল? কিসের প্রলোভনে? দেবেনের দুস্কৃতি ত তাহার কিছুই অছাপা ছিল না, তবে কি আশায় কোন্ লোভে ইন্দু তাহাদের এত দিনের গড়া ঘর পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল? উঃ! কি বিশ্বাসঘাতকতা!—সহসা মোহিতের মনে পড়িল, আর সে—সেও কি কম বিশ্বাস-হীনতার কাজ করিয়াছে! নাঃ, ইন্দুর উপর রাগ করিবার এতটুকুও অধিকার ত মোহিতের নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া নিজেরই দুর্ব্বলতা বশে সে ইন্দুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, হয়ত ইন্দু বাধ্য হইয়া নিজের অনিচ্ছায় এই অবসম্ভাবী ভাগ্যচক্রে আত্মদান করিয়াছে। মোহিত ইচ্ছা করিলে আবার সাধুতার ছদ্মবেশে ফিরিয়া যাইতে পারে, ইন্দুর সে উপায় নাই, এই না তাহার অপরাধ!

মোহিত ভাবিল—জীবনের একটা বড় সাধের আশা ত চির-সমাধি লাভ করিল, যা'ক্ আপদ চুকিয়া গিয়াছে। মনের ছট্‌ফট্টানি মিটিয়া গেল, এখন নির্ভাবনায় স্রোতের মুখে দেহ ভাসাইয়া দেখা যা'ক্ কোথায় গিয়া উঠা যায় অথবা কত দূরে গিয়া অতলে ডুবিতে হয়।—জুয়ায় সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া কেহ কেহ সান্ত্বনার জন্য যেমন মদের বোতলটাকে আঁকড়াইয়া ধরে, আজ মোহিত জীবনের প্রথম সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তেমন করিয়াই সোনালীর উপর মন স্থাপন করিল। সবলে সোনালীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সে আবার বলিল—মাপ কর তুমি।

স্বার্থের দিক হইতে সোনালীর মনের একটা অংশ আনন্দে মুখর হইতে চাহিলেও, মোহিতের ব্যথায় তাহারও হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিল মোহিত আজ তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ব্যথা ভুলিতে চাহিতেছে। কাছে সরিয়া গিয়া সে মোহিতের স্পন্দনবহুল বক্ষে নিজের জলসিক্ত আহত মুখখানি রাখিয়া বলিল—কিছু যে উপায় নেই! —কেঁদে বুক্ ফাটালেও ত আর—

মুখখানি তুলিয়া মোহিতের নীরস ওষ্ঠে সোনালী নিজের ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া বলিল—ও'ঠ, চোখে মুখে জল দেবে চল।

সোনালীর সমবেদনায় মোহিতের হৃদয়ের জমাট বাঁধা দুঃখ এতক্ষণে দ্রব হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—বড় বড় ক' ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া সোনালীর ক্ষত স্থানের ন্যাকড়াখানি ভিজাইয়া দিল। যেন অজ্ঞাতসারেই তাহার হাত দু'খানি সোনালীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের আরও নিকটে টানিয়া লইল।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। সোনালীর তাড়ায় মোহিত প্রত্যহ ১০টার সময় খাইয়া বাহির হয়, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে। আজ কাল তাহার কিছু কিছু রোজগারও হইতেছিল। প্রতি শনিবারেই সে ১৫।২০ টাকা আনিয়া সোনালীর হাতে দিতে লাগিল। অর্থের ধর্ম্মই এই, যখন প্রাণপাত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটা যায়, তখন সে ধরা দিতে চাহে না, যখন তাহাকে দরকার নাই, ধরিবার জন্য আকুলতা নাই, আপনা হইতেই সে কাছে আসিবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরা দিবে।

এই সময় মোহিতের পুরাতন মুরুব্বি, ছগনলাল বাবু মোহিতকে অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফাট্‌কা বাড়ায় তাঁহার কেনা বেচা ছিল, সুযোগ বুঝিয়া তিনি পিয়ারীবাবুর 'ভাতিজাকে' দিয়া মধ্যে মধ্যে ৫।১০ গাঁট্ করিয়া চট্ বা পাট ক্রয় বিক্রয় করাইয়া ফাট্‌কা করাইতে লাগিলেন। মোহিত তখন বাতাসের মুখে ছাইয়ের মত উড়িয়া বেড়াইতেছিল, লাভ লোক্‌সান ভালমন্দ খতাইয়া দেখিবার তাহার কোন স্পৃহাই ছিল না। কয়েক সপ্তাহ এইরূপে Speculationএর পর ছগনলাল বাবু একদিন মোহিতকে বলিলেন, তাঁহার নিকট মোহিতের নামে প্রায় ছয়শত টাকা জমিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা সে ঐ টাকা জমা রাখিয়া একশ' গাঁট পাট খরিদ করুক্; ২।৩ দিনে বাজার খুবই চড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতে মোটা লাভ হইতে পারে। এত শীঘ্র কি করিয়া সে পাঁচ ছয় শত টাকার মালিক হইল, মোহিতের সে ধারনাই হইল না। সুতরাং ছগনলাল বাবুর প্রস্তাবে তাহার আপত্তি করিবারও কিছুই ছিল না। ছগনলালজী সেইদিনই মোহিতের নামে একশত গাঁটের পরিবর্ত্তে দেড় শত গাঁট পাট কিনিলেন। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই সত্যই পাটের বাজার একেবারে আগুন হইয়া উঠিল, খবর আসিল শত্রুপক্ষ কয়েকখানি পাট বোঝাই জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। পাটের দর ১৬৫৲ টাকা হইতে একেবারেই ২০০৲ টাকায় চড়িয়া গেল। ক্রীত পাট বেচিয়া দিয়া ছগনলাল বাবু মোহিতকে হিসাব দেখাইলেন, তাঁহার নিকট মোহিতের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পাওনা হইয়াছে।

ইহার পর ২।৪ বার সামান্য সামান্য লোক্‌সান দিয়াও, কখনও তিসি, কখনও পাট বা তুলা, কখনও চিনি প্রভৃতি কিনিয়া বেচিয়া বা বেচিয়া কিনিয়া মোহিতের মূলধন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে সোনালীও কিছু কিছু রোজগার করিতেছিল। সে যখন দেখিল, সূতা কাটিবার লোক অনেক হইয়াছে, কিন্তু সূতা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় না, মধ্যে মধ্যে তুলার কড়ির উপরেও টান পড়ে, তখন সে মোহিতের অর্থে একখানি তাঁত কিনাইয়া আনিল, নীচের বৈঠকঘরে সেখানি বসাইয়া, মাহিনা করিয়া একজন বৃদ্ধ তাঁতীকে রাখিয়া সোনালী কাপড় বুনা শিখিল। এখন সমস্ত দুপর বাড়ীতে খটাখট্ তাঁত চলিয়াছে।

শোকের বা হতাশার অরুন্তুদ জ্বালা ভুলিবার জন্য অনেকে মাদক দ্রব্যের সাহায্য লয়। কিন্তু যতক্ষণ নেশার পূর্ণ ঘোর থাকে, ততক্ষণই তাহারা স্মৃতির হাত হইতে আংশিক পরিত্রাণ পায়, এমন কি তখনও, সেই মত্ত সুখ-সুপ্তির ভিতরেও দুঃস্বপ্নের ন্যায় স্মৃতি এক এক বার খোঁচা দেয়। মাতালেরও সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে বৈ কি—নচেৎ নেশার ঘোরেও সে কখনও হাসে কখনও কাঁদে কেন? সোনালীর নেশায় আপনাকে ডুবাইয়া রাখিলেও মোহিত স্মৃতি ও বিবেকের দংশন হইতে একেবারেই পরিত্রাণ পাইতেছিল না। হয়ত তাহার বয়স আরও একটু বেশী হইলে বা জগতের অভিজ্ঞতা তাহার আরও একটু অধিক থাকিলে, সে জ্বালা ভুলিতে গিয়া এমন করিয়া আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিত না। জীবনের প্রভাতেই একটা বিষম আঘাতে যখন আশার ভগ্ন

ডুবি হইল, তখন সে সম্মুখে যাহা পাইল বিচার না করিয়াই তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতে চাহিল। কিন্তু হাতের অবলম্বন যে এমন করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দগ্ধ করিবে সে কথা তখন ভাবিয়া দেখিবার তাহার শক্তি ছিল না। তাহা ছাড়া প্রথম যৌবনের অতৃপ্ত লালসা, প্রলুব্ধ হইয়া ইতিপূর্ব্বেই না মোহিতকে এই দিকেই টানাটানি করিতেছিল। সেই জন্যই বোধ হয় আর আশে পাশে না দেখিয়া, এবং অন্য দিকে অন্য শত অবলম্বন থাকিতে পারে তাহা না ভাবিয়াই মোহিত এই সোনালীর প্রেমেই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণের জ্বালা বা বিবেকের তাড়না তাহাকে নিস্তার দিল না। ছগনলাল বাবুর সাহায্যে যখন প্রচুর অর্থার্জ্জন হইতে লাগিল, তখন মোহিতের মনে পড়িতেছিল, এই অর্থের জন্যই সে একদিন তাহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কানপুর হইতে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু আজ অর্জ্জনের উদ্দেশ্য স্বপ্নের মতই চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আবার মনে হইত, দুঃখিনী মা এখনও তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—সে মানুষ হইয়া তাঁহার দাসীত্ব মোচন করিবে। কিন্তু হায়, ফিরিয়া যাইবার, তাঁহার পবিত্র চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার ত মোহিত জন্মের মতই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আরও কিছু দিন গত হইল। সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে আজ মোহিত বাড়ী ফিরিল। কিছুক্ষণ পরে আলো লইয়া সোনালী ঘরে ঢুকিল। আনীত আলোকের এক ঝলক রশ্মি চোখে মুখে পড়িয়াই বুঝি মোহিতের মুখখানি বিরক্তি-কুঞ্চিত করিয়া দিল। চৌকীর উপর আলোটি রাখিয়া সোনালী বলিল,—

দোহাই তোমার, এখনই ঘুমিয়ো না, ডাক্‌তে ডাক্‌তে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে তাহ'লে, যাও, কাপড় গাম্‌ছা রেখে এসেছি, মুখ হাত ধুয়ে, জল টল খাও, তার পর যত পার ঘুমিয়ো। ও'ঠ এখন!

মোহিত উঠিল না, কোনও সাড়া দিল না। সোনালী গায়ে হাত দিয়া একটু নাড়া দিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কী জ্বালাতন কর, যাব'খন যখন খুসী।

সোনালী কয়দিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, মোহিত আজ কাল কারণে অকারণে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঝাঁকিয়া উঠে। এইরূপ মুখ খিচুনী ত এখন সোনালীর দৈনিক পাওনা হইয়াই উঠিয়াছে। ইহাতে প্রাণে ব্যথা বাজিলেও সোনালী কিন্তু রাগ করে না; সে বুঝিয়াছিল রাগ করিবার জোর তাহার নাই। ঝোঁকের বশে মোহিত তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে সমর্পণে এতটুকুও আন্তরিকতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে সোনালীরও অন্তর্রাজ্যে একটা পরিবর্ত্তন হইতেছিল। যতদিন সে মোহিতকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিল না, মোহিতকে পাইবার জন্য ততদিনই তাহার প্রাণে অদম্য আকাঙ্খা জাগিয়াছিল। মোহিত যেদিন হঠাৎ ধরা দিল, সোনালী আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল। কিন্তু দেহের ক্ষুধা যখন দু'দিনেই মিটিয়া আসিতে লাগিল, তখন বড় দুঃখেই সোনালী বুঝিল, তাহার প্রাণ ত শুধু এতটুকুই চাহে নাই। যাহার জন্য প্রাণ তাহার লালায়িত হইয়াছিল তাহা ত সে কণামাত্রও পায় নাই, কোনও দিন পাইবেও না। তাহার প্রতি মোহিতের আচরণে, কই সে ত একটুকুও প্রাণের সাড়া পায় না। মোহিতের স্পর্শে কই, তাহার প্রাণেও ত এখন আর কোনও স্পন্দনই জাগিয়া

উঠে না,—আর ত সোনালীর দেহের প্রতি অণু পরমাণু তেমন করিয়া নাচিতে থাকে না, কেবল একটা তৃপ্তির ঢেউ খেলিয়া যায় মাত্র।

কয় দিন হইতে সোনালী ভাবিতেছিল,—তাইত, সত্যই কি আমি মোহিতকে ভালবাসি? তাহার জন্য আমার সর্ব্বস্বই যদি ত্যাগ করিতে পারিলাম, তবে তাহার প্রাণহীন দেহটাকে টানিয়া পাঁকে ডুবাইয়াই বা কি করিব? আমার নিজেরই বা কি সার্থকতা তাহাতে? কিছুই না, মধ্য হইতে আমার প্রিয়তমের সর্ব্বনাশ করিব। হয়ত এখনও সে মাথা ঝাড়া দিয়া আবার সোজা হইয়া বসিতে পারে, হয়ত কত কেহ এখনও তাহার আশা-পথ চাহিয়া আছে। সোনালী মনে মনে ভাবিত আর কত সঙ্কল্পই করিত, কিন্তু একটা সমস্যার সে কিছুতেই এ পর্য্যন্ত কোনও সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সত্যই যদি সে মোহিতকে ভাল-বাসে, তাহার মঙ্গল কামনা করে, তাহা হইলে মোহিতের জন্যই মোহিতকে ত্যাগ করাই সোনালীর উচিত, কিন্তু, মোহিত তাহাকে ভালবাসুক আর না-ই বাসুক, তাহাকে না দেখিয়া সোনালী কেমন করিয়া বাঁচিবে? অভাগিনী বুঝিতেছিল না এইখানটাতেই ত তাহার ত্যাগের পরীক্ষা, না হইলে ভোগে যখন লালসা প্রশমিত হইল, তখন আর ভোগাকে ছাড়িয়া দেওয়াতে কোনই বাহাদুরী ছিল না, তাহার দেহের ক্ষুধা মিটিয়াছে, প্রাণের ক্ষুধা মিটে নাই; এই ক্ষুধাকে চাপিয়া রাখিয়া জয়ী হইতে পারাই ত শক্তির পরিচয়, ত্যাগের নিদর্শন।

সোনালীর ঠেলাঠেলিতে মোহিত বকিয়া ঝকিয়াও যখন

পার পাইল না, তখন সে নিহাত বিরক্তভাবেই উঠিয়া গিয়া মুখ-হাত ধুইল। নীচে হইতে জলযোগ সারিয়াই আবার সে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই সোনালী আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিকৃতমুখে মোহিত কি বলিতে যাইতেছিল, সোনালী হাত বাড়াইয়া একখানি চিঠি দিল।

এরূপ স্থানে কে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া, হঠাৎ পত্র দিল, ভাবিয়া না পাইয়া মোহিত বিস্মিত ভাবে খামখানি খুলিয়া ফেলিল। সোনালী একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খাম খুলিয়া চিঠিখানি বাহির করিতেই মোহিতের হাত কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানি একেবারে সাদা কাগজ হইয়া গেল, ঝুঁকিয়া বসিয়া সে পত্র পড়িতে লাগিল।

সোনালী দেখিতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মোহিতের মুখের উপর, ছায়া চিত্রের পটের ন্যায় আশা, নিরাশা, লজ্জা, ঘৃণা, কত ভাবই ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার নয়ন দু'টী ক্রমে সজল হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ মোহিত বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সোনালী বুঝিল, এখন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা বিফল, কাজেই সে নিস্পন্দভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

একবার, দুইবার, তিনবার মোহিত চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িল, অনেক অশ্রান্ত অশ্রুও বর্ষণ করিল। শেষবার চিঠিখানি শেষ করিয়া মোহিত বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল, চোখের জলে বালিস্ ভিজিতে লাগিল। সোনালী নিঃশব্দে

আসিয়া তাহার পাশে বসিল। ধীরে ধীরে সস্নেহ কোমল স্পর্শে সে মোহিতের রোদনক্ষুব্ধ মুখখানি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইল, আঁচল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল, তাহার পর নীরবে তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। মোহিত বাধা দিল না, ঘৃণায় এবার আর সোনালীকে ঠেলিয়া ফেলিল না।

রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, সোনালী মোহিতকে উঠিবার জন্য বা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না।

দু'তিন ঘণ্টা এইরূপ নীরবে রোদন করিয়া মোহিতের মনের বোঝা কতকটা হাল্কা হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বসিল, বসিয়া চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিল। তাহার পর কেমন বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়াই রহিল, চিঠিখানি তখনও তাহার হাতে।

সোনালীর প্রাণও ছটফট করিতেছিল, না জানি চিঠিখানায় কি লেখা আছে? এবার সাহস করিয়া সে মোহিতের হাত হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইল, মোহিত একবার তাহার দিকে চাহিল, চিঠি ফিরাইয়া লইল না। সোনালী তখন সেই পত্রখানি পড়িতে লাগিল—

(৩০)

মোহিতদা!

যেদিন একটা মুখের কথাও না ব'লে পালিয়ে এলে, তখন সব কথা না বুঝে তোমার ওপর অনেকখানিই অভিমান হয়েছিল। তারপর যখন, তোমার হঠাৎ কানপুর ত্যাগের উদ্দেশ্য জান্‌লুম, তখন মনে মনে বড় ব্যথা বেজেছিল, মনে হয়েছিল বুকখানা বুঝি সত্যই ভেঙ্গে গেল।

ভাগ্য-নিরূপিতা

অনেক দিন পর্য্যন্ত থেকে থেকে একটা আশা হ'ত হয়ত বা তুমি নিজের স্বার্থটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌বে না, ঐশ্বর্য্যশালী পিয়ারী বোসের সৌভাগ্যবান জামাই হওয়ার চেয়ে গরীব ভিখারিনীর প্রাণের পূজোটাই বড় মনে ক'রবে। তুমি আমায় চিঠি লিখ্‌বে, এ আশাও হঠাৎ ত্যাগ ক'রতে পারিনি। কিন্তু যখন অপেক্ষার পর অপেক্ষা ক'রেও, তোমার কোন খবরই পেলুম না, পাছে আমি গায়ে প'ড়ে তোমায় কোনও কথা লিখি সেই ভয়েই ও' বাড়ীতে পর্য্যন্ত তোমার ঠিকানাটা পাঠালো না, তখন বুঝ্‌লুম সত্যই আমার কপাল ভেঙ্গেছে।

আশা যখন ছাড়্‌তেই হ'ল তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাবনাও ছেড়ে দিলুম, যা' হয় হ'ক্, তা'তে আমার কি? তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একদিন আমার বি'য়ের সম্বন্ধ এল, অম্নিই বাবা আমাদের নিয়ে কল্‌কাতায় চ'লে এলেন। বি'য়ের দিনও ঠিক হ'ল। কিন্তু কোথায়, কা'র সঙ্গে বি'য়ে কিছু না জান্‌তে পেরে মা বড় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন। আমার কিন্তু সে সব ভাবনা একটুও ছিল না—চিরদিনের নিশ্চিতকেই যখন ত্যাগ ক'র্‌তে হয়েছে, তখন আর নিজের সুখ দুঃখের কোন তোয়াক্কাই ত আমার ছিল না। বাবা শেষ পর্য্যন্তই পাত্রের কথা গোপনেই রেখেছিলেন, ভালই করেছিলেন, নয়ত মা বোধ হয় একটা অনাবশ্যক গোলমাল বাঁধাতেন।

হঠাৎ সেজোর জর হ'ল বি'য়ের দিন পিছিয়ে গেল। এমন সময় দাশুর মুখে তোমার খবর পেয়ে কি জানি কেন, প্রাণটা একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, তোমার খোঁজ নিতে গিয়ে তোমার অধঃপাতের সব খবরই শুন্‌লুম।

ভাগ্য-নিরূপিতা

ছিঃ, কিসের লোভে, কি ক'রে তুমি এতটা গোল্লায় যেতে পার্লে! এই জন্যেই কি অমন ক'রে কানপুর ছেড়ে এসেছিলে? এই তোমার উন্নতি করা! আমি না তোমার পথে কাঁটা হ'ব না ব'লেই, একটা কথা না ব'লেও নীরবে তোমার উন্নতির পথ থেকে স'রে এলুম, নারী জীবনে যার বাড়া আর অভিশাপ নেই সেই অভিশাপ নিজের মাথায় তুলে নিলুম্? আর, তুমি? তুমি এমনই হীন অপদার্থ হ'য়েছ, নিজের সব আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে দুঃখিনী মায়ের বড় আশায় ছাই দিয়েছ, অকারণে আমার জীবনটাকেও—যা'ক,—তোমার ভাবী স্ত্রী বিশ্বাস-পরায়না স্নেহ, তা'র হাসি মুখে চির অন্ধকারের কালি ঢেলে দিয়েছ, কেন, কিসের টানে, শুনি?

খবর শুনেইত প্রাণের আমার যেটুকু অস্তিত্ব ছিল, ঘৃণায়, ধিক্কারে সেটুকুও শেষ হ'য়ে গেল। তারপর কি হ'ল শুন্‌বে?—দেবেন বাবু—মমতাদি'র পরিত্যক্ত স্বামী—আরও খোলসা ক'রে বলি, যার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নিয়ে তুমি মাতাল হ'য়ে র'য়েছ, সেই দেবেন রায়ের সঙ্গে আজ একমাস হ'ল আমার বি'য়ে হ'য়ে গিয়েছে। তার আগে আমি বিষ খেয়ে মরিনি বা কোথাও পালিয়ে যাই নি। খুবই দোষ ক'রেছি, না? যা'ক্ সে বিচার ক'রবার তুমি এখন কেউই নও।

হাঁ, মনে ক'র্চ্ছ হয়ত, আজ পরের স্ত্রী হ'য়ে কি ক'রে আমি তোমায় এত কথা লিখ্‌ছি? কিন্তু আমি ত কা'কেও ভয় করিনা, আমার আবার মঙ্গল, অমঙ্গল কি? তাঁর হাতেই চিঠি ছাড়্‌তে দে'ব, ইচ্ছে হয় পড়ে দেখ্‌বেন।

ভাগ্য-নিরূপিতা

মনে ক'রো না আমার নিজে দুর্ভাগ্যের ভাগ দেবার জন্য তোমায় আমি এত কথা লিখ্‌ছি। কিন্তু জেনো তোমার সহানুভূতিকেও আজ আমি ঘৃণা করি। আজ কি আর তুমি মানুষ আছ?

তবে কেন লিখ্‌ছি শুন্‌বে? পরে নিজের এই অধঃপাতের জবাবদিহি ক'র্‌তে গিয়ে পাছে তুমি আর কা'কেও জড়াও তাই আগে থেকেই তোমার সে আশা ভেঙ্গে দিচ্ছি। আর, আগের কথা মনে ক'রে, এখনও তোমায় ব'ল্‌ছি—নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখ, কি ছিলে তুমি, আর কি হ'য়েছ এখন—কোথা থেকে কোথায় প'ড়েছ! কাপুরুষ, লম্পট, তুমি এত বড় অন্ধ হ'য়েছ, একবার তোমার মনে হয় না, তোমার তেজস্বিনী মা, এসব কীর্ত্তি শুন্‌লে হয়ত, দম্ ফেটেই মারা যাবেন? তোমার আশ্রয়দাতা, পিতার সমান স্নেহময়, পিয়ারী জেঠা মনে কতখানি কষ্ট পাবেন, হয়ত তিনি আর কখনও তোমার মুখও দেখ্‌বেন না। আর সেই নির্ভরশীলা স্নেহ, তার মনের ভাব কিছুই কি তোমার চোখে প'ড়তো না? তার কি গতি হবে বল্‌তে পা'র? ফিরে যাও, গায়ের ময়লা ঝেড়ে ফেলো, যা' গিয়েছে আর ত তা' ফিরে পাবে না, হেলায় যে তা'কে বিদায় ক'রেছ। এখন নিজের জন্যে না হ'ক পরের মুখ চাইতে চোখ চাও!

ছিঃ মোহিতদা, আজ তোমার কথা ভাব্‌তেও আমার যেন অসহ্য ঘৃণা হ'চ্ছে। প্রথমে, তোমার এতখানি অধঃপাতের কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি নি, কিন্তু দাশুকেও বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে শেষটা আর বিশ্বাস না ক'রে থাক্‌তে পারিনি। মা'ও সব কথাই

শুনেছেন। এখনও ফিরে যাও প্রায়শ্চিত্ত কর, কাপুরুষের মত অন্ধকারে আত্মগোপনের মিছে চেষ্টা ক'রো না।

ভাবছ সেই মিন্‌মিনে ইন্দুটা আজ এত কথা কোথায় শিখ্‌লে?—কিন্তু সে ইন্দু আর নেই, সে অনেকদিন হ'ল ম'রে গেছে, তার দেহে এখন একটা প্রেতাত্মা এসে বাসা ক'রেছে।

বেশ নিরুপদ্রবেই আছি। দুঃখ ত আর কিছুই নেই, সুখ দুঃখ সবই যখন এক হ'য়ে গেছে তখন একটাকে আর একটা থেকে আলাদা ক'রে কি হবে! ইতি—

ইন্দু।

(৩১)

পত্র পড়িয়া, সহসা যেন সোনালীর আজন্মের রুদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া গেল,—হাঁ ইহারই নাম ভালবাসা বটে! এমন করিয়া ভালবাসার জন্য ভালবাসাকেই ত্যাগ করিতে না পারিলে, আত্মবলি দিয়া ভালবাসার আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে, কিসের ভালবাসা? যাহাকে ভালবাসি তাহার পথ রোধ করিয়া তাহাকে অন্ধকারে চাপিয়া মারা, সে ত ভালবাসা নহে, সে যে লালসার আত্মগ্রাসী ক্ষুধা!

সত্যই ত যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যে নিজের প্রাণের চেয়ে, আপনার সুখ দুঃখের বড় করিয়াই ভালবাসিতে হয়। তবে সোনালী এ কি করিয়াছে? মোহিতকে সে ভালবাসে, খুবই ভালবাসে মনে করিয়া তাহার কত বড় সর্ব্বনাশ সে করিয়াছে! বাস্তবিকই সে কি মোহিতকে ভালবাসে? তাহা হইলে কি এমন

করিয়া সে মোহিতকে পাপের পাঁকে ছুপিয়া ধরিতে পারিত? না, মোহিতকে সে একদিনও বুঝি ভালবাসে নাই! শুধু তাহার নবোদ্গত যৌবন-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে লালসা ভরা প্রাণে তাহার দিকে ধাবিত হইয়াছিল!

সোনালীর নয়ন সজল হইয়া উঠিতেছিল, জানি না, কি ভাবিয়া তাহার দুইটি চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ বুঝি ইন্দুর প্রাণের পূতস্পর্শ বহিয়া আনিয়া এই সামান্য কাগজখানি সোনালীর স্বার্থ ভরা প্রাণের পঙ্কিলতা চাঁচিয়া ফেলিতেছিল, তাই ব্যথায় তাহার হৃদয় রাঙিয়া উঠিতেছিল। সোনালী নীরবে সেখান হইতে উঠিয়া গেল, নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর সে বিনিদ্র শয়নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিস্ বিছানা ভিজাইতে লাগিল। নীচে কখন সে ভাত চাপাইয়া আসিয়াছিল, ভাত ফুটিয়া ফুটিয়া শুকাইয়া উঠিল, তাহার পর মাটীর হাঁড়িটা ফাটিয়া জ্বলন্ত উনানের ভিতর পড়িয়া গেল।

এদিকে, এক হাতে চোখ দু'টি চাপিয়া ধরিয়া মোহিত নতমুখে ভাবিতে ছিল। এই মাঘের রাত্রেও তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে।

ধ্বংসের পর প্রকৃতি ভস্মস্তূপে আপনার নগ্ন-রিক্ততা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সহসা ঝড় উঠিয়া ভস্ম উড়াইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল, প্রোথিত কঙ্কালরাশি বাহির হইয়া আবার অট্টহাস-বিকাশ করিল।

যেমন করিয়াই হউক, একদিন মোহিতের একটু পদস্খলন হইয়াছিল, তাহার পরেই দেবেনের সহিত ইন্দুর বিবাহ সংবাদে

তাহাকে একেবারে অতল পঙ্কে নিক্ষেপ করিল। জগতের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া, হতাশার জ্বালায় জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া মোহিত আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র করিল না, পঙ্কে ডুবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিল।

আজ ইন্দুর পত্র পড়িয়া মোহিতের চক্ষুর সম্মুখ হইতে ঘন কৃষ্ণ মেঘখানি সহসা সরিয়া গেল। মোহিত দেখিল, অদৃষ্টের হস্ত রহস্যময় জাল রচনা করিতেছে। ইন্দুর দোষ নয়, দেবেনের অপরাধ নাই, সোনালী উপলক্ষ্য মাত্র; অদৃষ্ট মোহিতের প্রতি বিরূপ, যত দোষ অপরাধ মোহিতের নিজেরই।

ইন্দু শুনিয়াছে, সারদা পিসি শুনিয়াছেন, কানপুরেও সকলে মোহিতের অধঃপাতের বিষয় জানিয়াছে, মা ও সব জানিয়াছেন। বিধবা জীবনের আশাস্থল, এক মাত্র পুত্রের অধঃপতনে বিমলা সত্যই হয়ত দম ফাটিয়া মারা গিয়াছেন, পিয়ারী বাবুর গৃহে আর মোহিতের প্রবেশাধিকার নাই, তাহার শৈশব সঙ্গীরা ঘৃণায় বিমুখ হইয়াছে। তাহার জীবন আকাশ হইতে ইন্দু চিরতরে অদৃশ্য হইয়াছে! তবে আর মোহিতের বাঁচিয়া লাভ কি, এ দগ্ধ জীবনে কি সুখ? মরিলেই ত সব জ্বালা জুড়াইবে, লজ্জা, গ্লানি ঘুচিয়া যাইবে, মরণেই মোহিতের শান্তি। মোহিত এবার মরিবে।

(৩২)

নিজের ঘরে আসিয়া সোনালী আবার ভাবিতে বসিল। আজ নূতন করিয়া অনেক কথাই তাহার মনে উঠিতে লাগিল;—মোহিতের আগমনের পূর্ব্বের এক একটি স্মৃতি মনে উঠিয়া

সোনালীর হৃদয়খানিকে যেন ছুরি দিয়া চিরিয়া চিরিয়া ফেলিতে লাগিল। এই একটু পূর্ব্বেই ত সোনালী মনে করিয়াছিল, মোহিতকে ধরিয়া রাখিয়া লাভ কি, বরং তাহাতে মোহিতেরই সর্ব্বনাশ। কিন্তু এখন ভাবিতে বসিয়া সোনালী বুঝিল, মোহিতকে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুস্কর ও অসাধ্য। মোহিতকে বিদায় করিয়া দিয়া সোনালী কেমন করিয়া, কি লইয়া আবার বাঁচিয়া থাকিবে? মোহিত তাহাকে ভাল না-ই বাসুক তবুও তাহার সান্নিধ্যটাই যে এখন সোনালীর জীবনের একমাত্র আকাঙ্খিত সুখ। এত সেবা যত্ন, এই অগাধ অপার ভালবাসা, ইহার কি কোনও মূল্য নাই? এত করিয়াও কি সোনালী মোহিতকে সুখী করিতে পারিবে না? নিজের অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য যদি সোনালীর আজীবন তুষানলের ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে মোহিতও ত সেই পাপে পাপী, সেইবা কেন আবার সাধু সাজিয়া সমাজের বুকে ফিরিয়া যাইবে? জগতে কেহই যদি সোনালীর মুখ না চাহিল, তবে সে-ই বা কেন পরের মুখ চাহিয়া নিজের অভিশপ্ত জীবনের একমাত্র দীপ-শিখাটি নিজ হাতেই নিভাইয়া দিবে?

আর মোহিত যদি তাহার বলা না বলার অপেক্ষা না রাখিয়াই চলিয়া যায়, ইন্দুর আজকার পত্র পড়িয়া মোহিতের এরূপ করা বিশেষ বিচিত্র নহে, বরং স্বাভাবিকই, তাহা হইলে সোনালীর কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে? সোনালী কাঁদিবে, না হয় মরিবে। মরিবে! হাঁ একটু পূর্ব্বেও যে, সে মনে করিতেছিল আত্মত্যাগেই ভালবাসা—তবে সে ত্যাগ স্বইচ্ছায় ত্যাগ, আর মোহিত চলিয়া যাইবে, সোনালী নিরুপায়, আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইবে—এ

আত্ম-বিনাশ, দু'টিতে অনেক প্রভেদ। সোনালী পত্র পড়িয়া ভাবিয়াছিল, ইন্দুর ভালবাসাই আদর্শ ভালবাসা কিন্তু সোনালী ঘৃণিতা বেশ্যামাত্র, ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ এসব বড় বড় কথা মনে করিবার তাহার কি অধিকার? সে মোহিতকে চায়, যতক্ষণ সম্ভব তাহকে ধরিয়া রাখিবেই।

সোনালী মোহিতকে যেমন করিয়াই হউক ধরিয়া রাখিবে। —কিন্তু তাহাতে সোনালীর পিপাসা মিটবে কি? হায়, শুধু দেহটার ক্ষুধা তৃপ্তির জন্যই কি সোনালী নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পথে বসিতে উদ্যত হইয়াছিল—এত দিন ধরিয়া সে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া এমন করিয়া একটা অজানা, কপর্দ্দকহীন মরণাপন্নের দাসীবৃত্তি করিয়াছিল? না, না, এ ত শুধু লালসা নয়, মোহিতকে চোখের আড় করিলে সত্যই যে সোনালী প্রাণে বাঁচিবে না। সোনালী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলুথালু বেশে মোহিতের ঘরে উপস্থিত হইল। খাটের পাশে আসিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল; মোহিতের সুপ্ত মুখখানিতে তখনও চিন্তা ও একটা দারুণ দুঃখের ছাপ লাগিয়াছিল। ইন্দুর চিঠিখানি মোহিতের মুখের পাশে, সোনালীর ব্যবহৃত উপাধানের উপর উন্মুক্ত পড়িয়াছিল। মোহিতের নিদ্রাভঙ্গ করিতে সোনালীর ভয় হইল। ক্ষুধিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে মোহিতের প্রতি চাহিয়া সে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সোনালীর মনে পড়িল, রোগ মুক্তির পর মোহিত যেদিন চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সেই দিনকার কথা, সেদিনও না মোহিতকে হারাইবার আশঙ্কায় সোনালীর

প্রাণ এমনই জ্বলিয়াছিল। তবে সে দিনকার সে জ্বালা অপেক্ষা আজকার এ জ্বালা কী তীব্রতর! হায় মরুর বুকে যতদিন জলস্পর্শ হয় নাই ততদিন তাহার তৃষ্ণা কতখানি উগ্র ও প্রচণ্ড তাহা যে কল্পনারই অতীত ছিল। গত কয় মাসে সোনালী যে বুঝিয়াছিল তাহার বুকে কত খানি তৃষ্ণা জমাট বাঁধিয়া আছে। সোনালীর গণ্ড বাহিয়া নীরবে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। ভিতরে বাহিরে তখন গভীর নিস্তব্ধতা, শুধু, নিদ্রিত মোহিতের ক্লিষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছিল; খোলা জানালাটা দিয়া কতকগুলি পতঙ্গ আসিয়া আলোটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, একটি টিকটিকী সুযোগ মত মধ্যে মধ্যে এক একটি পতঙ্গ ধরিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছিল।

মোহিত একবার একটু নাড়িয়া নিদ্রাঘোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিল। সোনালী অমনি রুদ্ধ আবেগে হঠাৎ নত হইয়া মোহিতের মুখের উপর পড়িয়া সবলে তাহার মুখখানি নিজের উত্তপ্ত নগ্ন বক্ষে চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ নিদ্রার ব্যাঘাতে মোহিত একবার আঃ করিল, তাহার পর একটু সজাগ হইয়া, বাম হাতে আনত সোনালীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

সোনালী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—না, তুমি যেতে পাবে না—কখোনো না।—আরও সজোরে সে মোহিতের মুখখানি চাপিল।

মোহিত নিজের হাত নামাইয়া লইয়া সোনালীকে মুখের উপর হইতে সরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—আঃ নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে যে, সর।

সোনালী রোদন-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—ব'ল তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না—

সোনালীর স্ফীত বক্ষের চাপে বাস্তবিকই মোহিতের শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। এবার একটু জোরে সোনালীকে ঠেলিয়া দিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোহিত বলিল—হুঁ যা'ব, কোথায় যা'ব আমি?—সোনালীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ঘুমাওনি বুঝি এখনও?

—না, ব'ল তুমি, যাবে না।

কি উৎপাত! ব'ল্‌ছি ত, যা'ব কোথায়?

—কেন, ইন্দু যে তোমায় বাড়ী ফিরে যেতে লিখেছে?—এতক্ষণে যেন মোহিতের সব কথা মনে পড়িল, আর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—ওঃ এই নিয়ে এত হাঙ্গাম! তা এক যমের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও ফিরবার মুখ রেখেছ' কি তুমি আমার?

খোঁচাটা একবারে গিয়া সেনালীর আঁতে বিঁধিল বটে, তবুও ইহাতে সে যেন কি একটা আশ্বাস পাইল—সত্যই তোমার ফির্‌বার উপায় নেই, যাবে না তুমি?

মোহিত শুধু একটি 'না' বলিয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া নীরব হইল। সোনালী তাহার শিয়রে বসিয়া বালিসের ঝালরটি লইয়া নীরবে নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

হঠাৎ মোহিত উঠিয়া বসিল, সেনালীর বেদনা কাতর আর্দ্র মুখের উপর কতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—সোনালি! সত্যই কি তুমি আমায় এত ভালবাস?

সহসা এরূপ প্রশ্নে সোনালী বিস্মিত হইল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোহিতের মুখের উপর জলভরা দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—কি ব'ল্‌ব? বেশ্যা আমি—

বাধা দিয়া মোহিত বলিল—আচ্ছা, মর্‌তে পার তুমি আমার সঙ্গে ?

—তোমার সঙ্গে মর্‌বো, তার চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ?—চুপ করিয়া সোনালী যেন কি ভাবিয়া লইল, তার পর বলিল—কিন্তু তুমি মর্‌বে কেন ? কিসের দুঃখ তোমার ? ধিক্কার হ'য়ে থাকে ঘরে ফিরে যাও, আবার তোমার সবই হবে। জোর ক'রে আমি তোমায় ধ'রে রাখবো না, তোমার ওপর কি জোর আছে আমার ?

—ঘরে ফিরে যা'ব বৈকি—যে দিন ফির্‌বার পথ ছিল সে দিন বড় ফির্‌তে পেরেছিলুম ! আমার ওপর তোমার কি জোর তাই আবার জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছ তুমি ? জান না কি, আমায় কি কুহকেই ফেলেছ' তুমি ?:রাক্ষসি, আমার মনুষ্যত্ব, চরিত্র, সুখের কল্পনা সবই ত খেয়েছ, এখন বাকী আছে শুধু এই নিরস হাড় ক'খানা, খাও, এ গুলোও খেয়ে ফেল, আমি সব জ্বালার হাত এড়াই।

একটু থামিয়া আবার সে বলিতে লাগিল—জান কি এই ইন্দুকে জ্ঞান হ'য়ে অবধি আমি কত ভালবাস্‌তুম্ ?—প্রথম জীবনে সে-ই আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, তা'কে ঘিরে' কত সোনার স্বপ্ন গড়ে' তুল্‌তুম্। ইন্দু এখন আমার জীবন থেকে একেবারে স'রে চ'লে গেছে। এর আগে, ফিরে যেতে, আবার মানুষ হ'তে' আমার কি ইচ্ছা হয়নি ?—তোমার এমন সাধ্যও ছিল না যে জোর ক'রে ধ'রে রাখ। তবুও জানি না কেন যেতে পারিনি। নিজের এই অকারণ দুর্ব্বলতায় যে, কি ঘৃণা কি ধিক্কার হয়েছে আমার, তা তুমি কি বুঝ্‌বে ? এখনও যেতে পারি না, শক্তি নেই। এ হীনতাও আর

সহ্য হয় না। জীবনটা আমার একটা দুর্ব্বহ বোঝা হ'য়ে উঠেছে। এখন মরনই আমার এক মাত্র গতি।

স্তব্ধ হইয়া সোনালী শুনিতেছিল, আর তাহার প্রাণের কোন্ নিভৃত কোণে কি একটা আনন্দ-কণা চিক্‌মিক্ করিতেছিল—সত্যই কি তবে সোনালীর এ ব্যাকুল প্রেম একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই ?

—যেতে ইচ্ছা কর তুমি, তবুও যেতে পার না, কেন ?

—কেন ? কেন তা'কি জান না ডাইনি! নিজের দুর্ব্বহ ধিক্কারের জন্য তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি না বটে, তবুও কি তুমি বুঝ্‌তে পার না, কি মোহে আমায় আচ্ছন্ন রেখেছে—তোমায় ছেড়ে যাবার আমার শক্তি কই ? নিজের অনিচ্ছাতেও বুঝি আমি তোমাকে ভালবাসি। তবে সে ভালবাসা, দীপশিখার জন্য পতঙ্গের ভালবাসা—শুধু পুড়ে' ছাই হ'বার জন্যই বটে!

একি তৃপ্তি! সোনালীর আজ কি হইল! সরিয়া আসিয়া সে আর্দ্র মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিল। মোহিতের ওষ্ঠস্পর্শে আজ সোনালীর সমস্ত দেহে একটা শান্তি মাখা তৃপ্তির ঢেউ খেলিয়া গেল। মোহিতের কপোলের উপর নিজের সিক্ত গণ্ড রাখিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল—নিষ্ঠুর! এতখানি সুখ থেকে তবে কেন আমায় এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলে? এতটুকুও যদি ভালবেসে থাক, তবে কেন জানাওনি, জান্‌তে দাওনি আমায় ?

মোহিত উত্তর দিল না, দুই বাহু দিয়া সোনালীকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। সোনালীর জীবন আজ সফল হইয়াছে, তাহার প্রাণের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। তাহার অভিশপ্ত জীবনে আজ কেমন করিয়া কোথা হইতে এত সুখ উঠিল!

সোনালী ভাবিল, সাধ ত মিটিল, সোনার স্বপ্ন ত সফল হইল, কিন্তু পরিণাম? মোহিতের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়াও সোনালী বুঝিল, এ প্রেমের পরিণাম বিচ্ছেদে। এমন করিয়া এখন যদি এই অপার আনন্দের স্পন্দন বক্ষে লইয়া সোনালী মরিতে পারিত! মোহিতও ত সেই কথাই বলিতেছিল। সেই ভাল, দুই জনেই এমন করিয়া অনন্তের পথেই যাত্রা করা যাউক!

কিন্তু না তাই বা কেন, মোহিত গেলে অনেকের ক্ষতি হইবে, আর, সোনালী হয়ত নিজের পাপ রজ্জুতে টানিতে টানিতে মোহিতকে কোন্ অন্ধকার নরকে লইয়া ফেলিবে। সোনালী হঠাৎ বলিল—তোমার সব গ্লানি মুছে যাবে, মনের এ অশান্তিও ঘুচে যাবে। একদিন তোমার জীবন মরণের ভার আমার হাতে দিয়ে বিশ্বাস ক'র্‌তে পেরেছিলে, তখন ত তুমি আমায় জান্‌তে না, চিন্‌তে না। আজ তোমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে দিয়ে বিশ্বাস কর! আত্মহত্যা ক'রে তোমার কালি মুছ্‌তে হবে না, তা'তে আরও কালি মাখ্‌বে। ওসব কুমতলব মনে এনো না। আমায় বিশ্বাস কর, আর দু'টো দিন সবুর কর, তোমায় আমি দেখিয়ে দেব—দেখ্‌বে তোমার সাম্‌নে সোজা পথ।

সোনালীর দৃঢ়স্বরে মোহিত বিস্মিত হইল, কিন্তু দু'দিন পরে সোনালী কোথায়, কেমন করিয়া তাহার জন্য কি পথ আবিষ্কার করিবে সে বুঝিতে পারিল না। অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—কেন দু'দিন পরে কি হবে?

সোনালী কোনও উত্তর দিল না, উঠিয়া গিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া আসিয়া বলিল—রাত ত শেষ হ'ল, একটু ঘুমাও

(৩৩)

গত রাত্রি অনাহারেই কাটিয়াছিল, সোনালী আজ সকাল সকাল রান্না চড়াইল। আহারাদি করিয়া মোহিত উপরে গিয়া শুইয়া পড়িল, রাত্রে ঘুম হয় নাই, শরীর ভাল ঠেকিতেছিল না।

দুপরে ঝি নিত্যকার মত তাহার বাসায় ফিরিতেছিল, সোনালী তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, উপরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কতক্ষণ পরে একখানি কাগজ ও দুটি টাকা আনিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়া সোনালী পাঁচ মিনিট ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাকে কি উপদেশ দিল। ঝি চলিয়া গেল, দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া সোনালী নাম মাত্র একবার আহারে বসিল। তাহার পর উপরে গিয়া দ্বারের ফাঁক্ দিয়া দেখিল মোহিত ঘুমাইতেছে। তখন সোনালী নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। একে একে নিজের কাপড় জামা, যেখানে যা কিছু ছিল টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া সোনালী মেঝের উপর এক স্থানে সেগুলি স্তূপ করিল। মোহিতের জিনিস পত্র গুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিল। নিজের বাক্স হইতে একখানি ব্যাঙ্কের বই ও চেক্ বই বাহির করিয়া ক্যাশ বাক্সে রাখিয়া দিল, সব চাবি গুলি একত্র করিয়া একটা নূতন রিংএ পরাইল।

সব কাজ যখন সারা হইয়া গেল, সোনালী কাপড় জামার স্তূপের পাশে কাঁদিতে বসিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে মোহিত বাহিরে যাইতেছিল, সোনালী রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—সমস্ত দিন বেরুলে না, এখন সন্ধ্যের সময় কোথায় যাচ্ছ ?

সোনালীর চোখ মুখ আরক্ত, বোধ হয় রান্না ঘরের ধোঁয়াতেই।

মোহিত ঠাট্টা করিয়া বলিল—কেন ভয় হয় নাকি? তা কাকের এঁটোতে কেউ মুখ দেবে না, ভয় নেই।

সোনালী তিরস্কার পূর্ণ কাতর দৃষ্টি উন্নত করিয়া বলিল—যেও না।

—সমস্তদিন গণ্ডির বা'র হইনি, একটু ঘুরেই আসি না।

—না, ওপরে এস।

গত রাত্রের ঝড়ের পর আজ সমস্তদিনটাই যেন কেমন একটা গুমট্ ভাবেই কাটিতেছিল। সোনালী আজ সর্ব্বক্ষণ মোহিতের আশে পাশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখে আজ যেন কি একটা গভীর বিষাদের ছায়া লাগিয়া ছিল। মোহিতেরও মনের অবস্থা অন্য দিন অপেক্ষা আজ ভাল ছিল না, ইন্দুর পত্রের এক একটা লাইন এখনও তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

মোহিত উপরে ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সোনালী গুটি কতক পান হাতে লইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বেশে ঘরে ঢুকিল। মোহিত তখন খোলা জানালাটার পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। পাশের বাড়ীর আলিসার উপর দু'টি পায়রা বসিয়াছিল।

সোনালী পান দিয়া মোহিতের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওরাও কেমন সুখী!

মোহিত অন্যমনস্কে শুধু বলিল—হুঁ!

সোনালী মোহিতের পাশে দাঁড়াইয়া কপোত কপোতীর

প্রেমাভিনয় লক্ষ্য করিতেছিল আর অন্যমনস্কে তাহার একখানি হাত মোহিতের আঙ্গুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল।

মোহিত হাসিয়া সোনালীর দিকে চাহিল, তাহার হাতখানি একটু টানিল। সোনালী সাড়া দিল না। মোহিত তখন বলিল—তোমার আবার হ'ল কি ? সমস্ত দিন অমন মুখ ভার ক'রে রয়েছ কেন ? ভয় হচ্ছে নাকি ?

সোনালী তবুও কথা কহিল না। মোহিত আবার বলিল —বাইরে যেতে দিলে না কেন ?

পায়রাটি ফট্ ফট্ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী একবার ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিবিষ্টচিত্তে ডানা খুঁটিতে ব্যাপৃত হইল। সোনালী বাহির হইতে উদাস দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। একবার কাসিল, যেন কি বলিতে গেল। দৃষ্টি নত করিয়া আবার একটু চেষ্টা করিয়া বলিল—আর একবার বল—

মোহিত বিস্মিত ভাবে বলিল—কি ব'লব ?

ঘরের মেঝের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সোনালী এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—তুমি তামায় ঘৃণা কর না—

সোনালীর এরূপ সলজ্জভাব মোহিত আর কোন দিনই দেখে নাই—বারাঙ্গনা সে, তাহার এমন সরম বা সঙ্কোচভাব কোথা হইতে আসিল ? মুগ্ধ কণ্ঠে মোহিত বলিল—তোমায় ঘৃণা করি না সোনালী, তোমায় ভালবাসি, তাই আমি আমকেই ঘৃণা করি।

সোনালী নত হইয়া মোহিতের ওষ্ঠে সুদীর্ঘ চুম্বনে প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল। উঠিয়া বলিল—গান শুনতে ভালবাস তুমি, গান গাইব' ?

—গাওনা, আজ যে এত দয়া ?

মোহিতের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোনালী গাহিতে লাগিল,—

আসিল সন্ধ্যা অকূল জীবন পাথারে,
ভাঙ্গা তরী হায় যায় ডুবে যায় !
বিদায় বিদায় !
ডাকিছে কে ঐ আকাশ বাতাস আঁধারে
"আয়্ আয়্ আয় আয় ছুটে আয়"
বিদায় বিদায় !!
বিফলে গেল এই অপার পথে আসা
মাটি মাখা গায়, ভাঙ্গিল হৃদয়
বিদায় বিদায় !
আঁধার রাতে হ'ল শেষ অকূলে ভাসা
যাই চলে যাই ডেকেছে আমায়।
বিদায় বিদায় !!

শুনিতে শুনিতে মোহিত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে পড়িল সেই একদিন, যেদিন সোনালী তাহার এই পাগলকরা সুরে ক্ষুধিত প্রাণের ব্যাকুল কামনা নিবেদন করিয়াছিল—সেই দিন এক মুহূর্ত্তেই মোহিতের জীবনের গতি হঠাৎ ফিরিয়া গিয়া একটা আবর্জ্জনাময় বদ্ধ নালায় পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। আজ আবার সোনালী এ কি কুহেলী ছড়াইতেছে—মোহিতের জীবনে কি এবার দ্বিতীয় প্রলয় উপস্থিত ! কেন এ অনিশ্চিত আশঙ্কা ? কি অভিলাস সোনালীর প্রাণে আজ ?

গান শেষ করিয়া সোনালী উদাস কাতর দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মোহিত বলিল—ও কি গান! ও গান গাইবার মানে?

বাহির হইতে বেদনা ভরা দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া মোহিতের মুখের উপর রাখিয়া সোনালী কতক্ষণ পরে বলিল—

—মনে এল' গাইলুম, মানে আর কি? কি গান তোমার ভাল লাগবে বল।

—না, না, আর তোমার গাইতে হবে না এখন ও'ঠ, বড় খিদে পেয়েছে, গানে আর পেট ভরবে না।

সোনালী উঠিয়া নীচে গেল। রান্না ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া কতক্ষণ সে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে আঁচলের খুটে চোখ ডলিতে ডলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মোহিতের খাবার সাজাইতে বসিল।

(৩৪)

পরদিন আহারাদি করিয়া মোহিত বাহিরে যাইতেছিল। আঁচল দিয়া পানের কৌটাটি মুছিতে মুছিতে সোনালী আসিয়া বলিল—একটা কথা বল্‌বো, রাগ করবে না?

—কি কথা না শুনে, কি ক'রে বলি রাগ কর্ব্বো কিনা?

সোনালী ঢোক্ গিলিয়া বলিল—আমার এক মাসি আছে, সে-ই আমায় মানুষ করেছিল, খবর পেলুম্ তার ভারী অসুখ; আমায় একবার সে দেখ্‌তে চেয়েছে। যাব একবার সেখানে?

গম্ভীর মুখে মোহিত বলিল—সে তোমার ইচ্ছা।

কাতর কণ্ঠে সোনালী বলিল—রাগ ক'রো না, ভাল মুখে বিদায় দাও, আর ত কখনও—সোনালী ঢোক্ গিলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার আঁখিদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মোহিত শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—আমি কি তোমায় যেতে বারন কর্চ্ছি, না ধরে রাখ্ছি?

সোনালী ব্যথিত করুণ নয়ন দু'টি উন্নত করিল। তাহার হাত হইতে পানের কৌটাটি লইয়া মোহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সোনালী ঘুরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন-ক্ষুদ্ধ স্বরে বলিল—ব'লে যাও, ভাল মুখে অনুমতি দিয়ে যাও, আর ত তোমায় বিরক্ত কর্বো না।

সোনালীর ভাবগতিকে এবার মোহিত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।—এ আবার কি! তোমার মাসিকে তুমি দেখতে যাবে আমার বারন কর্বার কি আছে? বারন কর্লে তুমি শুন্বেই বা কেন?

—শুন্বো কেন? নিষ্ঠুর! যদি জান্তে তোমার জন্য আজ আমি—সোনালীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া মোহিত এবার কোমলস্বরে বলিল—আজ কি হয়েছে তোমার? কেন অমন ক'র্চ্ছ, ও সব কি কথা বল্ছ? যেতে ত তোমায় একবারও বারন করিনি আমি, তবে এ অভিমান কেন?

—অভিমান! মোহিতের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া সোনালী বলিল—অভিমান না, আমার বড় ভয় কর্চ্ছে, সমস্তদিন বুকের মধ্যে কেমন কেমন ক'রে উঠ্ছে—বল আমায় তুমি মাপ কর্ব্বে

দুই হাতে সোনালীর মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া মোহিত কয়েক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, সোনালী আবার মুখ লুকাইতে চেষ্টা করিল। নিকটেই একখানি টুল ছিল, মোহিত নিজে তাহার উপর বসিয়া সোনালীকে টানিয়া জানুর উপরে বসাইল। তাহার পর সস্নেহে বলিল—তুমিও যদি এমন ক'র সোনালী, আমি তবে কোথায় দাঁড়াই ব'ল? তোমার মনের মতলবটা খুলে বল দেখি আমায়, অকারণে কেন এমন উতলা হচ্ছ আজ?

সোনালী মোহিতের কাঁধের উপর মুখ রাখিয়াছিল। আবেশ আবেগে তাহার সমস্ত দেহ শিথিল হইয়া আসিতেছিল।—না, সোনালী এতখানি সৌভাগ্য স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারিবে না। পরে যা হয় হউক, সোনালীর মরণ ত আর কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।—মোহিতের সহানুভূতি স্রোতে সোনালীর সব সঙ্কল্পই বুঝি ভাসিয়া যায়! দুই বাহু দিয়া সোনালী নিবিড়ভাবে মোহিতকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

টং টং করিয়া পাশের বাড়ীর ঘড়িতে অনেক গুলি বাজিয়া গেল—বোধ হয় বারটা। সোনালী চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—তোমার পা ব্যথা করবে যে, ছিঃ গা'য়ে পা লেগে গেল—সোনালী নত হইয়া মোহিতের পায়ের ধূলা লইল।

মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ও আবার কি, তুমি না বল বয়সে আমি তোমার ছোট?

সোনালী আত্মদমন করিয়া লইয়াছিল, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ওঃ ভুলে গিয়েছিলুম, সত্যিই ত, যা'ক্ তার আর হয়েছে কি? বারটা বেজে গেছে—তোমার বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।—একটু

থামিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া বলিল—দুপরের পর আমি যা'ব। ঝি বাড়ীতেই থাক্‌বে, ও' ঘরে গ্রেকের গায় চাবি রইল—সোনালীর স্বর ধরিয়া আসিতেছিল—রাগ কর্ব্বে না? তুমি—

মোহিতের মুখখানি আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল, শুধু, আচ্ছা, বলিয়া সে হন্‌হন্ করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। সোনালী বুক ভাঙ্গা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া কতক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া মোহিতের উপাধানে মুখ গুঁজিয়া কান্নার বাঁধ ছাড়িয়া দিল।

(৩৫)

অন্যদিন অপেক্ষা দেরী করিয়াই আজ মোহিত বাসায় ফিরিতেছিল—সোনালী হয়ত এখনও ফিরে নাই। কড়া নাড় দিতে ঝি দ্বার খুলিয়া দিল। মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—সোনালী ফেরেনি এখনও?

ঝি অনুচ্চস্বরে বলিল—চুপ। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়া সে উপরের দিকে দেখাইল। নির্দ্দেশমত উপরের দিকে চাহিয়া বারাণ্ডায় অস্পষ্টালোকে মোহিত দেখিল—সোনালী রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মোহিত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল উঠান পার হইতে রান্না ঘরের খোলা দরজা দিয়া এক ঝলক আলো আসিয়া মোহিতের মুখের উপর পড়িল।

তখনও ৫।৭টা ধাপ উঠিতে বাকি আছে, মোহিত সবিস্ময়ে দেখিল, সোনালী ত্বরিতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি নারীমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন। আর দু'পা বাড়াইয়া

মোহিতের গতিরোধ হইয়া গেল, ভয়ে বিস্ময়ে, সে বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়াই রহিল।

নারীমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—কে, মনু ?

মোহিত অসাড় নিস্পন্দ, পা দুটি কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ-তালু মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া উঠিল। বিমলা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—ওপরে উঠে আয়, ওখানে অমন ক'রে দাঁড়ায়ে—

খট্‌খট্ করিয়া বাহিরের কড়া নড়িয়া উঠিল। মোহিতের চমক ভাঙ্গিল, প্রথমে মনে হইল ছুটিয়া গিয়া সে মায়ের পায়ে লুটিয়া পড়ে। মুখ তুলিতেই চোখে পড়িল, সোনালী দ্বারের পাশ হইতে ঘরের মধ্যে সরিয়া গেল। মোহিত আবার মাথা নত করিয়া তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, প্রথমে সমর ও পশ্চাতে খাবারের টুক্‌রী কাঁধে কানাইয়া প্রবেশ করিল।

কাছে আসিয়া মোহিতের মাথার উপর হাত রাখিয়া মা বলিলেন—ভাল আছিস্ মনু, চেহারা এমন হয়েছে কেন ?

মায়ের স্পর্শে মোহিতের শরীরে হঠাৎ একটা উৎকট প্রবাহ খেলিয়া গেল, আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া বিমলার পায়ে পড়িল।

পশ্চাৎ হইতে সশব্দে মোহিতের পিঠে চাপড় দিয়া সমর বলিল—এই যে মোহিতদা! ব্যাপার কি ? উঃ কী দুর্ভাবনাটাই কেটে গেল। এখন বলত তোমার কাণ্ড খানা কি ?

এমন করিয়া চারিদিক হইতে বেষ্টিত হইয়া মোহিত আরও ঘাবড়াইয়া গেল, একবার মা'য়ের মুখের দিকে একবার সমরের মুখের দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

মোহিতকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সমর তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি এখনো? মুখ ধুয়ে তিনিও বাইরে গেলেন, আমিও দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের যোগাড়ে গেলুম। ওঃ কী গলির মধ্যে বাসাটা তোমার! ঠিকানা বার কর্ত্তে ত আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তার পর বাড়ী যদি মিল্‌লো তো মালিকের আর দেখা নেই।

সমরের বাক্য স্রোতে পড়িয়া মোহিতের বিমূঢ় ভাব এতক্ষণে যেন কতকটা কাটিয়া গিয়াছিল। একবার কাসিয়া গলাটা পরিস্কার করিয়া লইয়া বলিল—কখন এলে তোমরা?

বিমলা এতক্ষণ পুত্রের এই বিমূঢ় বিস্মিতভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। মাতৃহৃদয়ে তখন কি ভাবের বন্যা বহিতেছিল কে বলিবে?

সমর বলিল—তা ঘণ্টা দেড়েক হবে। কাকীমা, কানাইয়া-বেটা এখনি কর্ত্তামো কর্ত্তে গিয়ে সব খাবারগুলো মাটী কর্‌বে'খন, আপনি যান্, শীগ্‌গীর ক'রে যোগাড় ক'রে দিন্, খিদেয় আমার পেট জ্বলে গেল।

তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে মোহিত যে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতেছে, বুঝিতে পারিয়া, বিমলা সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন।

রেলিংএর পাশে ভিদের উপর বসিয়া পড়িয়া সমর বলিল—তারপর মোহিতদা, তোমার কাণ্ডখানা কি খোলসা ক'রে বল দেখি। আমার কাছেই না হয় প্রথমে রিহার্সালটা দিয়ে রাখ, তারপর বাবার কাছে আবৃত্তি করো'খন। প্রায় এক বৎসর হ'ল কল্‌কাতায় এসেছ তুমি, প্রথমে ২।১ খানা পত্র দিয়েছিলে, তারপর

একেবারেই নিরুদ্দেশ। কাকীমা, খুবই চাপা, নইলে অন্য মা হ'লে এরকম অবস্থায় কি ক'রে বস্‌তেন বল দেখি? তারপর মাস দেড়েক আগে পিসিমা—

মোহিতও সমরের পাশে বসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার কাঁধের উপর হঠাৎ হাত রাখিয়া সমর সংযতস্বরে বলিল—ইন্দুর বে'র ব্যাপার শুনেছ কিছু?

মোহিত শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল—হাঁ জানি।

—মাস দেড়েক আগে পিসিমা একখানা চিঠি দিয়েছিলেন মাকে, তা'তে লিখেছিলেন—'মোহিতের খবর পেয়েছি, তার খুব অসুখ হয়েছিল, এখন সেরেছে, কোথায় আছে এখনও ঠিকানা জানতে পারিনি, পার্লে জানাব'। বাশ্‌ তারপর কোনও খবর নেই আর। বুধবার রাত্রে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম গেল—Mohit in great danger come at once to save him.'—কে পাঠাচ্ছে কিছু বোঝা গেল না, কোনও নাম নেই, নীচে শুধু এই বাড়ীর ঠিকানা দেওয়া। বাবা ত প্রথমে কিছুই ঠিক্ কর্ত্তে পার্লেন না, তারপর নিজে আসাই সাব্যস্ত কর্লেন। কাকীমা বল্লেন তিনিও আস্‌বেন। আমার ত এখন কলেজ বন্ধ, আমিও আস্‌তে চাইলুম। মা বল্লেন সেনাটা ত কখনও কলকাতা দেখেনি ওটাও তবে সঙ্গে যা'ক্, দেখে শুনে আসবে।'

সপাং করিয়া মোহিতের বুকে আবার চাবুক পড়িল, অধীর ভাবে সে বলিয়া উঠিল—সেনাও এসেছে, ও'ঘরে তবে ও সো-সোন—

সমর হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—হ্যাঁগো হাঁ,—ও'ঘরে

ও সো-সোনা না, সেনা, তোমার প্রিয় ছাত্রী ও ভাবী কর্ত্রী।'

মোহিতের হৃদয় মধ্যে যেন ফুটন্ত পারদ ঢালিয়া দেওয়া হইল, জ্বালায় তাহার হৃদয় অবশ হইয়া আসিল।

এতক্ষণে সমরের খেয়াল হইল, সে নিজেই ত বকিয়া যাইতেছে, মোহিতদা ত বিশেষ কিছুই বলিতেছে না। বাক্যস্রোত একটু সংযত করিয়া বলিল—এক বৎসরেই তোমার এতখানি পরিবর্ত্তন কি ক'রে হ'ল মোহিতদা'? সত্যই মোহিতদা', তুমি যেন আর সে মোহিতদা'ই নও।

অন্যমনস্ক ভাবে মোহিত বলিল—পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তনের আর অপরাধ কি! হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—বাইরে ত তবুও মানুষের চেহারাই আছে এখনও—কেন এলে তোমরা? কার জন্যে এ কোথায় এসেছ? এর আগে আমার মরাই যে ছিল ভাল।

সমর অবাক্ হইয়া মোহিতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার হতভম্ব ভাব চোখে পড়িতেই মোহিত একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—হঠাৎ তোমাদের সবাইকে দেখে আমার কেমন মাথা গুলিয়ে গেছে, মাপ কর ভাই।

সমর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঝি আসিয়া মোহিতের সম্মুখে একখানি চিঠি ধরিয়া বলিল—আপনাকে দিতে বলে গে ছেন।

যন্ত্র চালিতের মত হাত বাড়াইয়া মোহিত চিঠিখানি লইল, লেখাটা দেখিতে চেষ্টা করিল, স্বল্পালোকে ভাল দেখা গেল না। সমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—জামা কাপড় ছাড়'গে মোহিতদা', আমি ততক্ষণ দেখি কাকীমা ও দিকে ক'দ্দূর কি কর্লেন।

সমর নীচে নামিয়া গেল। খামখানি খুলিতে খুলিতে মোহিত অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকিতেই, স্নেহ পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। মোহিত সবিস্ময়ে দেখিল স্নেহ তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিল। কিন্তু স্নেহও ইহার মধ্যে এমন হইয়াছে! সদা চঞ্চল মুক্ত-প্রকৃতি স্নেহ আজ লজ্জানত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোহিত এক পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবার নীরবেই আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। লজ্জা-নম্র স্বরে স্নেহ বলিল—এই যে এখানেই কাপড় গামছা।

ঘটনাস্রোত আজ যেন মোহিতকে একটির পর আর একটি উত্তাল তরঙ্গের উপর নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহার যেন সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতেছিল। এসব কি স্বপ্ন? না, মোহিত আজ সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে!

মোহিত তাহার সহিত কথা কহিতেছে না দেখিয়া অভিমান ক্ষুণ্ণ স্বরে স্নেহ বলিল—আমরা এসেছি ব'লে কি রাগ ক'রেছ?

—রাগ! না না, কারও ওপরে রাগ কর্‌বার অধিকার যে আমি নিজে থেকেই হারিয়ে ফেলেছি স্নেহ! তা নয় তবে আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে, কি ক'রে কি হ'ল, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

হাতের অ-পঠিত পত্রখানির উপর লক্ষ্য পড়িতে মোহিত আলোর কাছে সরিয়া গেল, চৌকীর উপর বসিয়া বলিল—এক মিনিট আমায় মাপ কর, চিঠিখানা পড়ে দেখি।

ভাঁজ খুলিয়া মোহিত পড়িল—

প্রিয়তম !

সকালে বিদায় নিতে কেন অমন ব্যাকুল হয়েছিলুম এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে। সে বিদায় ত শুধু দু'ঘণ্টারই বিদায় নয়, সে যে আমার চির বিদায়।

তোমায় ছেড়ে চ'লে যেতে প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে মোহিত! জীবনে কখনও আপনার ব'লে কা'কেও ভালবাস্‌তে পাইনি আমি, তোমায় পেয়ে, আমার সে অভাব পূর্ণ হয়েছিল, বুঝেছিলুম ভালবাসা কি। অভাগিনীর জীবনে একদিনের তরেও যে এতখানি সুখ সৌভাগ্য ছিল, কখনও তা কল্পনাও করিনি। তবুও আজ আমায় সব ত্যাগ ক'রেই যেতে হবে, বুক ভেঙ্গে চুরমার্ হ'য়ে গেলেও যেতে আমাকে হবেই। কেন?—ওগো তোমায় যে আমি বড় ভালবাসি মোহিত, তোমার এ হীনতা, বুকজোড়া দুঃখ আর যে আমি দেখ্‌তে পারি না। সত্যই তুমি সংসারের কিছুই জান না, একেবারেই অবুঝ তুমি, কি জানি অনুশোচনায়, প্রাণের তাড়নায় কখন তুমি কি ক'রে বস্‌বে, সেদিন রাত্রেই ত তুমি মর্‌বার সঙ্কল্প কর্চ্ছিলে। তাই আমি আজ তোমার জীবনের সব কাঁটা নিয়ে নিজেই সরে যাচ্ছি। তুমিই যদি জগত থেকে চলে যাও, তবে আর আমি কি নিয়ে রাক্ষসী, বসে থাক্‌বো? তার চেয়ে আগে থেকেই আমার ভালোয় ভালোয় বিদায় নেওয়াই ভাল। তোমার জীবনে কত কর্ত্তব্য আছে এখনও, এখনও কত সুখের আশা আছে। আমার এ পাপ জীবনে আর কি আছে কে আছে মোহিত? তাই আজ তোমার জন্যই আমি তোমাকে ত্যাগ করে' যাচ্ছি প্রিয়তম!

ভাগ্য-নিরূপিতা

আর দু'দিন পরে আমার এ রাক্ষসি ভালবাসা তোমার কাল হ'য়ে দাঁড়াতো, এখন আর সেটা হবে না, এই না আমার শেষ সান্ত্বনা।

হয়ত তোমার মনে একটু ব্যথা লাগ্‌বে, তুমি রাগ কর্‌বে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ভুল বুঝো না তুমি, ক্ষমা ক'রো।

যাবার সময় তোমার সঙ্গে একটা প্রতারণা ক'রে যাচ্ছি— কানপুরে আমিই গোপনে 'তার' পাঠিয়েছিলুম্ কারণ, আমি বিদায় হ'লেও হয়ত তুমি ঘরে ফিরে না যেতেও পার, তাই যা'তে তোমার ফির্‌বার পথ সহজ হয় তাই ক'রে যাচ্ছি। আমার অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব মুছে নিয়েই যাচ্ছি; তোমার যা' কিছু পাপ, যা' কিছু ময়লা সবই আমি আমার সঙ্গে' নিয়ে যেতে চাই। আত্মহারা হ'য়ে তুমি আমার এতখানি চেষ্টা পণ্ড করো না। আমার জন্য দুঃখ ক'রো না তুমি, তোমার জন্য এমন ক'রে আত্ম-বলি দিতেও আজ আমার প্রাণে কি একটা গর্ব্ব মাথা উঁচু ক'রে উঠ্‌ছে।

তুমি জান, আমি তোমায় কতখানি ভাল বেসেছিলুম, তুমিও যে আমার ওপর একেবারেই বিরূপ ছিলে না তা'ও আমি বুঝতুম, শেষটা স্বীকারও করেছিলে তুমি। কিন্তু ভেব দেখ' এ ভালবাসার পরিণাম কি? এ ক'মাস ধরে তোমার প্রাণে অহঃরহঃ যে কি আগুণ জ্বল্‌ছিল তা' কি আমি বুঝতুম্ না! তবুও আমি তোমায় পুড়িয়ে ছাই কর্‌বার মতলবেই ছিলুম। সে দিন ইন্দুর চিঠি পেয়ে হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়—এ আমি কি ভুল ক'রেছি, রাক্ষসি আমি তোমায় ভালবাসতে গিয়ে

তোমার যে সর্ব্বনাশ ক'রে বসেছি! বুঝে তবুও নিজের কর্ত্তব্য স্থির কর্ত্তে পারছিলুম্ না। তারপর সেই রাত্রে তোমার একটা কথাতেই আমার পথ পরিস্কার হ'য়ে এল, সাহস ক'রে তাই তোমায় বলেছিলুম—দু'টো দিন সময় দাও আমাকে, তারপর দেখবে তোমার পথ পরিস্কার।

আমার প্রাণে যে কি হচ্ছে তা' কি ক'রে বল্‌বো তোমায় মোহিত? বলেই বা লাভ কি! জগতে যে আমি পাওয়ার মত কিছুই পাইনি, পেয়েছিলুম শুধু তোমাকে, সে যে কত বড় পাওয়া, আজ এই শেষ দিনে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

যা'ক আর বেশী কিছু লিখবো না, লিখতে গেলে যে কথা আর ফুরুবে না; সময় কেটে যায়, কি জানি হয়ত কি দুর্ব্বলতা এসে পড়বে।

শেষ অনুরোধ, তোমার জন্যই আজ আমি এমন ক'রে অনন্ত আঁধার বরণ ক'রে নিচ্ছি, তুমি আমার এ চেষ্টা পণ্ড করো না—ফিরে যেও, যদি সম্ভব হয় স্নেহকেই বি'য়ে ক'রো, ভাল হ'য়ে সুখী হয়ো—আর—আর কখনও হয়ত অভাগিনীর কথা মনে ক'রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রো।

বিদায়, প্রিয়তম আমার, আমার সোনার স্বপ্ন, বিদায়। ইতি

চির দুঃখিনী
সোনালী।

পুঃ—মিছে আমার খোঁজ ক'রো না— মিছে মনে কষ্ট পাবে; মিনতি রে'খ আমার।

যা' কিছু রইল, সবই তোমার রোজগারের, আমার যা' কিছু ছিল, জান'ত সবই বিলিয়ে দিয়েছি, নষ্ট করে ফেলেছি।

প্রণাম নিও মোহিত আমার!

"তোমার সোনালী।"

সোনালী যতদিন কাছে ছিল, সে যে মোহিতের জীবনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল, ততদিন মোহিত ঠিক তাহা বুঝে নাই। আজ যেন মোহিতের দৃষ্টির সম্মুখে অপার শূণ্য জাগিয়া উঠিল—সোনালী নাই! সত্যই সে আর আসিবে না? কোথা যাবে রাক্ষসি!

মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নেহ কাছে আসিয়া সহানুভূতি কোমল কণ্ঠে বলিল—কোনও খারাপ খবর কি? মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন? কোথায় যাচ্ছ আবার এখনি?

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া মোহিত বলিল—জান কি তোমরা, কত অপদার্থ হীন আমি? জান্‌লে তোমাদের এ করুণা, সহানুভূতি সব শুকিয়ে যেত, ঘৃণায় তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে। জান কোথায় কিসের জন্য ছুটে যেতে চাচ্ছি আমি? কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান্‌লে ওখানেই তুমি লজ্জায় পাথর হ'য়ে যেতে!

স্নেহ সহজ কণ্ঠে বলিল—অত চেঁচিও না, কাকীমারা কি মনে কর্ব্বেন। আমি জানি,—ইন্দুদি আমায় দু একটা কথা লিখেছিল। এসেছিও আমি সেই জন্যে। ও নিয়ে তোমায় এখন অত মন খারাপ কর্ত্তে হবে না।

মোহিত আশ্চর্য্য হইল—একি! স্নেহ এত কথা শিখিল কেমন করিয়া? একদিন না এই স্নেহের আব্দার অভিমানে তাহাকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, আর আজ সেই স্নেহ এত বড় ব্যাপারট জানিয়া শুনিয়াও কেমন করিয়া এত সহজে চাপা দিতে চাহিতেছে? বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় মোহিত তাহার মুখের দিকে চাহিল। স্নেহ দৃষ্টি নত করিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সমর ডাকিল—কই মোহিতদা জামা কাপড় ছাড়া হবে না?

সোনালীর চিঠিখানি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া মোহিত জামার বোতাম খুলিতে ব্যস্ত হইল।

সমর আসিয়া হাসিয়া বলিল—কি মাষ্টার মশাই ছাত্রীর পরীক্ষা নিচ্ছিলে নাকি এতক্ষণ? আচ্ছা মোহিতদা, বাড়ীটা ত বেশ ফিট্‌ফাট্ রেখেছ, পছন্দটাও তোমার দেখ্‌ছি মন্দ নয়। কত ভাড়া দিতে হয় বাড়ীখানার?

মোহিত ত সে কথা জানে না, সোনালীই যে সংসারের সব খবরই রাখিত। মনে পড়িতে মোহিত অন্যমনস্ক হইল। সমর আবার জিজ্ঞাসা করিল—কত ভাড়া দাও মোহিতদা'?

মোহিত কি বলিবে? এবারও যেন সে শুনিতে পায় নাই,—সে বলিল—জল খেয়েছ তুমি?

—বাঃ সেই জন্যই ত আমি ডাকৃতে আস্‌ছিলুম্ তোমাকে! চল, চল, কাকীমা খাবার দিয়ে ব'সে আছেন।

মোহিতকে ঠেলিতে ঠেলিতে সমর নীচে লইয়া গেল

(৩৬)

মোহিতকে কলিকাতায় আসিতে দেওয়া পিয়ারীবাবুর সেরূপ ইচ্ছা ছিল না, শুধু বিমলার আগ্রহ দেখিয়াই তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। তখন তিনি সন্দেহও করেন নাই, মোহিত দূরে গিয়া তাঁহার অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু প্রথম একমাস বিমলাকে মাত্র দুই খানি পত্র দিয়াই মোহিত যখন সংবাদ দেওয়া বন্ধ করিল, এবং নিজের ঠিকানাটিও পর্য্যন্ত কাহাকেও জানাইল না তখন পিয়ারীবাবু স্বভাবতঃই একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। ইহার পর ৪।৫ মাস যখন মোহিতের আর কোনই খবর রহিল না, তখন গম্ভীর প্রকৃতি বিমলার অব্যক্ত উৎকণ্ঠার কথা মনে করিয়া পিয়ারীবাবুর হৃদয় অনেকখানি চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিলেন কলিকাতায় গিয়া একবার মোহিতের খোঁজ করিবেন। এমন সময় বিষ্ণুপুর হইতে সারদার পত্র আসিল, তাহাতে মোহিতের সংবাদ ছিল বলিয়াও বটে আর ইন্দুর বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপার শুনিয়াও বটে, কলিকাতায় আসার সঙ্কল্প তিনি তখনকার মত ত্যাগ করেন। দিন কতক পরে স্নেহ বুঝি ইন্দুর একখানি পত্র পায়। সেইদিন হইতে স্নেহের যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল।

এদিকে বিমলাও ইদানীং আর মনের উৎকণ্ঠা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। পিয়ারীবাবু বিষম ভাবনায় পড়িলেন। মোহিতের এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? অসুখ করিয়াছিল, অসুখ সারিয়াছে এখনও তবে সে খবর দেয় না কেন?

এমন সময় তাঁহার নামে এক টেলিগ্রাম আসিল—মোহিতের বড় বিপদ, সত্বর আসিয়া তাহাকে রক্ষা করুন।

পিয়ারী বাবু পরদিন সকাল ৮টার মেলেই কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিলেন। শুনিয়া বিমলা বলিলেন, তিনিও যাইবেন। লক্ষ্মীর হুজুগে পড়িয়া সেনা ও সমর সঙ্গে আসিতে চাহিল। স্নেহের আগমনে পিয়ারী বাবু প্রথমে অমত করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী তাঁহাকে নিভৃতে বলিয়াছিলেন—মেয়ে আর ছোট্টটিই নেই। দেখ্‌তে পাও না মেয়ে ক'দিন থেকেই কেমন মন মরা মন মরা হ'য়ে বেড়াচ্ছে, নিজে সে যখন যেতে চাইছে, নিয়ে যাও।

কলিকাতায় পৌঁছাইয়া অনেক খোঁজা খুঁজির পর তবে মোহিতের বাসা মিলিল। মোহিত বাসায় নাই, ঝি বলিল, মোহিত ভালই আছে, কাজে গিয়াছে। সকলে অনেকখানি আশ্বস্ত হইলেন।

পিয়ারী বাবু হাত মুখ ধুইয়া সবে একটু বিশ্রাম করিতে বসিতেছেন এমন সময় ঝি আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিয়া গেল, তাঁহারই পত্র, পড়িলে সবই বুঝিতে পারিবেন। তাড়াতাড়ি পিয়ারীবাবু খাম খুলিয়া পড়িলেন—

মহাশয়!

শুনিয়াছি আপনি খুবই পণ্ডিত ও ক্ষমাশীল, পরের জন্য আপনার হৃদয় করুণায় পূর্ণ। তাই আজ সাহস করিয়া, আপনাকে সকল কথা জানাইতেছি। প্রথমেই আমার পরিচয় দেওয়া উচিত, কিন্তু অভাগিনী আমি জগতে কোনও পরিচয় না লইয়াই জন্মিয়াছি। তবে, কায়মনোবাক্যে আমি মোহিতের মঙ্গল কামনা করি, এই

ভাগ্য-নিরূপিতা

আমার উপস্থিত পরিচয়, অন্য পরিচয় আর কি দিব? আমিই আপনাকে 'তার' পাঠাই, আজ আপনি নিশ্চয়ই আসিবেন, এই আমার বিশ্বাস, তাই আপনাকে এ চিঠি লিখিয়া রাখিতেছি। কেন যে 'তার' পাঠাইয়াছিলাম, সেই কথাই এখন আপনাকে জানাইতে চাহি।

মাস আট দশ পূর্ব্বের কথা, এই বাড়ী তখন দেবেন রায়ের অধিকৃত ছিল। তবে এই সময় সে নিজে এখানে বড় একটা আসিত থাকিত না, মাস খানেক হইতেই সে অনুপস্থিত ছিল, তাহার এক বিশ্বাসী চাকর—দাশুর পাহারায় আমি এ বাড়ীতে একাই বাস করিতেছিলাম।

একদিন সকাল বেলা, আমি নীচে ছিলাম না, ইতিমধ্যে দাশু এক সংজ্ঞাহীন পীড়িতকে এই বাড়ীতে আশ্রয় দিল। আমি নীচে আসিতে দাশু বলিল—লোকটি তার দিদিবাবুর ভাই, দেবেন বাবুর শালা। পরের বিপদে মাথা দিবার আমার নিজের তখন ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়াই আমাকে দাশুর কাজে সায় দিতে হইল। তাহার পর কেমন করিয়া কি হইল,—কি একটা অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হইয়া আমি নিজেই রোগীর সেবায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অসহায়, নিরাশ্রয়কে দেখিয়া কি জানি কেন মনে আমার কেমন একটা মায়া হইল, আমার ছোট ভাই কেহ থাকিলে সে হয়ত ইহারই বয়সী হইত। দেবেন রায়ের কোন খবরই নাই, আপনাদের ঠিকানাও তখন আমার জানা ছিল না। মোহিত ত তখন নিউমোনিয়াতে সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য।

আমার যা' কিছু সম্বল ছিল ... স্ব পণ করিয়া, প্রায় একমাস

ধরিয়া মা'য়ের মত উৎকণ্ঠায়, ভগিনীর মত স্নেহ যত্নে ও প্রাণপাত সেবায় সে যাত্রা মোহিতকে যমের মুখ হইতে ছিনাইয়া লইলাম। তার পর মোহিত যে দিন আমার পরিচয় শুনিল, এক মুহূর্ত্তেই সব ভুলিয়া গিয়া সে তখনই এখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখনও তাহার শরীরে এতটুকু শক্তি ফিরে নাই যে পায়ে ভর দিয়া সে দাঁড়ায়, তবুও সে পথে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে সেও ভাল, কিন্তু অস্পৃশ্যা বেশ্যার কাছে সে আর ঋণী হইতে চাহে না। শেষে কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে এখানেই থাকিতে হইল—হঠাৎ সেই দিনই আবার তাহার জ্বর হইল।

দু'মাস পরে একদিন দুপরে দেবেন রায় দেখা দিল, নিদ্রিত মোহিতকে দেখিয়া সে কি ভাবিয়া গেল, সেই জানে। মোহিতের সংস্পর্শে আসিয়া ইতিমধ্যে আমার এই অভিশপ্ত জীবনে একটা তুমুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। সেটা দেবেন রায়ের বোধ হয় ভাল লাগিল না, তা'র মনে বোধ হয় একটা প্রতিহিংসা ভাবই উঠিয়াছিল। যা'ক্ সে কথা। মোহিতের সুস্থ হইতে দেরী হইতে লাগিল। সে কিছুতেই আপনাদের নিজের বিপদের কথা শুনাইতে চাহে না। আমারও তখন সমস্ত সম্বল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

এমন সময় দাশু একদিন খবর দিয়া গেল—মোহিতের নামে কলঙ্ক রটাইয়া ও রাজাবাবুকে প্রলোভনে বশ করিয়া দেবেন রায় ইন্দুকে বিবাহ করিয়াছে।

খবরটি শুনিয়া মোহিত একেবারে মুস্ড়াইয়া গেল। একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াও সে আর পরিচিত কাহাকেও মুখ দেখাইতে

রাজী হইল না, কি যেন একটা দারুণ ধিক্কারে ও শোকে তাহার জীবনের উপর অশ্রদ্ধা হইয়া গেল।

চারদিন পূর্ব্বে মোহিত ইন্দুর একখানি পত্র পায়—ইন্দু তাঁহাতে দেবেনের রচিত কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিয়া মোহিতকে খুবই ভৎর্সনা করে। সেই রাত্রে মোহিত সঙ্কল্প করে, আত্মহত্যা করিয়া সে তাহার কলঙ্কিত জীবনের শেষ করিবে। নিরুপায় হইয়া আমি আপনাকে আসিবার জন্য 'তার' করি, মোহিতকে দু'দিনের জন্য কোনও রকমে নিরস্ত রাখিয়াছি।

মোহিতের ভাল করিতে গিয়া আমি যে তা'র কতখানি অনিষ্ট করিয়াছি তা' এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; হত্যা করাই যে বিষের ধর্ম্ম। তাই আজ আমি মোহিতের সমস্ত বালাই লইয়া বিদায় হইতেছি। আমার এ নিস্ফল প্রাণে আজ যে আমি কতখানি ব্যথা লইয়া যাইতেছি! জগতে আসিয়া কখনও আমি কাহাকেও আপনার বলিয়া যত্ন করিতে, স্নেহ করিতে পাই নাই। আমি মোহিতের উপকার করিতে গিয়াছিলাম এই আমার ভীষণ অপরাধ। জগত যদিও আমায় ভুল বুঝে, আর কেহ যদিও আমায় ক্ষমা না করে, আপনারা মোহিতের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী আপনারা হয়ত আমাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। বিপদে পড়িয়া অসহায় জ্ঞানহীন অবস্থায় মোহিত আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, না জানিয়া অস্পৃশ্যার সেবা গ্রহণ করিয়াছিল—এই তাহার অপরাধ। আমার শেষ কথায় বিশ্বাস করিবেন—এ'র বেশী আর কোনও স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে সে অপরাধী নহে। নিজের অনভিজ্ঞতা বশে সে নিজের অপরাধকে পর্ব্বত প্রমাণ কল্পনা করিয়া

হতাশ হইয়াছে, লজ্জায় ঘৃণায় জীবনের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে। এখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া, শাস্তির পরিবর্ত্তে যদি স্নেহের প্রলেপে তাহার মনের জ্বালা নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সে একদিন আবার সুখী হইবে, শান্তি পাইবে। আপনাদেরও সে জন্য কোন দিনই অনুতাপ করিতে হইবে না।—আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির কথা অনেক সময় নিষ্ফল হয় না শুনিয়াছি, তাই আমি এমন জোর করিয়াই আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ কথা বলিয়া যাইতেছি। মোহিতকে ক্ষমা করিবেন, ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, নির্ভাবনায় স্নেহদান করিবেন।

আপনার পায়ের ধূলা লইবার আমার অধিকার নাই, সে স্পর্দ্ধাও নাই আমার; দূর হইতেই এ অস্পৃশ্যা প্রণাম করিতেছে অপরাধ লইবেন না, দয়া হয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। মোহিতের জন্য আমার এ আত্ম বিসর্জ্জন যেন বিফল না হয়। ইতি

"অভাগিনী।"

পত্র পড়িয়া উদার হৃদয় পিয়ারী বাবুর অন্তরে কি হইয়াছিল কে বলিবে? তখনই তিনি ব্যস্ত হইয়া নীচে গিয়া ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে এ চিঠি দিয়ে গিয়েছে, সে কখন এখান থেকে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে, কিছু জান তুমি?

ঝি সঠিক বিশেষ কিছুই খবর দিতে পারিল না—সোনালী বেলা ৪টার সময় মাসির বাড়ী যাইতেছি বলিয়া একবস্ত্রে একাই বাহির হইয়া গিয়াছে; চোর বাগানের মোড়ে ট্রামের রাস্তার উপরেই বুঝি তাহার মাসি থাকে।

একটু ঘুরিয়া আসিতেছি বলিয়া পিয়ারী বাবু তাড়াতাড়ি

বাহিরে আসিয়া একখানি ভাড়াটে গাড়ী করিয়া চোর বাগানের মোড়ে চিৎপুর রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক মিনিট চিন্তিত ভাবে ফুটপাথের উপর পায়চারী করিয়া তিনি বুঝিলেন তাঁহার এ অনুসন্ধান ইচ্ছা বাতুলতা মাত্র—সত্যই কি আর সোনালী তাহার মাসির কাছে আসিয়াছে—যদি আসিয়াই থাকে, তিনি ত ঠিকানা জানেন না, নাম জানেন না, কেমন করিয়া কাহাকে খুঁজিবেন! এখনও যদি সে বাঁচিয়া থাকে—খুঁজিয়াও যদি তাহাকে বাহির করেন—কিন্তু তাহার পর কি হইবে? হায় অভাগিনি!

বিষণ্ণ মনে ভাবিতে ভাবিতে পিয়ারীবাবু পদব্রজেই বাসা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৩৭)

জলযোগ করিতে বসিয়া নতমুখে মোহিত হুঁ, না করিয়া কোনও গতিকে মায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সমরের প্রশ্নজাল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া আশ্রয় লইল। সমর কানাইয়াকে দিয়া বেডিংগুলি খুলাইয়া বিছানাপত্র বাহির করিতে ব্যস্ত হইল। মা রান্নার চেষ্টা দেখিতেছিলেন, স্নেহ তাঁহার সাহায্যে তৎপর হইল।

সোনালীর ঘরে ঢুকিয়া মোহিত দেখিল—যেখানে যে জিনিসটি যেমন ছিল সবই ঠিক তেমনই আছে, নাই শুধু সোনালী। মোহিতের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যগুলি একটা সযত্ন স্নেহের স্পর্শ বুকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছে, ব্রেকের গায়ে চাবি গুলি ঝুলিতেছে। অন্যমনস্কভাবে একটা টানা খুলিতেই মোহিত দেখিল সোনালী তাহার হাতের প্লেন্ রুলি দু'গাছিও খুলিয়া রাখিয়া

গিয়াছে। মোহিতের অসুখের সময় সোনালী নিজের চুড়ি ক'গাছি নষ্ট করিয়া মোহিতের পথ্য জোগাইয়াছিল, মোহিত উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, সোনালী এই রুলি দু'খানি কিনিয়াছিল। বাক্‌সো ফেলিয়া মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

হায়! চারিদিকেই সোনালীর স্মৃতি—কিন্তু সোনালী কই? সোনালী চলিয়া গিয়াছে! আর আসিবে না? মোহিতের শত অনাদর বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া আর সে হাসি মুখে তাহার সেবা করিতে আসিবে না? নিজের দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতেই মোহিতের নয়ন সজল হইয়া উঠিল—হায় অভাগিনীকে সে যে এক দিনের জন্যও ভাল মুখ দেয় নাই। তবুও মোহিতের সেবা করিতে পাইলে সে কতই না আনন্দ পাইত। মোহিতের মনে পড়িল ইন্দুর বিবাহ সংবাদে আত্মহারা হইয়া সে যখন সোনালীকে ফেলিয়া দিয়াছিল, আঘাত করিয়াছিল—সোনালীর কপাল কাটিয়া সমস্ত মুখ খানি রক্তমাখা হইয়া গিয়াছিল, সোনালী কিন্তু নিজের যন্ত্রনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল পাছে মোহিতের পরিস্কার কাপড় খানি নষ্ট হয়। মোহিতের শরীর একটু অসুস্থ হইলেই সোনালী সব ফেলিয়া রাখিয়া, মোহিতকে পাখা করিয়া পা টিপিয়া দিয়া, মাথায় ওডিকোলন দিয়া কতই ব্যাকুলতা জানাইত। মোহিতের সহিত কোন সম্বন্ধই ছিল না তাহার, সে ঘৃণিতা, পরিত্যজ্যা বেশ্যা—তবুও আজ তাহার কথা মনে করিয়া মোহিত ব্যাকুল ভাবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। জগতে মোহিত যাহা চাহিয়াছিল,—তাহার কৈশরের প্রথম স্বপ্ন, যৌবনের প্রথম কামনা সমস্তই ত দেবেন রায় কাড়িয়া লইয়াছিল, এক সোনালীকেই বেষ্টন

করিয়া আজও তাহার ছিন্ন বিশুষ্ক প্রাণ কোনওরূপে বাঁচিয়া ছিল। সোনালী বুঝিল না—সেও চলিয়া গেল, বাস্ সব শেষ! আর কেন? আত্মীয় স্বজন, নিজের ভবিষ্যৎ সবইত মোহিত অনেক পূর্ব্বেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সোনালীও নাই! তবে আর কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে চরিত্রহীন মোহিত কেন এ আশাহীন, অবলম্বন শূন্য জীবন ভার বহিয়া মরিবে! সবই গিয়াছে—ইন্দু পরের হইয়াছে, সোনালী নাই, আশা নাই আকর্ষণ নাই, তখন কে আর মোহিতকে ধরিয়া রাখে? রাক্ষসী এই জন্য বুঝি সেদিন রাত্রে মোহিতকে বাধা দিয়াছিল, ধরিয়া রাখিয়াছিল?

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পিয়ারী বাবু বাসায় ফিরিয়া মুখহাত ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। স্নেহ তাঁহার জন্য জল খাবার লইয়া গিয়াছিল; অন্যমনস্ক ভাবে তিনি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—এখন থাক্, রান্না হ'ক্।

স্নেহ উপরে আসিয়া দেখিল, মোহিত খাটের উপর বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছে নিকটে আসিতেও মোহিতের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া স্নেহ বলিল—বাবা এসেছেন।—মোহিত মুখ ফিরাইল, তাহার মুখ চোখ আরক্ত, অশ্রুসিক্ত, স্নেহ বলিল—ছিঃ এখানে একা শুয়ে শুয়ে কাঁদ্ছো তুমি? কি হয়েছ তুমি, ভুল কি আর কারও হয় না?

লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টি স্নেহের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মোহিত বলিল—ভুল নিয়েই যে আমি ভুলে ছিলুম স্নেহ, আজ যে আমার সে ভুলও ভেঙ্গে গেছে, ভাঙ্গা বুকও গুঁড়ো হ'য়ে গেছে।

সোনা—সেও যে আজ আমায় ছেড়ে গেছে। উঃ কি বুঝ্বে প্রাণে আজ আমার কি হচ্ছে—কি জ্বালা!

স্নেহ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, শুধু সমবেদনা মাখা করুণ দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মোহিত উঠিয়া বসিল।

সিঁড়িতে পদশব্দ হইল, স্নেহ তাড়াতাড়ি লজ্জিত অপ্রস্তুত ভাবে বাহির হইয়া গেল। মোহিত ক্ষিপ্র হস্তে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সমর আসিয়া বলিল—বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন মোহিতদা। কখন ফিরেছেন তিনি, তোমার বুঝি সে খেয়ালই নেই? ওঃ সেনাটা বুঝি এখানেই ছিল, তাইত বলি কে যেন চট্ করে সরে গেল। ভারী বেহায়া ত মেয়েটা, এখনও ত বি'য়ে হয়নি।

নীচে সোনালীর তাঁত ঘরে পিয়ারীবাবু একখানি চৌকীর উপর বসিয়াছিলেন, পার্শ্বে তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম, তখনও তাঁতের গায় একখানি অর্দ্ধ সমাপ্ত কাপড় চড়ান' রহিয়াছে।

সমরের পিছু পিছু মোহিত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, নীরবে নত মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। পিয়ারী বাবু ইতস্ততঃ চাহিয়া তাঁতের পাশে একখানি টুল দেখাইয়া বলিলেন—বস দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মোহিত নীরবে গিয়া টুলের উপর বসিল। সোনালী এই টুলে বসিয়া তাঁত চালাইত।

সমর বাহির হইয়া গিয়াছিল। পিয়ারীবাবু বলিলেন—শরীর তোমার এখনও ভাল সারেনি দেখ্‌ছি, চেহারাটাও একেবারে বদ্‌লিয়ে গেছে।

মোহিত কথা বলিল না, মাথা নত করিয়া বসিয়াই রহিল।

পিয়ারীবাবু আবার বলিলেন—কাজে বেরিয়েছিলে বুঝি? কাজকর্ম্ম কর্চ্ছো না প'ড়্ছো?

মুখ নত রাখিয়াই মোহিত উত্তর করিল—না, কাজ কর্চ্ছি।

—চাক্‌রী না কি?

না, দালালী করি।

—কতদিন বেরুচ্ছ'? কিছু সুবিধে টুবিধে বুঝ্‌ছো?

—পাঁচ মাস হবে, হ্যাঁ?

পিয়ারী বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, মোহিতও মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, আপনা হইতে কোন কথাই বলিল না। কতক্ষণ পরে পিয়ারী বাবু বলিলেন—এ তাঁত কার?—বুন্‌তে শিখেছ' তুমি?

কাহার তাঁত, মোহিত কি বলিবে? শুধু বলিল—না। আবার কতক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে পিয়ারী বাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আমি এখানে এসে সব কথাই জেনেছি, তোমার অসুখের সময় যিনি তোমার সেবা ক'রে চিকিৎসা করিয়ে, তোমার জীবন দান করেছিলেন, তিনি সব কথাই আমাকে একখানা পত্রে লিখে রেখে গেছেন।

—মানুষ মাত্রেরই ভুল চুক আছে, সে জন্য আমি তোমাকে ভৎর্সনা কর্চ্ছি না, তবে তোমার উচিত ছিল, গোড়াতেই তোমার অসুখ, অভাবের কথা আমাকে জানান। তোমার এত খানি ছেলে বুদ্ধি জান্‌লে কখনই তোমাকে আমি একা কল্‌কাতায় আস্‌তে দিতুম না। আমি কখনই আশা করিনি—জ্ঞান হ'য়ে অবধি তুমি আমায় দেখেই আস্‌ছো—আমি আশা করিনি তুমি আমাকে এত পর ভাব্‌বে। সে

যাক্, যখন সেরে উঠ্‌লে তখনও যদি ফিরে যেতে, কি একটা খবরও দিতে, তা হ'লে আমাদের এতটা দুর্ভাবনা হ'ত না। ছেলে বেলা থেকেই তোমায় আমি লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি—সামান্য ছোট বিষয়কে তুমি খবুই বড় ক'রে ধর। এতটা Sentimentalism ত ভাল না। একটা ভুল যদি হ'য়ে গিয়েই থাকে, তা ব'লে সেটাকে মনে পুষে রেখে, নিজের অশান্তি বাড়িয়ে, পরের মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ ?

মোহিতের মাথা নত হইতে হইতে শেষে একেবারে বুকের উপরই ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ থামিয়া পিয়ারী বাবু আবার বলিতে লগিলেন—কোনও জিনিষেরই সবটাই একেবারে মন্দ হ'তে পারে না, তা বাহিরে থেকে সেটা যত খারাপই মনে হক না কেন। যাক্ যা ভবিতব্য তা ত হয়েই গেছে। তা' নিয়ে বেশী মন খারাপ করা বা আর পাঁচটা কর্ত্তব্যে অবহেলা করা উচিত নয়। যাও ওপরে অমর, সেনা আছে, তাদের সঙ্গে গল্প সল্প কর গিয়ে। সেনাটা ত কারও বারণ শুন্‌লে না, এসে তবে ছাড়লে। হাঁ, কাল একবার Whiteway Laidlaw র ওখানে যেতে হবে, অমরের ফরমাস্, তার জন্যে একটা Life Belt কিন্‌তে হবে, সাঁতার শিখ্‌ছে কি না সে আজ কাল। আচ্ছা সে সব কাল হ'বে তখন।

মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল, নীরবেই বাহির হইয়া যাইতেছিল, দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পিয়ারী বাবু আবার বলিলেন—কাল আর হয়ে উঠবে না, পশু সকালে না হয় বিকালের গাড়ীতেই কানপুর রওনা হতে হবে। হাতে যদি তোমার কোনও কাজ থাকে কালই সব সেরে নিও।

মোহিত চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবার হঠাৎ ফিরিয়া মুখ উঁচু করিয়াই বলিল—না, কানপুরে এখন আমি কিছুতেই ফিরতে পারবো না—আমায় মাপ কর্বেন।—মুখখানি আবার একটু নত করিয়া বলিল—সব যদি জান্‌তেন, তা'হলে আর আমাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিতে চাইতেন না।

মোহিত যেন কত বড় একটা আজগুবি কথা বলিয়াছে—পিয়ারীবাবু সবিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিলেন—সে বিচার আমার। জানি না কি, সবই ত সে এই পত্রে লিখে গেছে।—পকেট হইতে তিনি সোনালীর পত্র খানি টানিয়া বাহির করিলেন।

মোহিত ঘাড় হেঁট করিল।

—যাও, ওপরে যাও। এই বলিয়া পিয়ারীবাবু যেন এইখানেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিলেন, কানইয়াকে ডাকিয়া বলিলেন—এ কানাইয়া এক গেলাস্ জল দেনা।

মোহিত আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

(৩৮)

তিন দিন পরে, সকলের সহিত মোহিতও সন্ধ্যায় মেলে এক খানি রিসর্ভড্ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে ঢুকিয়াই সমর উপরের একটি বার্থে উঠিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছারপোকা ও নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পন করিল। ঠেস্ দিয়া বসিয়া পিয়ারীবাবু খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন; স্নেহ তাঁহার পায়ের কাছে

কতক্ষণ বসিয়া রহিল। বাহিরের অগনিত আলো, তাহার পরেই অপার অন্ধকার, দেখিতে দেখিতে সে কখন সেই খানেই শুইয়া পড়িল। বিমলা দরজার পাশে ঘোমটার ভিতর হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

এক পার্শ্বে বসিয়া মোহিত আজ কয়দিন পরে নিরবিলি চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। বসিয়া বসিয়া সে সোনালীর কথাই ভাবিতেছিল।—সোনালী কোথায় গেল, কি করিল? সত্যই কি সে আত্মহত্যা করিয়াছে? এ কয়দিন চেষ্টা করিয়াও মোহিত সোনালীর কোন উদ্দেশই পায় নাই।

মোহিত ভাবিয়াছিল এখন সে কানপুরে যাইবে না, যাইতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বার মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে তাহার সাহস হয় নাই। কোনও দিনই ত তাহার স্বভাবে নিজত্ব বলিয়া কোন উপাদনই ছিল না, থাকিলে হয়ত তাহার জীবন-স্রোত এরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া না বহিয়া সোজাই যাইত।

ভাবিতে ভাবিতে মোহিতের মনে পড়িল, এক বৎসর পূর্ব্বে যে দিন রাত্রে সে কলিকাতায় আসিতেছিল, কত আশা, কত সোনার স্বপ্ন, কত বড় উচ্চাকাঙ্খা লইয়াই সেদিন সে বিনিদ্র বসিয়াছিল! আর, আজ সে কি লইয়া ঘরে ফিরিতেছে? সব পুড়িয়া গিয়াছে, আছে শুধু চিতাভস্ম!

গাড়ী একটি ষ্টেসনে থামিল। মোহিত চাহিয়া দেখিল সকলে ঘুমাইতেছেন, কিন্তু ঠিক নামিবার দরজাটির পাশেই জানালার উপর মাথা রাখিয়া মা কাৎ হইয়া আছেন, হয়ত জাগিয়াই আছেন।

ট্রেন আবার চলিতে লাগিল। বার বার সোনালীর স্নেহ

বিহ্বল মুখখানি মনে উঠিয়া মোহিতের দৃষ্টি সজল হইয়া উঠিয়াছিল, এবার মোহিত একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

হঠাৎ স্নেহ মাথা উঁচু করিল। আস্তে আস্তে সে উঠিয়া বসিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিল। চাহিয়া সে এক পা এক পা করিয়া মোহিতের সম্মুখের বেঞ্চের ধারে আসিয়া এক কোণে বসিয়া বলিল—উঃ কী ছারপোকাটাই পুষে রেখেছে গদীগুলোতে!—হাত বাড়াইয়া স্নেহ হাতে ছারপোকা দষ্ট (?) স্থানগুলি নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত হইল।

মোহিত একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। কতক্ষণ পরে স্নেহ নিম্নস্বরে বলিল—তোমার ঘুম নেই চোখে, বসে বসে অত কি ভাব্‌না?

মোহিত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

—আঃ! ও সব দীর্ঘনিশ্বাস হা হুতাশগুলো কল্‌কাতায় রেখে আস্‌তে পার্লে না?

—সে যদি সম্ভব হ'ত!

আবার একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া স্নেহ হঠাৎ বলিল—সব কথা বল আমায়।

মোহিত মুখ ফিরাইয়া আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—সে সব দুশ্চরিত্রের ইতিহাস কারও কাছে—মা ব'নদের কাছে বল্‌বার নয়।

মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহের মুখে একটা যেন ছায়া পড়িল, দৃঢ় স্বরে সে বলিল—তা হ'ক্‌ 'আমাকে' বল।

মোহিত বিস্মিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহের গম্ভীর মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল সকলেই ঘুমাইতেছেন। তখন অনুচ্চস্বরে মোহিত তাহার কানপুর ত্যাগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া সোনালীর অন্তর্ধান পর্য্যন্ত তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা যথাযথ ভাবে বলিয়া গেল।

মোহিত চুপ করিল। স্নেহ কোন কথা বলিল না, চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া স্নেহ বলিল—আচ্ছা, সত্যই কি সোনালী আত্মহত্যা ক'রেছে? উঃ তার প্রাণে কী যন্ত্রণাই হয়েছিল নিশ্চয়!

মোহিত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—এখন বল' আমার বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত কি? সব কথা তোমার কাছে নির্লজ্জের মত বল্‌বার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। সব শুনে' এবার তুমি নিজে থেকেই আমাকে আর একটা বিষম অন্যায় কাজের দায় হ'তে উদ্ধার ক'রবে।

মুখে আরও খানিকটা গাম্ভীর্য্য আনিয়া স্নেহ বলিল—হাঁ কানপুর ফিরে যাওয়া তোমার খুবই উচিত।—একটা ঢোক্ গিলিয়া গলাটা আর একটু ভারী করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বিষম অন্যায়!"—কি কাজ সেটা শুন্‌তে পাই কি?

মোহিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বুঝ্‌ছি এখনও তোমার বাবার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন হয়নি। সব জেনে শুনেও এখনও তিনি আমার মত চরিত্রহীন অপদার্থের হাতে তোমাকে—

বিকৃত মুখে বাধা দিয়া স্নেহ বলিল—থাম, থাম, আর অত নভেলী ঢঙ্ কর্ত্তে হবে না তোমাকে।

মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া দুঃখিত স্বরে বলিল—ঠাট্টা নয় স্নেহ, তুমিই আমাকে এ পাপ থেকে বাঁচাতে পার, নিজেও বাচ্‌তে পার।

স্নেহের মুখে এবার একটা আহত অভিমান ফুটিয়া উঠিল। একবার সে মোহিতের দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল—ঠাট্টা নয়। বাবার চেয়ে আমার বুঝবার শক্তি কিছু বেশী না, আর, কোন দিনই ত আমি নিজে কিছু বিচার করিনি। কি গরজ আমার বাধা দেবার, আমি কে ? দেখে শিখেছি ভাগ্যের ওপর কারও হাত নেই, বড়্‌দি, ইন্দুদি'—

ইন্দুর নাম শুনাইয়াই মোহিত হঠাৎ চম্‌কাইল দেখিয়া, স্নেহ চুপ করিয়া গেল।

মোহিত আবার অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল।

স্নেহও কতক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবিল, তাহার পর আবার মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিল—সবার কথাই ত ভাব্‌ছ তুমি, কিন্তু আমার কথাটা কি একটুও ভাব্‌বে না ? আমিও কি মানুষ না ?

—মানুষ ! হাঁ, আমি কি আর মানুষ আছি স্নেহ ? তোমার—

স্নেহ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁগো হ্যাঁ, মানুষ,—আমার মানুষ—নিমেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া স্নেহ নত হইয়া মোহিতের পায়ের ধূলা লইল।

মোহিত সন্ত্রস্তে পা সরাইয়া লইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্নেহের লজ্জারুণ অবনত মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

সমাপ্ত।